প্রথম বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ (শশাঙ্কাব্দ), ইং-২০২৫, অক্টোবর

www.poundrakshatriya.com

দামঃ ১০০ টাকা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

শারদ সংখ্যা

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র মুখপত্র

সম্পাদকঃ শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

সংগঠন মন্ত্র (বেদ থেকে গৃহীত)

ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে সং জানানা উপাসতে।।

সমানো মন্ত্র সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।

সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।।

সমানী বা আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ।। (সামবেদ)

“সমভাবে চল, সমভাবে বল, সমভাবে মনোবৃত্তি সমূহের প্রেরণা হউক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণের ন্যায় সমভাবে আরাধনা পরায়ণ হও। তোমাদের সমান মন্ত্র হউক, সমান সমিতি হউক, সমান মন হউক, সমান চিত্ত হউক, তোমরা সমান মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হও, সমানভাবে আত্ম নিবেদন কর, সম হৃদয়ে উদ্দেশ্য জানাও, তোমাদিগের মন সমানভাবে ভাবান্বিত হউক, তোমাদিগের হাস্যহর্ষ সমভাবাপন্ন হউক। ওম শান্তি! ওম শান্তি! ওম শান্তি”

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

প্রথম বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/শশাঙ্কাব্দ,

যুগাব্দ - ৫১২৭, ইং-২০২৬

www.poundrakshatriya.com

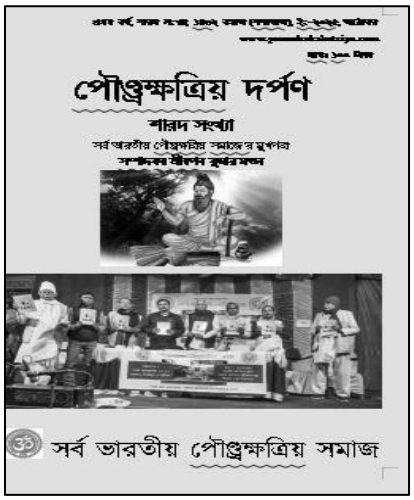

পত্রিকা সম্পাদকঃ শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল

যে কোনও বিষয়ের জন্য যোগাযোগ

সম্পাদক - ৯৮০০২৯৬৬৪৮

প্রকাশকের ঠিকানাঃ

ইছামতি সংবাদ প্রকাশনা

শোনপুকুর, বসিরহাট

ফোনঃ ৯৭৩৩২১১১৪৯

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ই-মেলঃ :

poundrakshatriyadarpan@gmail.com

সূচিপত্র

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র - 2

সম্পাদকীয়ঃ আত্মজাগরণই উত্তরণের পথ- 3

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ-

শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল - 5

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের

সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - 10

একবিংশ শতাব্দীতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার

আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতাঃ শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল - 11

মহর্ষি কপিল মুনির পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যোগ-শ্রীমতীসোনালী মণ্ডল- 21

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেব: আর্য-ক্ষত্রিয় রাজত্বের

বলিষ্ঠ প্রতিভূ - - ভাস্কর প্রতিম 26

আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাকাব্য: আত্মমর্যাদা ও অবিচল ক্ষত্রিয়

উত্তরাধিকার- ঋকলোচন পৌণ্ড্র 30

মুসলিম অনুপ্রবেশ (অবৈধ অভিবাসন) এর ফলে সৃষ্ট

ক্ষতিসমূহ - শ্রীরাধামাধবাচার্য 37

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর আর্য দাবির সপক্ষে বিশদ বিশ্লেষণ: -

আচার্য শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায় 41

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বাংলাদেশের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন --

ত্রিলোচন নস্কর 48

বিশেষ প্রবন্ধ - 49

মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে বিশ্ববিদ্যালয় চাই -

শ্রীশ্রীপৌণ্ড্রক্ষত্রিয়াচার্য 55

বুদ্ধ প্রতি ইঞ্চি একজন হিন্দু ছিলেন- কে. এলস্ট 57

বুদ্ধ প্রতি ইঞ্চি একজন হিন্দু ছিলেন- কে. এলস্ট 64

পতিব্রতা আদর্শ: ভারতীয় নারীর শক্তি, নিষ্ঠা ও মহত্ত্বের চিরন্তন

প্রতীক- শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল 77

কবিতা - 81

গল্প - জাগো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় - শ্রীবিষ্ণু পুরকাইত 85

উপন্যাসঃ পথের দিশা - হরি ওম উপাধ্যায় 87

সাংগঠনিক খবর - 130

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক সংবাদ 136

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ও বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের

অভিমুখ - শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল 138

পুস্তক পর্যালোচনা 149

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ 153

INCOME AND EXPENDITURE REPORT -156

হেমনগরের 'কল্পগঙ্গা ও কপিল মেলা': পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের

নবতীর্থক্ষেত্র 158

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র

"বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, মাতৃগণ। তোমারা যে, যে অবস্থায় থাক না কেন ভুলিও না, তুমি এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ জননীর একটি সন্তান। ভুলিও না, জননীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। ভুলিও না তোমার চরিত্র, তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার কৃতিত্ব, তোমার গৌরব তোমার প্রতিষ্ঠার দিকে তোমার জননীর অপমান, তোমার জননীর লাঞ্ছনা, তোমার জননীর নির্যাতনের জন্য তুমি দায়ী। ভুলিও না- তোমার ব্যক্তিগত সুখ, স্বচ্ছন্দ, সুবিধা, বিলাস, ব্যাসন ভোগের ক্ষুধা মনুষ্যেতর জীবনেও মিটিতে পারে। ভুলিও না তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার নিত্য সহচর। ভুলিও না— তুমি আর্য, আচার্য্যত্ব তোমার আছে। ভুলিও না তুমি ভারতের একজন, পৃথিবীর একজন। ভারত তথা পৃথিবী তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

স্মরণ রাখিও–তোমার ইতিহাস তোমাকেই গবেষণা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্শী, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, গুজরাটী, কানাড়ী, আসামী, চীনা ভাষার মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তোমার প্রাচীন কথা তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে। মৎসর হস্তের বিকৃত বিবৃতিকে তোমার লেখনীর নির্মম আঘাতে খণ্ডন করিতে হইবে। **সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, যুদ্ধ চলিয়াছিল, চলিতেছে ও চলিবে, অনন্ত কাল চলিবে। স্মরণ রাখিও — শক্তিহীনের বৈশিষ্ট্য নাই, মর্যাদা নাই, সত্তাও থাকিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিও, অর্থের অভাব নয়, ভাবের অভাবই অভাব। চিন্তা করিও—পরিবেশই মানব গঠন করে। অসৎ পরিবেশ নিষ্ঠুর ভাবে বর্জন ও সৎপরিবেশে প্রবেশই অস্তিত্ব রক্ষার উপায়।** মনে রাখিও তোমার পরিচয়ে, তোমার জাতি, তোমার জননীর পরিচয়। স্থির জানিও তোমার আদরেই তোমার জননীর আদর। বিচার করিও -- তোমার গুরু পুরোহিত কুলের অবনতি প্রার্থনায় ভগবান বিচলিত হইতে পারেন কিন্তু মৎসর মানবকুল তাহার স্পর্শে কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। মনে রাখিও একতাই বল, সংঘশক্তিই বল। মনে রাখিও – কুটনীতিই তোমার মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তোমাকে সাবধান হইতে হইবে, আবার সোজা হইয়া সোজা পথে চলিতে হইবে। লুপ্ত গরিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, উজ্জ্বলতর করিতে হইবে। নচেৎ তোমার আত্মাই তোমাকে ক্ষমা করিবে না, করিতে পারে না। সাধু। সাবধান! প্রলোভনে বঞ্চিত হইও না, আত্ম-বিক্রয় করিও না। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ।" বাক্য সার্থক কর। **ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !!!**"

- মহাত্মা রাইচরণ সরদার,
"দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা" থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

আত্মজাগরণই উত্তরণের পথ

আত্মজাগরণই উত্তরণের পথ - এটা আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীরা বুঝেছিলেন বলেই তারা আত্মসম্মান আন্দোলনের (Self-Respesct Movement)-এর সূচনা করেছিলেন। কারণ আত্মসম্মান ব্যতীত আত্মজাগরণ সম্ভব নয়। আর এই আত্মজাগরণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে বহু অহংকারশূন্য আত্মগর্বী মানুষ তৈরি করেছিল, যারা নিজ সমাজের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাই আমরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে অংশগ্রহণ করতে দেখতে পাই। আজ যখন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একত্রিত হওয়ার ডাক দেওয়া হচ্ছে তখন তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি ধরে নিতে হবে আজকের সমাজ আত্মজাগরিত নয়, তাই আত্মসম্মান আন্দোলন দানা বাঁধছে না। মহাত্মা রাইচরণ সরদারও নিজ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে আত্মজাগরণের জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন, একত্রিত করতে চেষ্টা করেন কিন্তু সাফল্য তেমন আসেনি। তিনি নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তর আপসোস করেন। নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত মানুষদের নৈতিক অবক্ষয় ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব হীনতা তাঁকে পীড়িত করত। আসলে মহাত্মা রাইচরণবাবু প্রতিদান আসা করেছিলেন। কিন্তু এসব হল সেবা কাজ, এসব কাজে প্রতিদান আসা করা ভুল। তাই তিনি নিজেই এগিয়ে চলেছিলেন। আসলে মানুষ যেমন চেতনা সম্পন্ন থাকে তেমনরূপ সাড়া দেয়। তাই আমাদের সেবাকর্ম চালিয়ে যেতে হবে। একটি স্টেশন থেকে যখন একটি গাড়ী ছাড়া হয় তখন ড্রাইভারের একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য পৌঁছানোর জন্য তাগিদ থাকে। তিনি মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে গাড়ী থামান। কেউ উঠতেও পারেন আবার নাও উঠতে পারেন। ড্রাইভার তাঁর নিজের কাজ করে চলেন। তাঁকে গাড়ী থামালে চলে না। কারণ তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। অন্যদিকে যাত্রীরা ইচ্ছামত গাড়ীতে উঠতে পারেন আবার নামতেও পারেন কিন্তু ড্রাইভার তা পারেন না। গাড়ীতে একমাত্র ড্রাইভারেরই বড় দায়িত্ব থাকে। গাড়ীতে হেল্পার থাকেন যার কাজ ড্রাইভারের পাশে থেকে দক্ষতা অর্জন করা এবং ড্রাইভারকে সাহায্য করা। যতক্ষণ পর্যন্ত হেল্পার বা সহযোগী নিজেকে ড্রাইভারের সমান দক্ষতা গড়ে তুলছেন ততক্ষণ ড্রাইভার দায়িত্ব ছেড়ে নিশ্চিত হতে পারেন না। এইখানেই কাজ করে হেল্পার কীভাবে কাজটা গ্রহণ করছেন, হেল্পার বা সহযোগী যদি শিক্ষিত, মার্জিত, বিনয়ী, নিষ্ঠাবান, বুদ্ধিমান এবং শ্রদ্ধাশীল হন ও তাঁর মধ্যে সেবাপরায়ণতা থাকে তবে তিনি অল্প দিনেই দক্ষতা অর্জন করে ড্রাইভারের ভার লাঘব করতে পারেন। সংগঠনের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি সমভাবে প্রযোজ্য। সংগঠনের সদস্যরা কেমন ভাবে সংগঠনকে গ্রহণ করছে

তার উপর সংগঠনের পরিচালনা ও সাফল্য নির্ভর করে। যারা যতটা জাগরিত তারা ততটা সাহায্য করার উপযুক্ত হন। এইজন্য আত্মজাগরণ অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগণকে আত্মজাগরিত হতে হবে। নিজেদের ভালোর জন্য, নিজেদের সমাজের জন্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্য, সর্বোপরি দেশের জন্য। আত্মজাগরিত মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ। কারণ তিনি তাঁর অন্তরের আহবানে সাড়া দিতে চেষ্টা করেন ও বিবেককে সর্বদা জাগ্রত রাখেন। বিবেকের নির্দেশকে পালন করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে কিছু মানুষের নিজের কর্ম নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই; যেন জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র নিজের আঁখের গোছানর জন্য। তার সমাজ, সংস্কৃতি, দেশ, ধর্ম যেন কিছুই নেই। অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের জীবন কেটে যায়। আবার অনেকে কোনও একটি রুজি-রুটির ব্যবস্থা করে ভেবে নেন ওহ! বিরাট কিছু করে ফেলেছি; আমি সমাজের একজন হোমড়া-চোমড়া। এরাই বিভিন্ন সংগঠনে গিয়ে উঁকি মারে এবং দেখে সংগঠন থেকে আমার ফায়দা হবে কিনা। এক-দুবার সংগঠনে উঁকি মেরেই, যদি দেখে এখান থেকে তার ফায়দা হচ্ছে না তখন এরা নিজেদের গুঁটিয়ে নেয়। এরা নিজেদের স্বার্থপররূপে গড়ে তোলে এবং এদের আত্মচেতনা স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নিজেরাই বলি দিয়ে দেয়। সমাজ, দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি এদের কাছে কোনও বিষয়ই নয়। তাই সমাজে প্রকৃত আত্মজাগরিত মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয় এবং যুগে যুগে মহাত্মা রাইচরণ সরদারের মত মানুষরা **"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে"** মন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেন। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সকল মানুষের উচিত নিজেকে আত্মজাগরিত করা। নিজ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানার আগ্রহ, নিজ সম্প্রদায়ের সেবা করার মানসিকতা, নিজ সম্প্রদায়ের সেবার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, নিজ সম্প্রদায়ের সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়া এবং দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তাকে রক্ষার বাসনা ও প্রচেষ্টা আত্মজাগরিত হওয়ার প্রাথমিক সোপান। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এই সোপান পেরিয়ে আত্মজাগরিত হয়ে উঠুক। **"আমাকে আত্মজাগরিত হতে হবে, আমার সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করতে হবে"** - এই বাসনা প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের অন্তরে জাগরিত হউক। তাহলেই ইজরায়েল, জাপান যেমন ক্ষুদ্র জন সংখ্যার জাতি হয়েও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি তেমনভাবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ও ভারতের শ্রেষ্ঠশক্তি হয়ে উঠবে। হে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ, আত্মজাগরিত হও।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

সম্পাদক (পত্রিকা)
শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল

পণ্ডিতগণের মতে, সিন্ধু সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক পর্বে পূর্ব ভারতে **'পুণ্ড্রদেশ'** এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। **পুণ্ড্রদেশের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়।** মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায়, ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে **'পুডনগল'** কথাটি আছে যার সংস্কৃত অর্থ **পুণ্ড্রনগর**। পৌণ্ড্র সভ্যতার বিকাশ প্রায় সমগ্র বঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল। পৌণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাসই পূর্ব ভারতের ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায়।[১]

'পৌণ্ড্র' শব্দের অর্থ হল তিলক বা ফোঁটা। অনুমান করা হয় ভারতের চিরাচরিত রীতি অনুসারে পৌণ্ড্ররা কপালে তিলক বা ফোঁটা দিত। তাদের পেশা ছিল বৈদিক রীতি অনুসারে ক্ষত্রিয়; তাই তাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ভারতীয় আর্য।

ভারতের জাতীয় মহাকাব্য **মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, হরিবংশ, মনু সংহিতা, মৎস্য পুরাণ, কুলতন্ত্র** ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে পৌণ্ড্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে উল্লেখিত আছে, মহারাজ বলীর পুত্রগণ যথা- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম, পূর্ব ভারতের পাঁচটি স্থানের শাসক ছিলেন। সেইসূত্রে পৌণ্ড্ররা চন্দ্র বংশীয়। চন্দ্রদেব বা সোমদেবের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুরবা, পুরুরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র পুরু, পুরুর পুত্র মহাবীর্য্য, তারপর বংশানুক্রম এইরকম - প্রতিষ্ঠান - প্রবীর - মনসা - অভয়দ - সুধন্বা - সুবাহু - রৌদ্রাশ্ব - কক্ষে - সভানর - কালানল - সৃঞ্জয় - পুরঞ্জয় - জন্মেজয় - মহামণি - মহামণা - তিতিক্ষু - উষদ্রথ - ফেণ - সুতপা - বলি। মহারাজ বলির পাঁচপুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম। ভাগবত পুরাণ থেকে এই বংশ তালিকা পাওয়া যায়। অনেকে মহারাজ বলিকে অসুররাজ বলি ভাবেন যা সঠিক নয়। মহারাজ পৌণ্ড্র প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পৌণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রবর্ধন। পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় ছিলেন তাই বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামধারণ করা হয়েছে।

মহাভারতের সভা পর্বে ১৩ অধ্যায়ে **মহারাজ পৌণ্ড্র বাসুদেব** সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি। পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় রাজা **বাসুদেবের** বংশধর।[২] রাজা বাসুদেব কৌরব পক্ষের হয়ে মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মহামাত্রকে পাঠান। তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা **পুণ্ড্রবর্ধন** নামে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।[৩] পৌণ্ড্র রাজা বাসুদেবের ভাই কপিল যোগধর্ম অবলম্বন করে **'মহামুনি কপিল'** নামে পরিচিতি লাভ করেন। মহামুনি কপিল সাগর দ্বীপে বসবাস করতেন এবং এখানেই তিনি **'সাংখ্য দর্শন'** রচনা করেছিলেন।[৪] **গৌতম বুদ্ধ** বুদ্ধত্ব লাভের পর পুণ্ড্র দেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য। এই সময় পুণ্ড্র রাজ্য সারা বঙ্গদেশ জুড়ে বিরাজিত

ছিল ও উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করেছিল।[৫] **ঐতেরেয় আরন্যকে পুণ্ড্র জনজাতিদের বিশ্বামিত্রের বংশধর বলা হয়েছে**। বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে পুণ্ড্রজনদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। মহাভারতের সভা পর্বেও পুণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। **মনে করা হয়** পুণ্ড্র পরিবর্তিত হয়ে 'পৌণ্ড্র' হয়েছে, যেমন 'ব্রাহ্মণ' 'বামন' ও 'কায়স্থ' 'কায়েত' হয়েছে।[৬]

অনেকে মনে করেন পৌণ্ড্ররা সৎশূদ্র। পৌণ্ড্ররা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে তারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এবং একাদশ শতকে তারা যখন হিন্দু ধর্মে ফিরে আসে তখন তাদের নাম হয় সৎশূদ্র। H. H. Risley তাঁর "People of India" গ্রন্থে বলেছেন, "পৌণ্ড্ররা আচরণ ও অভ্যাসে প্রায় সৎশূদ্র এবং তারা তদের দৈনন্দিন ব্যবহারে কোন নীচতা দেখায়নি।[৭] E. A Gait পৌণ্ড্রদের বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের কথা বলেছেন।[৮] **ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানার মতে**, সেনদের রাজত্বকালে বর্ণ কৌলীন্য প্রকট আকার ধারণ করে এবং তারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ে পরিণত হয়। এদের সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্যক্তি গৌড়বঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে বসবাস শুরু করে। তাই সুন্দরবনে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা অনেক বেশী।[৯] **ধনঞ্জয় দাসের** মতে, 'একমাত্র বসিরহাট মহকুমার অধিবাসীগণ প্রাচীনকাল থেকে এই স্থানে বাস করিতেছে'(বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস)।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৌণ্ড্র জনসমাজের মধ্যে সামাজিক উত্তরণের জন্য এক আন্দোলন সূচিত হয়।[১১] এই আন্দোলনকে 'Self Respesct Movement' **বা 'আত্ম মর্যাদা আন্দোলন'** বলা হয়।[১২] এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন **বেণী মাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ** প্রমুখ। ১৯০১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রদের মধ্যে যারা চাষ করত তাদের **পদ্মরাজ বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়** বলা হয়। পৌণ্ড্রদের সামাজিক মর্যাদার সরকার কর্তৃক অবনমন ঘটে। এই সময় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের আত্ম মর্যাদা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট **রাইচরণ সরদার**। বেণী মাধব হালদার ও রাইচরণ সরদার ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে জনগণনার রিপোর্টে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আবেদন পত্রটি গৃহীত হয়নি। [১৩]

১৯২১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রদের নিম্নবর্ণের তালিকাভুক্ত করা হয়। এই সময় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ করণ** প্রমুখ নিম্নবর্ণের তালিকা থেকে পৌণ্ড্রদের বাদ দিতে ও সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির জন্য সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্ট W. H. Tomson-এর কাছে ডেপুটেশন সহকারে একটি স্মারক লিপি পেশ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শব্দটি প্রয়োগের দাবী জানান। [১৪] **"পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ"** ও 'A Short History and Ethnology' নামে দুটি বইও সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্টকে দেওয়া হয়

যাতে পৌণ্ড্রদের উচ্চ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।[১৫] কিন্তু সরকারের ষড়যন্ত্রে এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনাতেও সরকারের একই অবস্থান বজায় থাকে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আগেই **'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি'** ও **'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমিতি'** নামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমকালীন সমস্যা তুলে ধরার জন্য **'প্রতিজ্ঞা'**(১৯১৮), **'ক্ষত্রিয়'**(১৯২০) ও **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার'** (১৯২৪) নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১৬]

এই সময় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের নেতারা নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রসারে জোর দেন। পিতামাতা যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাঁর আবেদন জানান। ১৯৩২ সালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা একটি সম্মেলনের মাধ্যমে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে,

১) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা পবিত্র পৈতা ধারণ করবে এবং দ্বাদশাশৌচ পালন করবে।

২) সকল শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে এবং যদি প্রয়োজন হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু করতে হবে।

৩) প্রত্যেক পরিবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষা তহবিলে দান করবেন।

৪) **সমাজ দর্পণ** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে।[১৭]

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা মহাত্মা **রাইচরণ সরদার** প্রস্তাবিত তপশীলি তালিকা থেকে পৌণ্ড্রদের বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে একটি মেমরেন্ডাম প্রদান করেন। তিনি সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন এবং বলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বাংলার হিন্দু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, সুতরাং সাহায্যের প্রয়োজন নেই।[১৮] এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি** বাংলার নিম্নবর্ণের যে তালিকা তৈরি করে তাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের উল্লেখ ছিল না।[১৯] ১৮১০ সালে **পুরীর জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ,** যে জাতির মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, তাদের তালিকা তৈরি করেন, তাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[২০] ১৯১১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অন্যান্য বঞ্চিত জাতিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বলা হয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ব্যবহার ও রীতিনীতি নিম্নবর্ণের মত নয়।[২১] এমনকি এই সময়ের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিম্নবর্ণের মনে করত না।[২২] উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই সময় উচ্চবর্ণের সরকারি কর্মচারীদের কাছে সরকার নিম্নবর্ণের বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য চাইলে সেখানে তারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নাম দেননি।[২৩] মিসেস অ্যানি বেসান্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দাবিকে সমর্থন করেন।

এখানে ইংরেজদের বিভেদের রাজনীতির কাছে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতাদের দাবি মান্যতা পায়নি। আসলে ইংরেজরা বর্ণ হিন্দুদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দূরে সরিয়ে বর্ণ হিন্দুদের দুর্বল করতে চেয়েছিল যাতে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন মজবুত

হতে না পারে। কারন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা সবসময় মূল ধারার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ও স্বাধীনতা আন্দলনের নেতাদের পাশে থেকেছেন। এছাড়া ভৌগোলিক দিক থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবস্থান ছিল কলিকাতার নিকটবর্তী। ফলে জাতীয় নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তারাই বেশি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। তাই ইংরেজরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্য নিম্ন বর্ণের তালিকা ভুক্ত করে।

অন্যদিকে **নমশূদ্র নেতৃবৃন্দ** তারা বরাবর স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছেন, কারন তারা মনে করতেন ওটা বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন।[২৪] পূর্ববঙ্গের সাহারাও একই কারণে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।[২৫] এমন কি মাহিষ্য সমাজও ইংরেজ রাজত্বকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন।[২৬]

কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা ব্যতিক্রম ছিলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা **মহেন্দ্রনাথ করণ** পড়াশোনা উপেক্ষা করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। এরফলে তিনি পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন এবং তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা ৯ বছর পরে প্রাইভেটে দিয়ে পাস করেন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কলম ধরে **'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'** নামে বই ও অসংখ্য স্বদেশী কবিতা রচনা করেন এবং নানা সামাজিক উন্নয়ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[২৭] আর একজন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **রাজেন্দ্রনাথ সারকার** ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় স্বার্থে নির্বাচনে একজনকে সমর্থন করতে বললে তিনি তাকে সমর্থন করেন।[২৮] আর একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বদেশী নেতা ছিলেন **গৌরহরি বিশ্বাস**। তিনি লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। গৌরবাবুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় **জীবন মণ্ডল** ও **বীরুপদ মণ্ডল** প্রমুখ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিল্পী স্বদেশী গান গেয়ে সাধারন মানুষকে জাগিয়ে তোলেন।[২৯] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী **স্বর্ণময়ী মণ্ডল, মোক্ষদা নস্কর, অষ্টমী ঢালী** প্রমুখ কারাবরণ করেন। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **অনুকূল চন্দ্র দাস নস্কর** স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান।[৩০] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষাদরদী **ধ্রুবচাঁদ হালদার** ও **ভূষণ চন্দ্র নস্কর**ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন।[৩১] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় **পতিরাম রায়** স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর আস্থা অর্জন করেন।[৩২] পতিরাম রায় ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে বসিরহাট লোক সভা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিভাজন ও শাসনের সিদ্ধান্তই বলবত থাকে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা তাদের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সার্বিক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন

এবং অদ্যাবধি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তপশিলি তালিকাভুক্ত আছেন।

স্বাধীন ভারতেও বিভিন্ন সরকার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রতি সুবিচার করেনি। সরকারী নথিপত্রে পৌণ্ড্রের বদলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শব্দ ব্যবহার করলে তবেই এই সম্প্রদায়কে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দেওয়া হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করানোর জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ঐক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের পতাকার তলে সংগঠিত হোন।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

তথ্যসূত্রঃ

1. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৭
2. E. Gait, —Social Precedence of Castes, ‖ Census of India 1901 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), 372; Gait, — ppendix I ‖ , Census of India 1901, 119.
3. ঐ
4. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৪৯।
5. ঐ পৃষ্ঠা - ৩৪।
6. Soumen Biswas - Aspects of the Socio-Political History of a Scheduled Caste of Bengal: A Case Study of the Pods (1872–1947) PhD Thesis, page-4.
7. H. H. Risley, The People of India (Calcutta and Simla: William Clowes and Sons, 1915),page- 216.
8. ঐ
9. মনীন্দ্রনাথ জানা - সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, দীপালী বুক হাউজ, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা- ৪৬।
10. ঐ
11. H. Beverley, Census of Bengal (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), 188.
12. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৫৭-১৫৮।
13. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৮১।
14. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৯-২০।
15. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৫।
16. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৭-৮
17. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৯।
18. Raicharan Sardar, Deener Atmokahini Ba Satya-Pariksha, cited in Naskar, Poundra Manisha, Vol. 1, 335–336.
19. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৬।
20. Section 7 of Regulation IV of 1809, and again in Regulation XI of 1810, cited in O'Malley, Census of India 1911, Vol. V, P. 229.
21. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৬।
22. সনৎ কুমার নস্কর - পৌণ্ড্র মনীষা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭৪-৩৭৬।
23. সনৎ কুমার নস্কর -ঐ
24. Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Politics and the Raj, Bengal, 1872-1937 (Kolkata: K. P. Bagchi & Company, 1990),Page-5.
25. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় - ঐ, পৃষ্ঠা-১৫২।
26. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ২০২।
27. Dhurjati Naskar, Poundra Kshatriya Kulatilak (South 24 Parganas:PoundraKshatriya UnnayonParishad,2008), P-59.
28. সনৎ কুমার নস্কর -ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮০-৮১।
29. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৬৯।
30. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৭১।
31. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৭৩।
32. Soumen Biswas- ঐ, পৃষ্ঠা- ২০৬।

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। ভারতের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষদের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা বৃদ্ধি ও তাদেরকে একই সংগঠনের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা।

২। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ইতিহাসবোধ ও একাত্মতাবোধ জাগ্রত করা ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা।

৩। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি করা।

৪। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে "Payback to your Society"-এর ধারণা জাগ্রত করা।

৫। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতি চেতনা বৃদ্ধির জন্য মেলার আয়োজন করা।

৬। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ আরও বৃদ্ধি করা।

৭। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের ধারণা জাগ্রত ও বর্ধিত করা।

৮। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আধুনিক সমাজ সংস্কার সম্পর্কে সচেতন করা। জাতপাত ও ধর্মের ব্যবধান মুছে ফেলা।

৯। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যুবদের নিয়ে **'পৌণ্ড্র সেনা'** গঠন এবং নারীদের নিয়ে একটি **'দেবী বাহিনী'** গঠন করা।

১০। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও আলোচনা সভাতে সামিল করা।

১১। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও সম্মাননা প্রদর্শন।

১২। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়া যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে এনে সাধ্যমত সমাধান বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

সবিনয় নিবেদন

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ-এর **সবিনয় নিবেদন বিভাগে** চিঠি/পত্র প্রকাশিত হবে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক তাঁর মতামত জানাতে পারবেন। মতামত সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া চাই। এছাড়া পাঠক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক বা অন্য যে কোনও বিষয়ে এই বিভাগে মতামত জানাতে পারেন। লেখা ইমেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ-এ পাঠাতে হবে। ইমেলঃ poundrakshatriyadarpan@gmail.com
Whatsapp No: 9800296648

লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

- পত্রিকা সম্পাদক

একবিংশ শতাব্দীতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা

শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনটি ঔপনিবেশিক শাসনের সময় সৃষ্ট একটি সামাজিক অবনমনের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ হিসেবে উদ্ভূত হয়, যা একবিংশ শতাব্দীতেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনটি শুধুমাত্র একটি জাতিগত পরিচয় পুনরুদ্ধারের প্রয়াস নয়, বরং এটি পৌরাণিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের এক জটিল ও বহুমুখী সংমিশ্রণ। কেন এই আন্দোলনটি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মমর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত তা প্রাচীন মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় পরিচয়, ঔপনিবেশিক আদমশুমারির রাজনৈতিক কারসাজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, হিন্দু সনাতনী সংস্কার গ্রহণ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং একটি পৃথক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রমাণ হিসাবে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দাবিটি কেবল একটি আবেগিক বা কাল্পনিক দাবি নয়, বরং এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ফল যা এখনও প্রাসঙ্গিক। নিম্নে যুক্তি দিয়ে বিশদে আলোচিত হল -

যুক্তি ১: পৌরাণিক রাজা বলির বংশধর হিসেবে পরিচয়

প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পৌণ্ড্র— এই পাঁচটি পূর্ব ভারতীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা একই বংশের সন্তান ছিলেন এবং তারা ছিলেন রাজা বলির পুত্র । চন্দ্র বংশীয়। বংশ তালিকাটি এইরূপ - চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুরবা - পুরুরবার পুত্র আয়ু - আয়ুর পুত্র নহুষ - নহুষের পুত্র যযাতি - যযাতির পুত্র পুরু - পুরুর পরের বংশধররা হলেন - মহাবীর্য্য ২, প্রতিষ্ঠান ৩, প্রবীর ৪, মনসা ৫. অভয়দ ৬, সুধন্বা ৭, সুবাহু ৮, রৌদ্রাশ্ব ৯. কক্ষে ১০, সভানর ১১, কালানল ১২, সৃঞ্জয় ১৩, পুরঞ্জয় ১৪, জন্মেঞ্জয় ১৫, মহামণি ১৬, মহামণা ১৭, তিতিক্ষু ১৮, উষদ্রথ ১৯, ফেণ ২০, সুতপা ২১, বলি ২২, পুণ্ড্র ২৩। মহারাজ বলির পুত্র হলেন পুণ্ড্র। এই বলি কিন্তু অসুর রাজ বলি নন। অসুররাজ বলির পিতা ছিলেন বিরোচন যিনি ভক্ত প্রহ্লাদের নাতি ছিলেন। পুণ্ড্র একজন ক্ষত্রিয় আর্য রাজা ছিলেন। এই পৌরাণিক তথ্যটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি সুস্পষ্ট রাজবংশীয় এবং যোদ্ধা শ্রেণির উৎসকে নির্দেশ করে। এই পরিচয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির একটি মৌলিক ভিত্তি। এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি রাজকীয় অতীত প্রতিষ্ঠা করে। এই পৌরাণিক বংশধারা তাদের আধুনিক আত্মমর্যাদা আন্দোলনের যৌক্তিকতা বৃদ্ধি করে। এটি কেবল একটি মিথ বা লোককথা নয়, বরং একটি সম্প্রদায়ের নিজেদের

ঐতিহাসিক চেতনা ও সামাজিক মর্যাদাকে সংজ্ঞায়িত করার একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে পৌণ্ড্ররা নিজেদেরকে ভারতের বৃহত্তর মহাকাব্যিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে, যা তাদের সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রচলিত ধারণাকে দুর্বল করে তোলে।

যুক্তি ২: মহাভারতে বর্ণিত পৌণ্ড্র রাজ্য

মহাভারত মহাকাব্যে পৌণ্ড্র রাজ্যকে ভারতবর্ষের একটি স্বীকৃত রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই রাজ্যটি পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্রয় বা পুর্ণিয়া নামেও পরিচিত। বর্তমান ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারের পুর্ণিয়া অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ অঞ্চল ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল পৌণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম - এই পাঁচটি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা একই বংশের সন্তান ছিলেন। মহাভারতের সময়কালে বাসুদেব পৌণ্ড্রক এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। পরবর্তীকালে পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে পৌণ্ড্রনগর হয় যা বর্তমানে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত , এটি বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়ায় অবস্থিত। মহাভারতে পৌণ্ড্রদের 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' বলা হয়েছে। পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয়রা তাদের বৃত্তি ছেড়ে তারা কৃষিকাজে যুক্ত হয় এবং পরবর্তীকালে পৌণ্ড্ররা বৈদিক আচারের পরিবর্তে তান্ত্রিক আচারের অনুশীলন করত, যা পৌণ্ড্রদের একটি স্বতন্ত্র এবং উন্নত সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে। এই তথ্যটি ঔপনিবেশিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে, যারা মনে করত যে পৌণ্ড্রদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি তাদের অনার্য বা অ-বৈদিক পরিচয়ের কারণে নিম্নস্তরের ছিল। এই পার্থক্য প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রদের সংস্কৃতি বৈদিক থেকে রূপান্তরিত ছিল, তবে তা নিকৃষ্ট ছিল না। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বোঝা যায়, পৌণ্ড্রদের সামাজিক অবস্থান কোনো জন্মগত নিম্নতার ফল নয়, বরং একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফল। তাই বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের আন্দোলন প্রাসঙ্গিক। (মহাভারতের যুদ্ধের সময় কাল হল ৩১০১ খৃষ্ট পূর্বাব্দ।)

যুক্তি ৩: পুরাণসমূহে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বীকৃতি

বায়ু পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণের মতো প্রাচীন ও প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থে স্পষ্টভাবে পুণ্ড্র জনজাতিকে 'ক্ষত্রিয়' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের সভাপর্বেও তাদের 'ক্ষত্রিয়' হিসেবে স্বীকৃতি বিদ্যমান। এই একাধিক প্রাচীন নথিতে তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের উল্লেখ থাকা, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা আরোপিত 'নিম্নবর্ণ' পরিচয়ের বিরুদ্ধে একটি অকাট্য লিখিত প্রমাণ। এই প্রামাণ্য তথ্যগুলো কেবল লোককথা নয়, বরং হিন্দুধর্মের মূল শাস্ত্রীয় অংশের দ্বারা সমর্থিত। যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এবং কিছু উচ্চবর্ণের সমাজ পৌণ্ড্রদের মর্যাদা অবনমিত করে, তখন এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ পৌণ্ড্রদের আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি দেয়। এটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা

বৃদ্ধি করে, যা আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাই বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের আন্দোলন শাস্ত্রসম্মত ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

যুক্তি ৪: প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন সাম্রাজ্যের সাথে ঐতিহাসিক সম্পর্ক

পৌণ্ড্ররা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন সাম্রাজ্যের অধিবাসী ছিল, যার রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়। এই সাম্রাজ্য বর্তমান বিহার, উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সাথে পৌণ্ড্রদের সম্পর্ক প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রদের একটি রাজকীয় ও প্রশাসনিক অতীত ছিল। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা তাদের ক্ষত্রিয় পরিচয়ের দাবির স্বপক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ দেয়। একটি শাসক শ্রেণির অতীত থাকা এবং একটি বিশাল ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা স্বাভাবিকভাবেই তাদের যোদ্ধা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই ঐতিহাসিক বৈধতা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বর্তমান ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির একটি অনস্বীকার্য ভিত্তি প্রদান করে। তাই বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের আন্দোলন শাস্ত্রসম্মত ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

যুক্তি ৫: পৌরাণিক রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বংশধর

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজেদেরকে পৌরাণিক ও মহাভারতীয় রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বংশধর হিসেবে দাবি করেন। ভাগবত পুরাণে তাকে কৃষ্ণের শত্রু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং রাজা বাসুদেবের কাকা বীরমণিকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব যিনি স্বয়ং ঈশ্বরের সাথেও যুদ্ধ করতে ভয় পাননি, তাঁর কারণ তিনি ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়। আর ক্ষত্রিয় রাজার এমন বীরত্ব প্রদর্শন স্বাভাবিক। পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের জন্য এই যোদ্ধা পরিচয় তাদের ক্ষত্রিয় পরিচয়ের বৈধতা প্রদান করে। অন্যদিকে রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কাকা বীরমণির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্যত্বের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। যাদের অতীত ইতিহাসের এত সাক্ষ্য বিদ্যমান তারা কেন নিজেদের ক্ষত্রিয় ভাববে না ? তাই বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের আন্দোলন শাস্ত্রসম্মত ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

যুক্তি ৬: ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পরিচয়

মহাভারত অনুসারে পৌণ্ড্ররা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু পরে তারা সংস্কার দোষে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' রূপে পরিগণিত হয়। পরে অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। একাদশ শতাব্দীতে তারা যখন হিন্দুধর্মে ফিরে আসে, তখন তাদের আবার 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' বা 'সৎশূদ্র' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' ধারণাটি পৌণ্ড্রদের বর্তমান নিম্ন মর্যাদার একটি ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা প্রদান করে, যা পৌণ্ড্রদের মূল ক্ষত্রিয় পরিচয়কে বাতিল করে না, বরং একটি সাময়িক বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য

করে। এটি প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রদের পরিচয়গত সংকট আরোপিত এবং এটি কোনো মৌলিকভাবে নিম্নবর্ণের পরিচয়ের ফল নয়। এই ব্যাখ্যা পৌণ্ড্রদের নিজেদেরকে সনাতন হিন্দু সমাজ কাঠামোর একটি অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যা থেকে তারা সাময়িকভাবে বিচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু এখন ফিরে এসেছে। পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় দাবী ন্যায্য, তাই বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের আন্দোলন শাস্ত্রসম্মত ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

যুক্তি ৭: আত্মমর্যাদা আন্দোলন (Self-Respect Movement)

১৮৭১ সালের জনগণনা রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর বাংলায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। বাংলার প্রত্যেক মানুষকে কোনও না কোনও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে এক একটি নামে চিহ্নিত করা হয়। এটি ছিল জনগণনার মোড়কে ভারতবাসীকে ভাগ করো ও শাসন করো নীতি প্রয়োগের একটি বলিষ্ঠ ক্ষেত্র। এই রিপোর্টে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অত্যন্ত অসম্মানজনক নামে অভিহিত করা হয় এবং বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বেণীমাধব হালদার মহাশয় প্রথম এটি লক্ষ্য করেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সম্মান ফেরানোর চেষ্টা করেন। তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপর প্রথম পুস্তক রচনা করেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে যখন পৌণ্ড্রদের সামাজিক মর্যাদা অবনমিত করা হয়, তখন এই আন্দোলনটি **'আত্মমর্যাদা আন্দোলন'** হিসেবে শুরু হয়। এটি একটি আরোপিত নিম্ন সামাজিক অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধির একটি সচেতন প্রচেষ্টা ছিল। এই আন্দোলনটি কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ছিল না, বরং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রতিক্রিয়া ছিল। ঔপনিবেশিক নীতির ফলে যখন সামাজিক মর্যাদা প্রশ্নের মুখে পড়ে, তখন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত নেতারা একটি সুসংগঠিত প্রতিরোধের পথ বেছে নেন। আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল নিজেদের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা বৃদ্ধি, ইতিহাসবোধ ও একাত্মতাবোধ জাগ্রত করা এবং আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন করা। বেণীমাধব মহাশয়ের সঙ্গে একে একে শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ করণ প্রমুখ যুক্ত হন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ আন্দোলনকে একটি অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্ষত্রিয় চেতনা বৃদ্ধি, ইতিহাসবোধ ও একাত্মতাবোধ জাগ্রত করা এবং আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন করতে বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের আন্দোলন শুরু করা অত্যন্ত জরুরী।

যুক্তি ৮: উপনয়ন ও পৈতা ধারণ

বৈদিক, পৌরাণিক ও মহাভরতের যুগে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা উচ্চবর্ণের ক্ষত্রিয় ছিল তাই তারা উপনয়নের মাধ্যমে পৈতা (যজ্ঞোপবীত) ধারণ এবং দ্বাদশাহাশৌচ (১২ দিনের অশৌচ)

পালন করত। এই আচারগুলো সনাতনহিন্দু ধর্মে বিভিন্ন বর্ণের জন্য নির্ধারিত। এমনকি নারীদেরও উপনয়ন হত। বিংশ শতাব্দীতে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অংশ হিসেবে আবার উপনয়নের মাধ্যমে পৈতা (যজ্ঞোপবীত) ধারণ এবং দ্বাদশাহাশৌচ (১২ দিনের অশৌচ) পালন শুরু হয়। এই সংস্কারটি কেবল একটি ধর্মীয় অনুশীলন নয়, বরং এটি একটি প্রতীকী ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ। উপনয়নের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজেদেরকে দ্বিজ (twice-born) হিসেবে ঘোষণা করেন, যা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া সৎশূদ্র বা অবর্ণ পরিচয়কে সরাসরি বাতিল করে। এই শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কৌশলটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দাবির প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিংশ শতাব্দীতে উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শত শত কিশোর ও যুবক ক্ষত্রিয় হন, যা আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে প্রমাণ করে। যে সমস্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা পৈতা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত তাদেরও এটা গ্রহণ করা উচিৎ। মহাত্মা রাইচরণ সরদারের পরিবারের সদস্যরা বর্তমানেও পৈতা ধারণ করেন। এটা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সংস্কৃতির একটি প্রতীক। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের মধ্যে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চেতনা জাগরণের জন্য ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং পৈতা ধারণ করা উচিত।

যুক্তি ৯: 'পদ্মরাজ' বা 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' পরিচয়

১৯০১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রদের মধ্যে যারা চাষ করত, তাদের পদ্মরাজ বা 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' বলা হয় । এই উপাধিটি প্রমাণ করে যে তাদের একটি নির্দিষ্ট পেশা ছিল, যা তাদের পরিচয়কে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু এটি তাদের মৌলিক পরিচয় ছিল না। এটি ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্ববিদ হার্বার্ট রিসলির জাতিগত তত্ত্বের বিপরীতে ডেনজিল ইবেটসনের পেশাভিত্তিক শ্রেণি বিভাজনের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর ফলে বোঝা যায় যে, **পৌণ্ড্রদের মর্যাদা অবনমনের পেছনে কোনো মৌলিক সামাজিক ত্রুটি নয়, বরং ঔপনিবেশিক শ্রেণিবিন্যাসের ত্রুটিপূর্ণ নীতি ছিল, যেখানে পেশা ও বর্ণকে গুলিয়ে ফেলা হয়।** এই উপাধিটি তাদের প্রাচীন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পরিচয়ের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত, **যা তাদের ক্ষত্রিয় বংশধারাকে বাতিল করে না।** উপনিবেশিক চক্রান্ত আমরা কেন বহন করব ? বরং আমাদের এটার থেকে বেরোনোর জন্য ক্ষত্রিয় আন্দোলন সঠিক সিদ্ধান্ত।

যুক্তি ১০: শব্দের অবমাননা প্রতিরোধ

আমাদের পূর্বপুরুষ এবং বর্তমান পৌণ্ড্ররা 'পোদ' শব্দটিকে একটি অবমাননাকর শব্দ হিসেবে গণ্য করেন এবং এর পরিবর্তে প্রাচীন 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেন। একটি শব্দকে অবমাননাকর হিসেবে চিহ্নিত করে তা বাতিল করার প্রচেষ্টা একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের রূপ প্রকাশ করে। এটি প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সচেতনতা ছিল যে তাদের নাম ও মর্যাদা বাহ্যিক শক্তি দ্বারা কলুষিত হচ্ছে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা ‘পৌণ্ড্র’ নামটির স্বীকৃতি অর্জন করতে সফল হলেও অবমাননাকর শব্দটি বাদ দিতে সফল হননি এবং ‘পৌণ্ড্র’ শব্দের সাথে ‘ক্ষত্রিয়’ও যুক্ত হয়নি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের উত্তরপুরুষ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এই অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করা। তাই পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নতুন করে সূচনা ঐতিহাসিক আন্দোলনের উত্তরাধিকার বহন করে ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে।

যুক্তি ১১: ঔপনিবেশিক নীতির শিকার

১৯০১ সালের আদমশুমারিতে হার্বার্ট রিসলির বিতর্কিত, জাতিগত তত্ত্বের ভিত্তিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মর্যাদা অবনমিত হয়। রিসলি বিশ্বাস করতেন যে জাতিভেদ প্রথা একটি 'আর্য-দ্রাবিড়' জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসের ফল, যেখানে দৈহিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে বর্ণের উচ্চ-নীচ নির্ধারণ করা হতো। এই অবনমন কেবল একটি সামাজিক সংজ্ঞায়ন ছিল না, বরং এটি ব্রিটিশ সরকারের একটি সচেতন রাজনৈতিক পদক্ষেপ ছিল। এই সময় ব্রিটিশরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মতো সম্প্রদায়কে বর্ণ হিন্দুদের থেকে দূরে সরিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক। ব্রিটিশদের ভাগ করো ও শাসন করো নীতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক মর্যাদা অবনমনের কারণ হয়, যা পরবর্তীতে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধের জন্ম দেয়। ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রদের অধিকার, তাই তারা নিজেদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়ে থাকে।

যুক্তি ১২: ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা মহাত্মা রাইচরণ সরদার প্রস্তাবিত তপশীলি তালিকা থেকে পৌণ্ড্রদের বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে একটি মেমরেন্ডাম প্রদান করেন। তিনি সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন এবং বলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বাংলার হিন্দু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, সুতরাং সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নিম্নবর্ণের যে তালিকা তৈরি করে তাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের উল্লেখ ছিল না। ১৮১০ সালে পুরীর জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ, যে জাতির মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, তাদের তালিকা তৈরি করেন, তাতে পৌণ্ড্ররা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯১১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রদের অন্যান্য বঞ্চিত জাতিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বলা হয় পৌণ্ড্রদের ব্যবহার ও রীতিনীতি নিম্নবর্ণের মত নয়। এমনকি এই সময়ের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা পৌণ্ড্রদের নিম্নবর্ণের মনে করত না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই সময় উচ্চবর্ণের সরকারি কর্মচারীদের কাছে সরকার নিম্নবর্ণের বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য চাইলে সেখানে তারা পৌণ্ড্রদের নাম দেননি। মিসেস অ্যানি বেসান্ত পৌণ্ড্রদের দাবিকে সমর্থন করেন।

যুক্তি ১৩: স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী, অসহযোগ, আইন অমান্য, বিপ্লবী এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মতো দেশের প্রধান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। **দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করার এই মনোভাব হিন্দুধর্মের ক্ষত্রিয় বর্ণের মূল দায়িত্বের (যুদ্ধ থেকে না পালানো) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই অবদান একটি আদর্শিক ও নৈতিক প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।** স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের কোনো বৃহৎ নেতার নির্দেশের প্রয়োজন হয়নি, কেবল অদম্য সাহস ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে তারা এতে অংশ নিয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনে বহু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যোগদান করেন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় বলেই এটি সম্ভব হয়েছিল।

যুক্তি ১৪: শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের উপর গুরুত্ব

'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ'-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল সমাজের মানুষের মধ্যে আধুনিক সমাজ সংস্কার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জাতপাত ও ধর্মের ভেদাভেদ মুছে ফেলা। এটি একটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, যা কেবল উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই সংগঠনের সংস্কারমূলক কার্যক্রম প্রমাণ করে যে তারা কেবল নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই কাজ করেনি বা করবে না বরং তারা একটি উন্নত সমাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এবং থাকবে। শিক্ষার প্রসার, আধুনিক চিন্তাধারার প্রচার এবং সামাজিক ভেদাভেদ দূর করার এই প্রচেষ্টা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উচ্চতর সামাজিক আদর্শের পরিচায়ক। ক্ষত্রিয় আন্দোলন সকল সম্প্রদায়ের জন্মগত সম মর্যাদা প্রদান, সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সামাজিক হীনমন্যতা দূরীকরণে সহায়ক হবে। তাই বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের আন্দোলন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

যুক্তি ১৫: সুসংগঠিত সামাজিক কাঠামো

'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ' গঠন করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজেদের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা ও একাত্মতাবোধ বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ শুরু করেছে। এই সংগঠন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, আলোচনা সভা এবং মেলার আয়োজন করে, যা তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়াকে শক্তিশালী করে। একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন তৈরি করা হল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের বা প্রভাবের একটি প্রাথমিক ধাপ। এটি কেবল সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধিই করবে না, বরং এটি সম্প্রদায়ের দাবিগুলোকে সরকারের কাছে আরও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতাও দেবে। ক্ষত্রিয় চেতনা এই কাজে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

যুক্তি ১৬: 'পৌণ্ড্র সেনা' ও 'দেবী বাহিনী' গঠন

'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ' সমাজের যুবকদের নিয়ে 'পৌণ্ড্র সেনা' এবং নারীদের নিয়ে 'দেবী বাহিনী' গঠনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এটি তাদের ক্ষত্রিয় আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। 'সেনা' ও 'বাহিনী'র এই নামকরণ ক্ষত্রিয়ের মূল দায়িত্ব, অর্থাৎ সমাজের সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষার প্রতি তাদের সচেতনতাকে নির্দেশ করে। এটি একটি পেশাগত পরিচয় নয়, বরং একটি আদর্শিক ও নৈতিক অবস্থান, যা সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রথা অনুযায়ী ক্ষত্রিয়ের মৌলিক গুণাবলীকে প্রতিফলিত করে। এই উদ্যোগটি সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষা ও আত্মনির্ভরতার ধারণাকে শক্তিশালী করে।

যুক্তি ১৭: কৃতী ব্যক্তিদের সংবর্ধনা ও সম্মান প্রদর্শন

পৌণ্ড্র সমাজের মানুষদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও সম্মাননা প্রদর্শনের মাধ্যমে 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ' তাদের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি করে। যখন বাইরের সমাজ তাদের মর্যাদা অস্বীকার করে, তখন নিজেদের সাফল্যের স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদানের মাধ্যমে তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসকে শক্তিশালী করে এবং নিজেদের দাবির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এটি একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, যা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতি তৈরি করে। ক্ষত্রিয় আন্দোলন একাত্মতাতে সহায়ক হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি এই আন্দোলন পৌণ্ড্রদের জন্য কেবল একটি আত্ম-মর্যাদার লড়াই ছিল না, বরং এটি একটি প্রাচীন পরিচয়কে পুনরুজ্জীবিত করার, সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলোকে পুনরুদ্ধার করার এবং ঔপনিবেশিক শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধের একটি কৌশল ছিল। এই বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায়, পৌণ্ড্রদের ‘ক্ষত্রিয়’ দাবিটি কেবল একটি আবেগিক বা কাল্পনিক দাবি নয়, বরং এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ফল। বর্তমান প্রচেষ্টাও ঐতিহাসিক স্বীকৃতির দাবী করে এবং এই দাবী একান্তভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নয়। সংরক্ষণের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত। পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয় দাবীতে অন্য কোনও সম্প্রদায়ের কোনও রকম ক্ষতি বা হানি নেই বরং পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী স্বীকৃতি পেলে পৌণ্ড্ররা সামাজিক হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠবে ও ভারত মায়ের সেবায় নব উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে।

তবে আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন সামনে আসা স্বাভাবিক। তা হল - বর্তমানে পৌণ্ড্ররা তপশীলী তালিকা ভুক্ত, তারা ক্ষত্রিয় মর্যাদা পেলে কি তপশীলী তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় পৌণ্ড্রদের তপশীলী তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ

বর্তমান সংরক্ষণের তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়া দেখলেই তা বোঝা সম্ভব। একটি সম্প্রদায়কে ভারতের তপশীলী তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও প্রশাসনিক মানদণ্ডের ওপর নির্ভরশীল, যা ঐতিহ্যের চেয়ে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এই তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়াটি একটি কঠোর প্রশাসনিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে একটি সম্প্রদায়ের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব আসে। এরপর সেই প্রস্তাবটি রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (RGI) এবং তপশীলী জাতি/উপজাতি বিষয়ক জাতীয় কমিশন (NCSC/NCST) দ্বারা যাচাই করা হয়। OBC তালিকার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (NCBC) পরামর্শ প্রদান করে। অবশেষে, ভারতীয় সংবিধানের ধারা 341 ও 342 অনুযায়ী, তপশীলী তালিকাভুক্তিতে যেকোনো ধরনের সংশোধন কেবলমাত্র সংসদীয় আইনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিটি স্পষ্ট করে যে, একটি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত পরিচয় যাই হোক না কেন, তাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ডই সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার মূল ভিত্তি।

আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় বর্ণ-পরিচয়ের ধারণাটি জন্মসূত্রে নির্ধারিত একটি স্থির সত্তা নয়, বরং এটি একজন ব্যক্তির সামাজিক জীবন ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। 'Rameshbhai Dabhai Naika vs State of Gujarat & Ors' (২০১২) মামলাটি এই জটিলতাকে স্পষ্ট করে তোলে । এই মামলার আপিলকারীর বাবা ছিলেন একজন হিন্দু ক্ষত্রিয় এবং মা ছিলেন তপশীলী উপজাতি (নয়াক) । গুজরাট হাইকোর্ট প্রাথমিক রায়ে জানায় যে, যেহেতু তার বাবা উচ্চবর্ণের, তাই সে তপশীলী উপজাতি হিসেবে তার বাবার পরিচয় গ্রহণ করবে এবং কোনো সংরক্ষণের সুবিধা পাবে না ।

তবে, সুপ্রিম কোর্ট এই রায় বাতিল করে দেয়। আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানায় যে, মিশ্র বিবাহের ক্ষেত্রে সন্তানের পরিচয় শুধু বাবার বর্ণ দিয়ে নির্ধারিত হবে এমন কোনো অপরিবর্তনীয় নিয়ম নেই । সুপ্রিম কোর্ট জোর দিয়ে বলে যে, একজন ব্যক্তির বর্ণের মর্যাদা নির্ভর করে তার সামাজিক লালন-পালন, সমাজের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং অনগ্রসরতার কারণে সৃষ্ট লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা সে ভাগ করে নিয়েছে কিনা তার উপর। এই রায়টি Valsamma Paul মামলার পূর্ববর্তী রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়, যেখানে বলা হয়েছিল যে, একজন উচ্চবর্ণের নারী বিবাহসূত্রে কোনো নিম্নবর্ণে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সংরক্ষণের সুবিধা দাবি করতে পারে না কারণ সে জন্মসূত্রে বঞ্চনার শিকার হয়নি । এই আইনি রায়টি একটি প্রথাগত ধারণার বাইরে গিয়ে এক নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মোচন করে যে, বর্ণ কেবল জন্মভিত্তিক পরিচয় নয়, বরং একটি সামাজিক ও ব্যবহারিক বাস্তবতা। একজন

উচ্চবর্ণের (ক্ষত্রিয়) বাবা থাকা সত্ত্বেও আদালত প্রমাণ দেখতে চেয়েছে যে সে সত্যিই একজন তপশীলী উপজাতির জীবনের বঞ্চনা ভোগ করেছে কিনা।

ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের তপশীলী ও অন্যান্য তালিকাভুক্তির কিছু উদাহরণ

ঐতিহ্যগতভাবে উচ্চবর্ণ হিসেবে বিবেচিত হলেও, কিছু সম্প্রদায় যারা নিজেদের 'ক্ষত্রিয়' পরিচয়ের সাথে যুক্ত করে, তাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতার কারণে সরকারি তালিকাভুক্ত হয়েছে। তাদের এই তালিকাভুক্তির মূল কারণ তাদের ঐতিহ্য নয়, বরং তাদের বর্তমান বাস্তবতা।

পেরিকা (Perika) বা পুরগিরি ক্ষত্রিয় (Puragiri Kshatriya): এই সম্প্রদায়টি তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্র প্রদেশের OBC তালিকায় স্থান পেয়েছে। তারা নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে এবং পুরাণ অনুযায়ী, পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করছিলেন, তখন তারা ব্যবসা ও বানিজ্য করে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাদের নাম 'পেরিকা' হয় । বর্তমানে তাদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ ও জমিদারি । এই গোষ্ঠী একসময় বানিজ্যে জড়িত থাকলেও, বর্তমানে তাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা তাদের OBC মর্যাদা পাওয়ার মূল কারণ।

ভভসার ক্ষত্রিয় (Bhavassar Kshatriya), থোগাট্টা বীরাক্ষত্রিয় (Thogatta Veerakshatriya), এবং আর্যক্ষত্রিয় (Aryakshatriya): এই সম্প্রদায়গুলিও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ।

কিছু সম্প্রদায় যারা ঐতিহাসিকভাবে বা নিজেদের দাবির ভিত্তিতে ক্ষত্রিয় পরিচয়ের সাথে যুক্ত, তারা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বা আদিম বৈশিষ্ট্যের কারণে তপশীলী উপজাতি (ST) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কাঁওয়ার (Kawar), কানওয়ার (Kanwar), তানোয়ার (Tanwar) বা ছত্রিয় (Chattri): এই সম্প্রদায়গুলি মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে তপশীলী উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে Tanwar একটি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ, যার উল্লেখ ঐতিহাসিক বিবরণীতে পাওয়া যায়। এই সংযোগটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যেখানে একটি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত উচ্চবংশীয় দাবি তাদের আধুনিক সরকারি শ্রেণীবিভাগকে প্রভাবিত করেনি। তাদের তপশীলী উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির কারণ হলো তাদের আদিম গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, যা ST তালিকাভুক্তির মূল মানদণ্ড।

বর্ণ এবং জাতিগত শ্রেণীবিভাগের প্রক্রিয়াটি স্থির নয়, বরং একটি চলমান এবং আইনি-প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। বর্তমানে বেশ কিছু সম্প্রদায়, যারা নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয়ের সাথে যুক্ত, তারা তপশীলী তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেছে।

কর্ণাটকের কোটেক্ষত্রিয় (Kotekshatriya) সম্প্রদায়: কর্ণাটক সরকার এই সম্প্রদায়টিকে তপশীলী জাতি (SC) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবটি বর্তমানে

রেজিস্টার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (RGI)-এর কাছে পর্যালোচনার জন্য বিচারাধীন ।

ঝাড়খণ্ডের 'ক্ষত্রিয়', পাইক, খণ্ডিত পাইক (Kshatriya, Paik, Khandit Paik) সম্প্রদায়: এই সম্প্রদায়গুলিও তপশীলী জাতি (SC) তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব দিয়েছে এবং এটিও RGI-এর পর্যালোচনার জন্য বিচারাধীন ।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে আমরা বলতে পারি পৌণ্ড্রদের "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়" স্বীকৃতির আন্দোলন বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। তপসিলি তালিকায় অবমাননাকর শব্দ বাদ দিয়ে যতদিন না পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করা হচ্ছে ততদিন এই আন্দোলন আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে পৌণ্ড্ররা বর্তমানে পিছিয়ে আছে তাই সংরক্ষণ তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের কাছে আমার একান্ত আন্তরিক আবেদন - আপনারা সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করুন এবং দাবী পূরণে যত্নবান হোন। দাবী পূরণ হলে আপনারা ঐতিহাসিক স্বীকৃতির পুণ্যবান বা পুণ্যবতী ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন।

।। জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

(এই প্রবন্ধটি সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ফেসবুক পেজ 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'তে ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়।)

ঐতিহাসিক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্ব

মহর্ষি কপিল মুনির পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যোগ

-শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল

মহর্ষি কপিল মুনি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যিনি সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক হিসেবে সুপরিচিত। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ নিজেদেরকে এই মহান ঋষির বংশধর ও পূর্বপুরুষ মনে করেন, যা শুধুমাত্র একটি ঐতিহ্যগত বিশ্বাস নয়, বরং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের গৌরবময় অতীত এবং আধ্যাত্মিক সংযোগের এক ইতিবাচক পরিচায়ক। **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা** মহর্ষি কপিল মুনিকে নিজেদের পূর্বপুরুষ মনে করেন - এ সম্পর্কিত বক্তব্যগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

১. পৌরাণিক সংযোগ - বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে মনু ও অত্রি মুনির বংশধরদের মধ্যে সরাসরি এবং গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক সংযোগ রয়েছে। এই সংযোগ প্রধানত স্বয়ম্ভুব মনুর কন্যাদের মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছে। স্বয়ম্ভুব মনু ও তাঁর পত্নী শতরূপার তিন কন্যার মধ্যে দু'জনের বংশধরেরা অত্রি মুনির বংশের সাথে যুক্ত

হন। দেবাহুতি, ইনি ছিলেন স্বয়ম্ভুব মনুর কন্যা। তিনি কর্দম মুনিকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র হলেন মহর্ষি কপিল মুনি। প্রসূতি, ইনিও স্বয়ম্ভুব মনুর কন্যা। তাঁর সাথে প্রজাপতি দক্ষকে বিবাহ দেওয়া হয়। দক্ষ ও প্রসূতির কন্যাদের মধ্যে একজন হলেন **অনসূয়া**, যিনি **অত্রি মুনিকে** বিবাহ করেন। অত্রি মুনি এবং তাঁর পত্নী অনসূয়ার পুত্র হলেন চন্দ্র বা সোম। অধিকাংশ পুরাণ, যেমন **স্কন্দ পুরাণ** এবং **মৎস্য পুরাণ** অনুসারে, **চন্দ্র হলেন ঋষি অত্রির পুত্র**। এই মতে, অত্রি মুনি মহৎ তপস্যা করার ফলে তাঁর তেজ থেকে চন্দ্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মার নির্দেশে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অত্রি মুনি কঠোর তপস্যা করেন। একসময় তাঁর তেজ নির্গত হয় এবং তা দশ দিক আলোকিত করে। সেই তেজকেই দেবতারা **সোম (চন্দ্র)** নামে গ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মা তাঁকে আকাশে স্থাপন করেন। চন্দ্র হলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদিপুরুষ যার নাম থেকে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। বংশ তালিকাটি এইরূপ - ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুরবা - পুরুরবার পুত্র আয়ু - আয়ুর পুত্র নহুষ - নহুষের পুত্র যযাতি - যযাতির পুত্র পুরু - পুরুর পরের বংশধররা হলেন - মহাবীর্য্য ২, প্রতিষ্ঠান ৩, প্রবীর ৪, মনসা ৫. অভয়দ ৬, সুধন্বা ৭, সুবাহু ৮, রৌদ্রাশ্ব ৯. কক্ষে ১০, সভানর ১১, কালানল ১২, সৃঞ্জয় ১৩, পুরঞ্জয় ১৪, জন্মেঞ্জয় ১৫, মহামণি ১৬, মহামণা ১৭, তিতিক্ষু ১৮, উষদ্রথ ১৯, ফেণ ২০, সুতপা ২১, বলি ২২, পুণ্ড্র ২৩। মহারাজ বলির পুত্র হলেন পুণ্ড্র। এই বলি কিন্তু অসুর রাজ বলি নন। অসুররাজ বলির পিতা ছিলেন বিরোচন যিনি ভক্ত প্রহ্লাদের নাতি ছিলেন। পুণ্ড্র একজন ক্ষত্রিয় আর্য রাজা ছিলেন। এই পৌরাণিক তথ্যটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি সুস্পষ্ট রাজবংশীয় এবং যোদ্ধা শ্রেণির উৎসকে নির্দেশ করে। চন্দ্রের মাতা অনসূয়া হলেন স্বয়ম্ভুব মনুর দৌহিত্রী (নাতনি) এবং কপিল মুনি হলেন স্বয়ম্ভুব মনুর দৌহিত্র (নাতি)। তাই মহর্ষি কপিল মুনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ। স্বয়ম্ভুব মনুর কন্যার দিকের বংশধারা অত্রি মুনির বংশধারার সাথে মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টির আদি লগ্নে মানব ও ঋষিদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বন্ধন স্থাপন করে।

২. ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত সংযোগ

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ক্ষত্রিয় মহারাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব। মহাভারতের যুদ্ধে পৌণ্ড্রক বাসুদেব কৌরবদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা পুণ্ড্রবর্ধন নামে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী, রাজা বাসুদেবের ভাই ছিলেন **কপিল**, যিনি যোগধর্ম অবলম্বন করে **'মহামুনি কপিল'** নামে পরিচিত হন এবং সাগরদ্বীপে (গঙ্গাসাগর) বসবাস করে 'সাংখ্য দর্শন' রচনা করেন। এই ঐতিহ্যগত বিশ্বাস পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি মহৎ এবং প্রাচীন ক্ষত্রিয় ধারার সঙ্গে যুক্ত করে। এটি কেবল

একটি বংশপরিচয় নয়, বরং একটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক পরম্পরার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

৩. সাংখ্য দর্শনের উত্তরাধিকার, গঙ্গা সাগর সংযোগ ও পৌণ্ড্র জনপদের সঙ্গে যোগসূত্র

কপিল মুনি প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শন ভারতীয় ষড়দর্শনের অন্যতম। এই দর্শন প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান এবং মোক্ষ লাভের পথ দেখায়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কপিল মুনিকে তাঁদের পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকার করেন, শুধুমাত্র একজন ঋষি হিসেবে নন, বরং জ্ঞানের এক মহৎ প্রবাহকে তাঁদের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে মনে করেন। এই সংযোগ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সংস্কৃতি ও জীবনবোধে দার্শনিক গভীরতা প্রদান করে। এটি বোঝায় যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা শুধুমাত্র যোদ্ধা বা শাসক ছিলেন না, তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মননের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ছিলেন।

পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্যে 'পুণ্ড্র' জাতির উল্লেখ রয়েছে, যাদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র ছিল প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ অঞ্চল। কপিল মুনির পৌরাণিক অবস্থানের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থল গঙ্গা সাগর বা সাগর দ্বীপের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য। পুরাণ মতে, এই স্থানেই মহর্ষি তপস্যা করতেন এবং এটি সগর উপাখ্যানের কেন্দ্রীয় মঞ্চ। এই স্থানেই অবস্থিত কপিল মুনি মন্দির। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির দিনে এখানে সুবিখ্যাত গঙ্গা সাগর মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তীর্থযাত্রীরা গঙ্গা নদীতে পবিত্র স্নান করে মন্দিরে পূজা দেন ।

গঙ্গা সাগর মেলা কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং সমাজের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। এই স্থানটি যেহেতু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত অঞ্চলে (যেমন সুন্দরবন ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা) অবস্থিত , তাই কপিল মুনির সঙ্গে তাদের একাত্মতা ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই শক্তিশালী হয়।

কপিল মুনির আশ্রমের অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন মত থাকলেও, তাঁর কর্মক্ষেত্র বৃহত্তর বঙ্গ বা পূর্ব ভারতের নিকটবর্তী ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে (যেমন গঙ্গাসাগর)। কপিল মুনির মতো একজন প্রভাবশালী ঋষির সঙ্গে এই অঞ্চলের ক্ষত্রিয় সমাজের যোগসূত্র স্থাপন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এটি এই সমাজের প্রাচীনত্ব এবং মূল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ দেয়।

৪. সাগর-উপাখ্যানের মাধ্যমে আদি ক্ষত্রিয় সংযোগঃ বংশগত সংযোগের আরেকটি ভিত্তি হল 'সগর-উপাখ্যান', যেখানে রাজা সগরের ৬০,০০০ ক্ষত্রিয় পুত্র কপিল মুনির ক্রোধে ভস্মীভূত হন। এই ঘটনা কেবল ধ্বংস নয়, বরং তা ছিল ক্ষত্রিয়ধর্মের লঙ্ঘনকারী সগর পুত্রদের পাপের দ্রুত ক্ষালন এবং বংশের শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া। যেহেতু কপিল মুনিই পরে মোক্ষ লাভের পথ দেখান , তাই এই

ব্যাখ্যা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দাবিকে কপিলের আশীর্বাদপ্রাপ্ত 'শুদ্ধ ক্ষত্রিয়' হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তাঁদের **ঐতিহ্যবাহী ক্ষত্রিয়** পরিচয়ের যোগসূত্র স্থাপন করে। 'সগর উপ্যাখ্যান' এই অঞ্চলে ক্ষত্রিয় বসতির পক্ষে মত প্রদান করে এবং বর্তমানেও এই অঞ্চলটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত। আন্দামানের সেন্টিনেল দ্বীপের বাসিন্দারা যদি সত্তর হাজার (৭০০০০) বছর ধরে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে তাহলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পক্ষে তা অসম্ভব কেন হবে? কারণ দুটি এলাকার মধ্যে যথেষ্ট ভৌগোলিক সাদৃশ্য ছিল এক সময়ে। তাই জোরের সঙ্গে বলা যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা ও ক্ষত্রিয় এবং মহর্ষি কপিল মুনির আশীর্বাদ ধন্য।

৫. পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ভ্রাতা কপিল: রাজকীয় সংযোগের শক্তিশালীকরণ: পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয় মর্যাদা দাবিকে দ্বিগুন শক্তিশালী করার জন্য, তারা পৌরাণিক সাহিত্যে উল্লিখিত **পণ্ড্রক বাসুদেবের ভ্রাতা কপিলের** রাজকীয় বংশধারাটিকেও নিজেদের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। *হরিবংশ পুরাণ* অনুযায়ী, এই কপিল বাসুদেবের পুত্র এবং কৃষ্ণের ভ্রাতা । পণ্ড্রক রাজপদ লাভ করলেও, কপিল সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন । পণ্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণের অনুকরণ করে অহংকারবশত নিহত হন , কিন্তু তাঁর ভ্রাতা কপিলের এই **তাৎক্ষণিক বৈরাগ্য** এবং আধ্যাত্মিক পথ বেছে নেওয়া (মুনিধর্ম) , একই বংশের মধ্যে নৈতিক ভারসাম্য এবং **ঐতিহ্যবাহী ক্ষত্রিয়** ধার্মিকতার প্রমাণ সরবরাহ করে। এই সংযোজন নিশ্চিত করে যে, পুণ্ড্র রাজবংশের সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সংযোগ কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা (পণ্ড্রক) নয়, বরং অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক পবিত্রতার (কপিল) মাধ্যমেও বৈধতা প্রাপ্ত।

৬. মহর্ষি কপিল মুনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ - হিন্দুধর্ম অনুসারে, বর্তমান মানবজাতির আদি পিতা হলেন সপ্তম মনু **বৈবস্বত মনু** (বা শ্রদ্ধাদেব মনু)। তাঁর থেকেই মানবজাতির দুটি প্রধান রাজবংশের উৎপত্তি হয়। **সূর্যবংশ** এবং **চন্দ্রবংশ**। মনুর পুত্র ছিলেন **ইল** (ইলারূপে পরিচিত)। শিকার করতে গিয়ে ইল ভুলবশত একটি রহস্যময় বনে প্রবেশ করেন। এই বনটি ছিল **মহাদেব শিব এবং পার্বতীর** নির্জন কেলিস্থল, যেখানে শিবের অভিশাপ ছিল যে, **কোনো পুরুষ প্রবেশ করলে সে নারীতে রূপান্তরিত হবে।** অভিশাপের ফলে ইল তৎক্ষণাৎ এক পরম রূপবতী নারী **ইলা**-তে রূপান্তরিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও নারী হয়ে গেল। ইল (নারী রূপে ইলা) তাঁর পুরুষ জীবনের সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে ফেললেন। বনের মধ্যে বিচরণ করার সময় ইলার রূপ দেখে **চন্দ্র দেবের পুত্র বুধ** (গ্রহ বুধের দেবতা) তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। বুধ ইলাকে বিবাহ করেন। ইলা ও বুধের মিলনে এক পুত্রের জন্ম হয়, যাঁর নাম **পুরূরবা**। এই পুরূরবাই হলেন বিখ্যাত **চন্দ্রবংশের** আদি পুরুষ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজেদের এই বংশের উত্তরপুরুষ মনে

করেন। অনেকে মনে করেন মনু বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও একজন ব্যক্তি ছিলেন। তাই কপিল মুনি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ মনু। সেই হিসেবে কপিল মুনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ।

৭. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মহর্ষি কপিল মুনির আশীর্বাদধন্যঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পোল্যান্ডে গুজরাটের জামনগরের রাজা দিগ্বিজয় সিংহের নামে প্রকল্প চলে এবং তাঁর নামে পোল্যান্ডে রাস্তাও আছে। কারণ তিনি অনেক পোল্যান্ডবাসীকে বিপদে আশ্রয় প্রদান করেন। ঠিক তেমনিই, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কপিল মুনিকে স্মরণ করেন। কপিল মুনি সাগর সংলগ্ন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত অঞ্চলে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন। এবং এই অঞ্চলেই তিনি পূজিত হন। গঙ্গাসাগর মেলা তাঁকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত এলাকাতে কপিল মুনির মন্দির ও তাঁকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত মেলা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সঙ্গে কপিল মুনির সংযোগকে দৃঢ় করে। এই স্থানটি বহু যুগ ধরে ঋষি **কপিল মুনির** তপস্যাস্থল হিসেবে পরিচিত। গঙ্গাসাগর মেলার সূচনা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা আধুনিক কালে হয়নি, বরং এটি হিন্দু পুরাণ অনুসারে বহু প্রাচীনকাল থেকেই একটি পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। পৌরাণিক যুগ থেকে এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এই অঞ্চলের স্থায়ী আদি বাসিন্দা ও ক্ষত্রিয় এবং মহর্ষি কপিল মুনির আশীর্বাদ ধন্য।

উপসংহার

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মহর্ষি কপিল মুনিকে নিজেদের পূর্বপুরুষ মনে করেন—এই দাবি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জীবনবোধের গভীরতা তুলে ধরে। এটি একটি ইতিবাচক আখ্যান, যা এই সমাজকে শুধুমাত্র তাঁদের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে নয়, বরং ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে। এই সংযোগ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি গৌরবময় অতীত, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদা প্রদান করে, যা তাঁদের বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্বাস তাঁদেরকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও জ্ঞানের এক সম্মানিত অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ভারতীয় ঐতিহ্যগত শাস্ত্র যেমন- পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দাবীকে সমর্থন করে। ***

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

ঐতিহাসিক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্বঃ

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেব: আর্য-ক্ষত্রিয় রাজত্বের বলিষ্ঠ প্রতিভূ

- ভাস্কর প্রতিম

মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেব ছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় (পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়) বংশের একজন **অবিসংবাদিত আর্য ক্ষত্রিয় রাজা**, যিনি পূর্ব ভারতে আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব এবং বিকল্প ধর্মীয় বৈধতা রক্ষার জন্য যাদব শক্তির বিরুদ্ধে এক গুরুতর রাজনৈতিক ও সামরিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধের সময় পূর্ব ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল মগধ ও পুণ্ড্র রাজ্য। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অনতিপূর্বে এই ভুভাগের অধীশ্বর ছিলেন মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেব। মহাভারতের সভাপর্বে ১৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, মহাবল বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি কৌরব পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় না। কারন মহাভারতের যুদ্ধের বর্ণনায় কোথায়ও তাঁর উল্লেখিত হয়নি। পৌণ্ড্র মহামাত্রের নাম উল্লেখ আছে। তাই মনে করা হয় তিনি নিজে অংশ না নিয়ে মহামাত্রের নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী নিজেদের পৌণ্ড্র রাজ্যের প্রাচীন রাজবংশের উত্তরসূরি হিসেবে দাবি করে। এই দাবিটি কেবল সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন নয়, বরং পৌরাণিক বংশলতিকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক **আর্য** পরিচয়।

জন্ম ও বংশগত পরিচয়ঃ মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের জন্ম ও বংশগত পরিচয় নিয়ে বেশ কিছু মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতানুসারে - মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের জন্ম ও বংশগত পরিচয় তাঁকে উচ্চ আর্য মর্যাদার অধিকারী করেছিল। পৌণ্ড্রকের বংশসূত্র সরাসরি উচ্চ **আর্য** মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত ছিল। **বসুদেবের ভগিনী শ্রুতাদেবীর পুত্র** মহারাজ পৌণ্ড্রক ছিলেন রাজা বৃদ্ধশর্মা এবং রানী শ্রুতাদেবীর পুত্র। শ্রুতাদেবী ছিলেন কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগিনী, অর্থাৎ পৌণ্ড্রক ছিলেন কৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই। দ্বিতীয় মতানুসারে - তিনি বসুদেব নামক একজন রাজার পুত্র ছিলেন এবং সে কারণেই তাঁর নাম 'বাসুদেব' রাখা হয়েছিল। অনেকেই তাকে **'পৌণ্ড্রক বাসুদেব'** বলতেন। মাতার নাম ছিল নারাচী। পৌণ্ড্রকের বড়

ভাইয়ের নাম ছিল কপিল, যিনি যোগধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন এবং সাংখ্যযোগ রচনা করেন বলে মনে করা হয়। তাই মত পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের জন্ম ও বংশগত পরিচয় উচ্চ **আর্য** মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত ছিল। অন্যদিকে, পুরাণে কপিল মুনির পিতা ও মাতা হিসাবে কর্দম ঋষি ও দেবাহুতির নাম পাওয়া যায়। ফলে মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের জন্ম ও বংশগত পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলেও তাঁর উচ্চ **আর্য** মর্যাদা নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি নেই।

মহারাজ পৌণ্ড্রকের আর্য পরিচয়ের সপক্ষে আরও দুটি বলিষ্ঠ যুক্তি হলো:

১. **পৌরাণিক ক্ষত্রিয় ধারা:** মহাভারত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে পৌণ্ড্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা বলির পুত্র। রাজা বলিকে প্রাচীন আর্য-ক্ষত্রিয় রাজবংশের পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা পৌণ্ড্র রাজাদের আদিম **আর্য** উৎসকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ।

২. **পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের আর্য সংযোগ:** ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিত করে যে পূর্ব ভারতের 'পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য' খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ সালের দিকে **আর্য** রাজাদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের রাজত্বকাল সেই প্রতিষ্ঠিত **আর্য-ক্ষত্রিয়** ঐতিহ্যেরই ধারাবাহিকতা বহন করে ।

মহাভারতে উল্লেখ আছে যে পরশুরামের আক্রমণে পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় আচার থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন এবং তাদের এই আচারগত ভিন্নতার জন্য পৌণ্ড্র রাজাদের 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' (Fallen Arya) বলা হত। তাই 'ব্রাত্যত্ব' হলো কেবল আচার-বিচ্যুতি, যা তাদের **আর্য** জাতিগত উৎসের বিলুপ্তি ঘটায় না।

মহারাজ পৌণ্ড্রক ছিলেন এক প্রতিষ্ঠিত, সম্পদশালী **আর্য** রাজ্যের শাসক, যিনি কেবল কর সংগ্রহ করতেন না, বরং একাধিক রাজার কাছ থেকে কর আদায় করার মতো শক্তিশালী ক্ষমতা রাখতেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সংঘাত হয় এবং তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

সংঘাতের প্রেক্ষাপট:

মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ‘বাসুদেব’ উপাধি দাবি ছিল শ্রীকৃষ্ণের যাদব আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক বৈধ, রাজনৈতিকভাবে গুরুতর, এবং ধর্মীয় পরিচয়ের দৃঢ় প্রতিস্থাপন। এই সংঘাত ছিল প্রাচীন উত্তর ভারতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের এক তীব্র প্রচেষ্টা। পৌণ্ড্রক ছিলেন সেই সময়ের অন্যতম শক্তিশালী সামরিক জোটের প্রধান মিত্র। এই জোটের মূল স্তম্ভ ছিল **মগধের জরাসন্ধ,** যিনি বহু রাজা ও রাজপুত্রকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করে উত্তর ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মহারাজ পৌণ্ড্রক তাঁর ঘনিষ্ঠ

মিত্র ছিলেন। অন্যদিকে **কাশীরাজ,** যিনি তাঁর তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে মহারাজ পৌণ্ড্রককে সক্রিয়ভাবে সামরিক সমর্থন প্রদান করেছিলেন। পাঁচ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সম্মিলিত সামরিক শক্তির নেতৃত্বে থাকা মহারাজ পৌণ্ড্রককে কোনো বিচ্ছিন্ন রাজা হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর বিরোধিতা ছিল একটি কৌশলগত প্রতিরোধ, যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ভারতে যাদবদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে প্রতিহত করা। শ্রীকৃষ্ণ এই আঞ্চলিক আর্য-জোটকে ধ্বংস করার জন্যই সামরিক অভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মহারাজ পৌণ্ড্রকের বাসুদেব উপাধি দাবি কেবল অহংকারের ফল ছিল না; এটি শিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল। *পদ্ম পুরাণ* অনুসারে, মহারাজ পৌণ্ড্রক **বারো বছর ধরে** মহাদেবের উপাসনা করেন। তিনি শিবের কাছে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে কৃষ্ণের মতো চতুর্ভুজ রূপ, চক্র, শঙ্খ, গদা, পদ্ম, হলুদ বসন এবং কৌস্তুভের মতো অলঙ্কারাদি লাভ করেন।

পৌণ্ড্রকের এই রূপ **শিবের** মতো একজন প্রধান **আর্য** দেবতার কাছ থেকে প্রাপ্ত বর দ্বারা বৈধ ছিল। এই ঘটনাটি নির্দেশ করে যে তাঁর দাবি নিছক অনুকরণ ছিল না; এটি ছিল একটি আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক (শৈব-বৈষ্ণব) ধর্মতাত্ত্বিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বকে বিজয়ী বৈষ্ণব পুরাণগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে "অনুকরণ" বা "ভণ্ডামি" হিসেবে চিহ্নিত করে শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া দেবত্বের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। মহারাজ পৌণ্ড্রক তাই ব্যর্থ হলেও, তিনি ছিলেন পূর্বাঞ্চলের **আর্য** ঐতিহ্য দ্বারা স্বীকৃত এক প্রতিযোগী 'বাসুদেব' ।

মহারাজ পৌণ্ড্রক কৃষ্ণের প্রতীকগুলি গ্রহণ করেছিলেন, যেমন গরুড় পতাকা সম্বলিত রথ । এই প্রতীকগুলি ছিল তাঁর স্বাধীন **আর্য** রাজত্বের সমকক্ষ সার্বভৌমত্ব ঘোষণার একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে তিনিই একমাত্র 'পরম পুরুষোত্তম বাসুদেব' এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রতীকগুলি ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। এটি ছিল একটি আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং সার্বভৌমত্বের উপর সরাসরি দাবি। মহারাজ পৌণ্ড্রকের এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে তিনি নিজেকে কেবল কৃষ্ণের সমকক্ষ নন, বরং **তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর্য শাসক** হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

মহারাজ পৌণ্ড্রকের সামরিক শক্তি এবং তার পরিণতি প্রমাণ করে যে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ **আর্য** প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, যাকে নির্মূল করার জন্য চরম সামরিক বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল। মৎস্য পুরাণে মহারাজ পৌণ্ড্রককে **"মহৎ যোদ্ধা"** হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণের আক্রমণের খবর শুনেই তিনি কালবিলম্ব না করে তাঁর বিপুল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি ও তাঁর মিত্র

কাশীরাজ সম্মিলিতভাবে পাঁচ অক্ষৌহিণী সৈন্যের এক বিশাল আর্য-জোট নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই সামরিক মোতায়েন প্রমাণ করে যে এই সংঘাত ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ মহাযুদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক তাঁর আর্য-ক্ষত্রিয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক অস্ত্র সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁর মস্তক ছিন্ন করা হয়। পৌণ্ড্রকের মৃত্যুর পরও কৃষ্ণের শক্তি তাঁর মিত্রদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ছিল। কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ প্রতিশোধ নিতে তান্ত্রিক যজ্ঞের মাধ্যমে এক রাক্ষসীকে সৃষ্টি করেন। শ্রীকৃষ্ণ এর জবাবে সুদর্শন চক্রকে প্রেরণ করেন, যা রাক্ষসীকে অনুসরণ করে কাশী নগরী সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ করে। কাশী ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও বৌদ্ধিক কেন্দ্র। এই নগরীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার মাধ্যমে দ্বারকা তার বিপুল শক্তি এবং নির্মমতা প্রদর্শন করেছিল।

হরিবংশের ভবিষ্যপর্বের ৯৩ অধ্যায়ে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের এক বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাসুদেবের বন্ধু ছিলেন প্রাগজ্যোতিষপুররাজ নরক। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নরক নিহত হলে বাসুদেব বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অষ্ট সহস্র রথ, বহু সহস্র গজ ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্য নিয়ে দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম গ্রন্থের দশম স্কন্ধের ছেষট্টিতম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেব দুই অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মিত্র কাশীরাজ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ সম্রাট বাসুদেবকে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া পূর্বভারতের সমস্ত রাজণ্যবর্গ এই যুদ্ধে মহারাজ বাসুদেবকে সাহায্য করেছিলেন। এইসব রাজণ্যবর্গের মধ্যে নিষাধরাজ একলব্যও ছিলেন। **শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ বাসুদেবের বীরত্বে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, এর কি আশ্চর্য বীর্য, কি দুঃসহ ধৈর্য।**

যাইহোক, শেষপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের রাজ্য গ্রাস করেন নি। তিনি তাঁর অনুগত মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কাকা বীরমণিকে পৌণ্ড্র রাজ্যের দায়িত্ব দেন। বীরমণি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। এই কারণে পৌণ্ড্র রাজ্যের মানুষরা শ্রীকৃষ্ণ উপাসকে পরিণত হয়। বর্তমানেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসন অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে প্রতিফলিত করে।

উপসংহারঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেব ছিলেন প্রাচীন ভারতের পূর্ব প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত এক শক্তিশালী, বংশগতভাবে বৈধ আর্য ক্ষত্রিয় রাজা, যিনি স্বাধীন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রতীক ছিলেন। তাঁর যুদ্ধ ছিল কেবল ব্যক্তিগত অহংকারের বহিঃপ্রকাশ নয়, ভারতের ক্রমবর্ধমান যাদব

আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিরোধ। তাঁর পরাজয় প্রমাণ করে যে কীভাবে সফল সাম্রাজ্যিক শক্তিগুলি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ইতিহাসকে পুনর্লিখন করে, তাদের বৈধ রাজনৈতিক দাবিগুলিকে 'অহংকার' ও 'মূর্খতা'র মোড়কে মুড়ে দেয়। মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আখ্যানটি একজন ব্যর্থ রাজার হলেও এটি একটি গুরুতর আর্য প্রতিদ্বন্দ্বীর চিত্র তুলে ধরে, যাঁর চ্যালেঞ্জকে প্রতিরোধ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা ভারতে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহারাজ বাসুদেব ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে গেছেন। তাঁর অসীম বীরত্ব, সাহসিকতা, বন্ধু বাৎসল্য কিংবদন্তীর স্তরে উন্নীত হয়েছে। তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ট কীর্তিমান পুরুষ।

হে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ, আপনারা রাজার জাতি। আর্য রক্ত আপনাদের দেহে প্রবাহিত হচ্ছে। তাই কাপুরুষতা, দুর্বলতা, পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরামুখাপেক্ষা ইত্যাদি দাসসুলভ মানসিকতা পরিত্যাগ করে জাগরিত হোন। নিজেকে আত্মজাগরিত করুন ও ক্ষত্রিয় আচরণে সমৃদ্ধ করুন। অপরের কাছে ক্ষত্রিয়সুলভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উন্নয়নে ক্ষত্রিয় শক্তিকে কাজে লাগান।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাকাব্য: আত্মমর্যাদা ও অবিচল ক্ষত্রিয় উত্তরাধিকার

- ঋকলোচন পৌণ্ড্র

আমি যখন আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে দেখি, তখন দেখি এক ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিক প্রতিকূলতা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক অবিচল লড়াই চালিয়ে নিজেদের প্রাচীন গৌরব ও আত্মমর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে আমাদের 'অস্পৃশ্য' হিসেবে চিহ্নিত করার যে চেষ্টা হয়েছিল , আমরা তা কখনও মেনে নিইনি। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে আমরা এক দৃঢ় ও সুসংগঠিত আত্মমর্যাদা আন্দোলনের (Self-Respect Movement) মাধ্যমে নিজেদেরকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছি । আমরা, এই সম্প্রদায়, প্রায় আড়াই মিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছি ।

আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ইতিহাস নিছক একটি জাতিগত পরিচয় নয়; এটি সামাজিক স্থবিরতার (Social Stasis) বিরুদ্ধে জাতিগত গতিশীলতার (Caste Mobility) এক জ্বলন্ত উদাহরণ। আমরা

আমাদের অতীতকে সক্রিয়ভাবে পুনর্নির্মাণ করে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা (ক্ষত্রিয়) দাবি করতে শুরু করি । আমাদের এই সক্রিয় প্রতিরোধ প্রমাণ করে যে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস কখনই স্থিতিশীল ছিল না, বরং আমাদের মতো সমাজের স্ব-উদ্যোগী অংশ দ্বারা তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। আমাদের আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল এই চ্যালেঞ্জ, যা দেখায় যে সামাজিক পরিবর্তন কেবল ওপর থেকে চাপানো হয় না, স্ব-উদ্যোগেও তা অর্জন করা সম্ভব।

আমাদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংগঠিত প্রতিরোধের ইতিহাস। আমরা শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আইনি লড়াইকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম। ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিকূলতা এবং সমাজের উচ্চবর্গের বিরোধিতার মুখে আমাদের অদম্য সংকল্প আধুনিক ভারতে সামাজিক আন্দোলনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল সামাজিক কলঙ্ক মোচন, স্ব-উন্নয়ন সাধন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রের এক শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা ।

আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আত্মমর্যাদার দাবির ভিত্তি সুদূর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে প্রোথিত। আমরা কৌশলগতভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যবহার করে আমাদের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত হওয়ার ঐতিহাসিক বৈধতা প্রতিষ্ঠা করেছি, যা আমাদের আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে ।

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে, আমাদের পুণ্ড্র রাজ্য একসময় সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করত। এই আঞ্চলিক শক্তি এবং সমৃদ্ধির স্মৃতি আমাদের বর্তমান আত্মবিশ্বাসের মূল উৎস। শাস্ত্রীয় সাহিত্যেও আমাদের উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি মেলে: *ঐতেরেয় আরণ্যক* নামক প্রাচীন গ্রন্থে আমরা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশধর হিসেবে উল্লিখিত হয়েছি , যা আমাদের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় যোগসূত্রকে ইঙ্গিত করে। এছাড়া, *বায়ু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ* এবং *মহাভারতের সভা পর্ব*-তে সুস্পষ্টভাবে আমাদের পুণ্ড্র ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করা হয়েছে । এই প্রমাণগুলি আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের জন্য একটি অভ্রান্ত ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপন করে এবং জোর দিয়ে বলে যে সমাজের বর্তমান পশ্চাৎপদতা বংশগত ত্রুটির ফল নয়, বরং বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা সামাজিক অবনমনের পরিণতি।

আমাদের সমাজ প্রথমে ক্ষত্রিয় মর্যাদা লাভ করলেও, পরে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনে বিচ্যুত হয় এবং ব্রাত্য ক্ষত্রিয় রূপে পরিগণিত হয়। ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিক হার্বার্ট হোপ রিজলি ১৮৯১ সালে আমাদের নিয়ে গবেষণা করার সময় অস্পৃশ্যতার শিকার হওয়ার কথা নথিভুক্ত করেন , তবে তিনি একই সঙ্গে আমাদের আচরণ ও অভ্যাসকে

'প্রায় সৎশূদ্র' বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহারে কোনো নীচতা দেখাইনি । এই দ্বৈত পর্যবেক্ষণটি প্রমাণ করে যে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের নিচে থাকা সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল।

আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ইতিহাস কেবল রাজনৈতিক সংগ্রামের নয়, পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা এবং কঠোর পরিশ্রমের ইতিহাসও বটে। গৌড়বঙ্গ থেকে আমরা দুর্গম সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন শুরু করি। এই কর্ম আমাদের পূর্বপুরুষদের অদম্য সাহস, কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং প্রতিকূল পরিবেশকে কৃষিকাজের উপযোগী করে তোলার অসাধারণ দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। এই ঐতিহাসিক স্থান পরিবর্তন এবং পরিবেশগত অভিযোজনই আমাদের সামাজিক স্থায়িত্বের মূল কারণ। যদিও অনেকে মনে করেন আমরা বর্তমান সুন্দরবন (ভারত) অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। কপিল মুনির সাথে ক্ষত্রিয়যোগ এটা প্রমাণ করে।

আমরা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও হাওড়াতে পাশাপাশি, বাংলাদেশেও খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাটের দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের বসতি রয়েছে। পুরাণ ও মহাকাব্যের ক্ষত্রিয় দাবি নিয়ে আমরা কঠিন, জঙ্গলময় সুন্দরবন এলাকায় বসতি স্থাপন করি এবং সেই স্থানগুলিকে কৃষিনির্ভর সমাজে পরিণত করার প্রক্রিয়াটি আমাদের সামরিক ঐতিহ্য থেকে সরে এসে কঠোর কৃষি-নির্ভরতা এবং পরিবেশগত অভিযোজনকে নির্দেশ করে। আমাদের সংস্কৃতি সেই স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের প্রতীক।

আমাদের আত্মমর্যাদা আন্দোলন ছিল ঔপনিবেশিক আমলের অপমানজনক জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসের বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক সুসংগঠিত সংগ্রাম। ঔপনিবেশিক জনগণনা যখন আমাদের মর্যাদাহানি করার চেষ্টা করছিল, তখন আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বেণীমাধব হালদার এবং শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণের মতো আমাদের প্রভাবশালী সদস্যরা জাতিগত ইতিহাস নিয়ে বহু প্রচারপত্র রচনা করেন। আমরা দৃঢ়ভাবে যুক্তি দিই যে আমরা আসলে প্রাচীন 'Poundras' থেকে বংশোদ্ভূত এবং আমরা ক্ষত্রিয় মর্যাদার অধিকারী। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষত্রিয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক কলঙ্ক মোচন করা ।

এই সংগ্রামটি **'Self Respect Movement' বা 'আত্ম মর্যাদা আন্দোলন'** নামে পরিচিত । এই আন্দোলনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় ১৯০১ সালে, যখন বেণীমাধব হালদার একটি প্যান-বেঙ্গল সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের জাতিটির নাম

"Poundra" হিসেবে পুনঃনামকরণের দাবি উত্থাপন করা হয়। এই সাংগঠনিক প্রচেষ্টা আমাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে সুদৃঢ় করে তোলে এবং সমাজের আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

আমাদের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ছিল সামাজিক সংস্কার এবং ক্ষত্রিয় রীতিনীতির পুনঃপ্রবর্তন করা, যা ছিল সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের একটি উপায়। মর্যাদা পুনরুদ্ধারের অংশ হিসেবে আমরা সকল পৌণ্ড্রকে ক্ষত্রিয় আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হয়। আমরা কেবল নাম পরিবর্তনের মাধ্যমেই সন্তুষ্ট ছিলাম না; বরং আমরা দ্বাদশাহশৌচ (১২ দিনের অশৌচ কাল) এবং পৈতা (পবিত্র সুতো) পরিধানের মতো ক্ষত্রিয় ধর্মীয় আচার পালনের অধিকার শুরু করি। এই দাবিগুলি আমাদের জীবনযাত্রা এবং ধর্মীয় অনুশীলনকেও উচ্চ মানদণ্ডে উন্নীত করার সংকল্পকে প্রতিফলিত করে।

আমাদের আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নির্ভর করেছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আইনি স্বীকৃতি অর্জনের ওপর। মহাত্মা রাইচরণ সর্দার, যিনি আমাদের সম্প্রদায়ের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট এবং একজন আইনজীবী ছিলেন, এই আইনি ও রাজনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। আমরা বারবার জনগণনা কর্তৃপক্ষকে আবেদন জানাই। ১৯২১ সালের সেন্সাসে রাইচরণ সর্দার ও মহেন্দ্রনাথ করণের নেতৃত্বে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়, যেখানে নিম্নবর্ণের তালিকা থেকে আমাদের বাদ দেওয়া এবং সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়। এই সময়ে আমরা *Poundra Kshatriya Kula-Pradip* এর মতো বইও জমা দিই, যাতে সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্ট আমাদের উচ্চ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন ।

অবশেষে, ১৯৩৮ সালের ৬ই মে, বেঙ্গল সরকারের সচিব পতিরাম রায়কে (এমএলএ) চিঠি দিয়ে জানান যে সরকারি নথি ও আদালতের কার্যক্রমে এই সম্প্রদায়কে 'পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়' হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। ১৯৩৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পতীরাম রায় বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে এই সম্প্রদায়কে 'পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়' হিসেবে চিহ্নিত করার দাবি পেশ করেন, যা সভায় গৃহীত হয়। আমাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলস্বরূপ, স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে আমাদের 'পৌণ্ড্র (ক্ষত্রিয়)' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে , যা ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আত্মমর্যাদার চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার।

আমাদের সমাজের নেতারা দ্রুত উপলব্ধি করেছিলেন যে কেবল ঐতিহাসিক দাবি বা আচার-অনুষ্ঠান পরিবর্তনই সামাজিক উত্তরণের একমাত্র পথ নয়; শিক্ষা ছিল দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ, সমাজপিতা

বেণীমাধব হালদার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং মহাত্মা রাইচরণ সরদারের মতো ব্যক্তিত্বরা দৃঢ়ভাবে প্রচার করেন যে শিক্ষার মাধ্যমেই আমাদের সমাজের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব। আমরা সমাজের জন্য শিক্ষামূলক অবকাঠামো তৈরি করার উপর গুরুত্ব দিই। অনুকূল চন্দ্র দাস নস্কর দক্ষিণবঙ্গে আমাদের সমাজে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখেন। মহাত্মা রাইচরণ সর্দার, একজন আইনজীবী ও আমাদের সমাজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হিসেবে, ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় **'আর্য পৌণ্ড্রক'** নামে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করেন । এই ছাত্রাবাসটি মফস্বল থেকে আসা দরিদ্র ছাত্রদের জন্য আশ্রয় ও শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করে, যা বৈষম্যের মুখে আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে মানব পুঁজি (Human Capital) তৈরির এক কৌশলগত এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

আমাদের শিক্ষিত নেতারা লেখনিকে আন্দোলনের মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সমাজের আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঐতিহাসিক আখ্যান পুনর্নির্মাণে সহায়তা করেন। এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস তৈরি করেছে।

বেণীমাধব হালদারের রচিত *JATICHANDRICA* **(জাতিচন্দ্রিকা)** বইটি আমাদের জাতিসত্তা গঠনে এবং আমাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তিনি শ্লোক ব্যবহার করে জটিল নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। তিনি যুক্তি, গবেষণা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে আমরা প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়।

অন্যদিকে, মহেন্দ্রনাথ করণ ছিলেন একজন কবি, বক্তা, ঐতিহাসিক এবং জনহিতকর ব্যক্তি। তিনি প্রায় ২০টি বই রচনা করেন এবং সামাজিক উন্নতির জন্য লাইব্রেরি ও দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালের মার্চ মাস থেকে তিনি '*Poundrakshatriya Samachar* নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করা শুরু করেন, যা আমাদের সমাজের আদর্শ প্রচার এবং অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। '*Poundra Kshatriya Kula-Pradip'* এর মতো গ্রন্থগুলির মাধ্যমে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা দৃঢ় যুক্তি, গবেষণা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ও উচ্চবর্গীয়দের আরোপিত বর্ণনার মোকাবিলা করেন। এই প্রকাশনাগুলি আমাদের আত্মবিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি বিকল্প সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক আখ্যান তৈরি করেছিল, যা আমাদের মধ্যে আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে ।

আমাদের বহু দশকের আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে স্বাধীন ভারতে। আমাদের দৃঢ় ও সুসংগঠিত আত্মমর্যাদা আন্দোলনের ফলস্বরূপ, ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে আমাদের 'পৌণ্ড্র (ক্ষত্রিয়)' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই আইনি স্বীকৃতি কেবল একটি নাম পরিবর্তন বা

প্রতীকী বিজয় ছিল না, এটি ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ঐতিহাসিক মর্যাদার আনুষ্ঠানিক পুনরুদ্ধার।

বৃহত্তর জনসংখ্যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত করেছে। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে আমাদের জনসংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়ন। আমাদের এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ঔপনিবেশিক আমলেও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল (১৯০১ সালে ৪.৬৪ লক্ষ থেকে ১৯৩১ সালে ৬.৬৭ লক্ষ পর্যন্ত) ।

অর্থনৈতিকভাবে, আমরা কঠোর পরিশ্রমের প্রতীক। গৌড়বঙ্গ থেকে সুন্দরবনের মতো কঠিন পরিবেশকে বাসযোগ্য ও উৎপাদনশীল ভূমিতে পরিণত করার যে ঐতিহাসিক সক্ষমতা দেখিয়েছি , তা বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে আমাদের অনস্বীকার্য অবদানকে তুলে ধরে। আমরা বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। ঔপনিবেশিক সময়ে আমরা প্রধানত কৃষক ও মৎস্যজীবী হলেও, আমাদের মধ্যে ব্যবসায়ী এবং কিছু ক্ষেত্রে জমিদারও ছিলেন। এই অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য আমাদের স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের আগ্রহকে নির্দেশ করে।

শিক্ষার প্রসার, সাংগঠনিক সচেতনতা এবং প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে আমরা বর্তমানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছি। পতিরাম রায়ের মতো নেতারা ১৯৩৯ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে আমাদের দাবি প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন যে আমরা গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন ।

শিক্ষামূলক উদ্যোগের কারণে, বর্তমানে আমাদের সমাজের বহু সদস্য শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী এবং সরকারি প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যা কেবল ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয়, বরং আমাদের সমাজের সামগ্রিক মান ও মর্যাদার উত্থান নিশ্চিত করছে।

আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ আমাদের নিজস্ব জাতিগত পরিচিতি বজায় রেখেও বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতিতে গভীরভাবে মিশে গেছে। আমরা বাঙালি হিন্দু সমাজের অন্যান্য বড় উৎসবগুলি সাড়ম্বরে পালন করি, যার মধ্যে রয়েছে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোলযাত্রা, ভাইফোঁটা, লক্ষ্মীপূজা, নববর্ষ (পয়লা বৈশাখ) ইত্যাদি।

পাশাপাশি, আমরা বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোক উৎসব, যেমন শিব গাজন বা চড়ক পূজাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। গাজন উৎসব বাংলার অন্যতম প্রাচীন উৎসব হিসেবে পরিচিত। এই উৎসবে অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, সামাজিক মর্যাদায় আমরা ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও, আমরা বাংলার

সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেদের সাংস্কৃতিক সংযোগ বজায় রেখেছি।

আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ বর্তমানে নতুন উদ্যম নিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি, যা কেবল অভ্যন্তরীণ কল্যাণমূলক কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেশের প্রতি আমাদের অবদান রাখার আকাঙ্ক্ষাকেও তুলে ধরে। ২০২০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত **'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ'** হলো এমনই একটি সার্বিক উন্নয়নমূলক সংগঠন ।

এই সংগঠন আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী অবস্থান আমাদের দীর্ঘদিনের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের সফলতা এবং সামাজিক আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। আমরা এখন নিজেদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করছি। আমাদের লক্ষ্য হলো দেশের প্রতিটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী-পুরুষকে সংগঠিত করে সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশমাতাকে মজবুত করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক এজেন্ডাকে পরিচালনা করবে এবং জাতীয় উন্নয়নে আমাদের ভূমিকাকে সুদৃঢ় করবে।

আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ইতিহাস হলো আত্মমর্যাদা, দৃঢ়তা এবং সফল পুনরুত্থানের ইতিহাস। ঔপনিবেশিক আমলের অপমান এবং সামাজিক কলঙ্ককে আমরা আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে পরাজিত করেছি। সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার এবং মহাত্মা রাইচরণ সর্দারের মতো দূরদর্শী নেতৃত্বের অধীনে শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে হাতিয়ার করে আমরা যে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছিলাম, তার ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালে সরকারিভাবে আমাদের মর্যাদার স্বীকৃতি মেলে ।

আমরা আমাদের প্রাচীন ক্ষত্রিয় ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখেছি এবং একই সঙ্গে আধুনিক সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা, সংগঠন ও রাজনৈতিক সচেতনতাকে গ্রহণ করেছি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ কেবল ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত একটি নাম নয়, এটি বাংলার সমাজে আত্ম-প্রচেষ্টা, স্থিতিস্থাপকতা এবং অবিচল প্রগতির এক জীবন্ত প্রতীক, যা ভারতের সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক অধ্যায় রচনা করেছে।***

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণের জন্য সকল পাঠকের নিকট থেকে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। বছরের যে কোনও সময় লেখা পাঠানো যাবে। লেখা পাঠাতে হবে Email ID: poundrakshatriyadarpan@gmail.com **তে এবং ৯৮০০২৯৬৬৪৮ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ।**

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অর্থনীতি

মুসলিম অনুপ্রবেশ (অবৈধ অভিবাসন) এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতিসমূহ এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কর্তব্য

- শ্রীরাধামাধবাচার্য

মুসলিম অনুপ্রবেশ বর্তমান সময়ে ভারতে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এরফলে ভারতীয়রা ব্যপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কী কী ক্ষতি হচ্ছে জানার আগে কেন মুসলিমদের অনুপ্রবেশকারী বলা হচ্ছে সে বিষয়টি জেনে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে।

ভারতে 'মুসলিম অনুপ্রবেশকারী' শব্দটি ব্যবহার করা হয় মূলত **বাংলাদেশ থেকে হওয়া অবৈধ অভিবাসন এবং এর ফলে সৃষ্ট জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের উদ্বেগকে** তুলে ধরার জন্য। ১৯৪৭ সালের আগে মুসলিমরা ভারত ভাগের দাবী করে এবং তারা বলে যে হিন্দু মুসলিম পৃথক জাতি, তাই মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়জন। বলা যায় মুসলিমরা দেশ আদায়ের জন্য কলকাতা কিলিং নামে গনহত্যা পর্যন্ত করে। ফলে দেশ ভাগ হয়ে তিন খণ্ড হয় এবং দু খণ্ড পাকিস্তান নামে মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত হয়। যেহেতু মুসলিমরা ভারতকে ভাগ করে নিজেদের দেশ পেয়ে গেছে, সেইহেতু তাদের আর ভারতের উপর কোনও দাবী থাকা উচিত নয় বলে নৈতিক দিক থেকে বিষয়টি সমর্থন যোগ্য। সরকারী অবস্থান অনুযায়ী, 'অনুপ্রবেশকারী' (Infiltrator) হলো তারা যারা **অবৈধভাবে** এবং **অর্থনৈতিক বা অন্য উদ্দেশ্যে** দেশে প্রবেশ করে। অন্যদিকে, 'শরণার্থী' (Refugee) হলো তারা, যারা পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে **ধর্মীয় নিপীড়নের** শিকার হয়ে আশ্রয় নিতে ভারতে আসে (যেমন—হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান)। অভিযোগ করা হয় যে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী মুসলিম অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরার মতো সীমান্ত রাজ্যগুলোতে বসতি স্থাপন করছে। ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী, ভারতে **মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার** (২৪.৬%) হিন্দুদের বৃদ্ধির হার (১৬.৮%) এর তুলনায় অনেক বেশি। এই দ্রুত বৃদ্ধির কারণ হিসেবে **প্রাকৃতিক জন্মহারের চেয়ে অনুপ্রবেশকে** প্রধানত দায়ী করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে (যেমন—আসামে ২৯.৬% এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় ৭০% পর্যন্ত), যা **বৃহত্তর অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত** দেয়। যারা দেশ ভাগ করে আলাদা দেশ চেয়েছিল তারা যখন নিজেদের দেশ পেয়ে যাওয়ার পরও অন্য দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করে তখন তাদের সন্দেহের চোখে দেখার যথেষ্ট কারন তৈরি হয়। মুসলিমদের এইসব কারণে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ভাবা হয়।

মুসলিম অনুপ্রবেশ (অবৈধ অভিবাসন) এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতিসমূহ

১. **সম্পদ ও পরিষেবার উপর চাপ:** অনুপ্রবেশকারীরা সীমিত সম্পদ (যেমন—জল, বিদ্যুৎ, জমি) এবং জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

২. **বেতন হার হ্রাস:** অবৈধ অভিবাসীরা কম মজুরিতে কাজ করতে রাজি থাকে, যা স্থানীয় অদক্ষ শ্রমিকদের বেতন হার কমিয়ে দেয়।

৩. **অবকাঠামোর উপর বাড়তি চাপ:** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাস্তাঘাট, গণপরিবহন এবং অন্যান্য নাগরিক অবকাঠামো অতিরিক্ত ব্যবহারজনিত চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. **সরকারি ব্যয়ের বৃদ্ধি:** অনুপ্রবেশকারীদের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সরকারকে অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা করদাতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

৫. **ভূমি এবং সম্পত্তির উপর চাপ:** অবৈধ বসতি স্থাপন বা দ্রুত জনসংখ্যার কারণে কৃষি জমি বা অন্যান্য মূল্যবান ভূমির উপর চাপ বাড়ে।

৬. **শ্রম শোষণ বৃদ্ধি:** অনুপ্রবেশকারীরা আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে তাদের শোষণ, কম বেতন এবং খারাপ কাজের পরিবেশের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

৭. **অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ও রাজস্ব ক্ষতি:** অবৈধ অভিবাসীরা প্রায়শই কর এবং সরকারি নিয়মের বাইরে কাজ করে, যার ফলে সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব হারায়।

৮. **পরিবেশগত ক্ষতি:** অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন এবং অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহারের কারণে স্থানীয় পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র (Ecology) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৯. **সাংস্কৃতিক সংঘাত ও উত্তেজনা:** স্থানীয় ও অনুপ্রবেশকারী জনগোষ্ঠীর ভিন্ন জীবনযাত্রা, ধর্মীয় বিশ্বাস বা রীতিনীতির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে, যা সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে।

১০. **বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি:** অর্থনৈতিক চাপ এবং দ্রুত আবাসন সংকটের কারণে শহরের প্রান্তিক অঞ্চলে বস্তি বা অস্বাস্থ্যকর বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

১১. **জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি:** যথাযথ যাচাই ছাড়াই ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এবং সমাজবিরোধী শক্তির অনুপ্রবেশের ঝুঁকি বাড়ে।

১২. **পরিচয় যাচাইয়ের চ্যালেঞ্জ:** অনুপ্রবেশকারীদের সঠিক পরিচয়, অপরাধমূলক রেকর্ড বা অতীত ইতিহাস যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা আইনি ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

১৩. **সীমান্ত ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা:** অবৈধ অনুপ্রবেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উপর চাপ বাড়ায় এবং সীমান্ত এলাকায় মানব পাচার, মাদক চোরাচালান ও অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে।

১৪. **আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি:** অর্থনৈতিক দুর্দশা বা সামাজিক বঞ্চনার কারণে অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

১৫. **নাগরিকত্বের উপর চাপ:** অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সন্তানরা দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করলে তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী আইনি ও রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করে।

১৬. **জনতাত্ত্বিক ভারসাম্য পরিবর্তন:** একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যাপক অনুপ্রবেশ দীর্ঘমেয়াদে একটি অঞ্চলের জনতাত্ত্বিক কাঠামো ও ধর্মীয় ভারসাম্য পরিবর্তন করতে পারে।

১৭. **রাজনৈতিক মেরুকরণ বৃদ্ধি:** অনুপ্রবেশের ইস্যু প্রায়শই স্থানীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত মেরুকরণ সৃষ্টি করে।

১৮. **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণ, নির্বাসন বা পুনর্বাসনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, যা সামগ্রিক রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ায়।

১৯. **স্থানীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব:** অনুপ্রবেশকারীরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসায়, তা অনেক সময় স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে প্রভাবিত করতে পারে।

২০. **দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সংহতির অভাব:** অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় সমাজের মূল স্রোতে মিশে না যেতে পারলে সমাজে বিচ্ছিন্নতা ও সংহতির অভাব দেখা যেতে পারে।

ভারতে 'মুসলিম অনুপ্রবেশ' (অবৈধ অভিবাসন) সংক্রান্ত উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আপনার করণীয়গুলি দেওয়া হল -

১. **আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন:** দেশের বিদ্যমান **নাগরিকত্ব আইন** (Citizenship Act), **বিদেশী আইন** (Foreigners Act), এবং **পাসপোর্ট আইন** (Passport Act) সম্পর্কে জানুন এবং তা মেনে চলুন।

২. **আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করুন:** যদি আপনার কাছে অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ও যাচাইযোগ্য তথ্য থাকে, তবে তা যথাযথ **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা** বা স্থানীয় পুলিশকে জানান।

৩. **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করুন:** অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে

রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান পর্যালোচনা করুন এবং সচেতনভাবে **নির্বাচনে ভোট দিন**।

৪. **শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও আলোচনা করুন:** আপনার মতামত বা উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য **গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়** অবলম্বন করুন।

৫. **সঠিক তথ্য যাচাই করুন:** সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনো মাধ্যমে ছড়ানো **ভুয়ো খবর** (Fake News) বা ভুল তথ্যের উপর নির্ভর না করে, সরকারি সূত্র ও নির্ভরযোগ্য মিডিয়া থেকে তথ্য যাচাই করুন।

৬. **অর্থনৈতিক প্রভাব বুঝুন:** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবৈধ অভিবাসনের প্রভাব (যেমন—শ্রম বাজারের উপর চাপ, সম্পদের বন্টন) সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

৭. **স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করুন:** সমাজের মধ্যে **শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখুন** এবং ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য স্থানীয় স্তরে আলোচনায় অংশ নিন।

৮. **বৈষম্য দূর করুন:** বৈধ ও নথিভুক্ত নাগরিকদের সাথে অবৈধ অভিবাসীদের মিশিয়ে না ফেলে, কোনো নাগরিক যেন কোনো ধরনের **সামাজিক বৈষম্য বা হেনস্থার** শিকার না হন, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

৯. **সরকারি নীতিতে দৃষ্টি রাখুন:** সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অভিবাসন নীতি, এবং অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণের প্রক্রিয়াগুলির উপর নজর রাখুন।

১০. **জনমত তৈরি করুন:** জনমত তৈরির জন্য **সচেতনতামূলক প্রচারে** অংশ নিন বা আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করুন।

১১. **প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছান:** আপনার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সাংসদ বা বিধায়কদের কাছে এই বিষয়ে আপনার উদ্বেগগুলি পৌঁছে দিন এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করুন।

১২. **আইনসম্মত পদক্ষেপ নিন:** নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন **আইনসম্মত, শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক নীতির** ভিত্তিতে হয় এবং উসকানিমূলক বা বেআইনি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

১৩. কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে ভূমি বিক্রয়, বাড়ি ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন।

মুসলিম অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকাই হল নিজেকে সুরক্ষিত রাখার প্রধান উপায়। কেননা মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে যদি কোনও এলাকার জনসংখ্যা ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায় তাহলে অন্য জনগোষ্ঠীর

সেখানে টিকে থাকা দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কাশ্মীর তার জলন্ত উদাহরণ। এছাড়া বহু আঞ্চলিক উদাহরণ ও অভিজ্ঞতাও একই কথা বলে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, **মুসলিমরা যে এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে অমুসলিমদের উপর নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অন্যদিকে যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে গণতন্ত্র ও সমানাধিকার বজায় রাখার কথা বলে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পৌণ্ড্রজনবসতি এলাকাগুলিতে অতন্দ্র প্রহরা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে দেশরক্ষা ক্ষত্রিয়ের কাজ। কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় হিসেবে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে নিজের কর্তব্য ভোলা উচিত নয়। জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।**

"যারা সংগঠন করেন, তাদেরও সকলের পরিবার আছে। তাই অজুহাত দেখিয়ে, ভালো কাজ থেকে দূরে থেকে, অলস মানসিকতার পরিচয় দেবেন না। সাধ্যানুসারে কিছু করুন এবং সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলুন।"

- পত্রিকা সম্পাদক।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ধর্ম

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর আর্য দাবির সপক্ষে বিশদ বিশ্লেষণ: ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক যুক্তিসমূহ

- আচার্য শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায়

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী একটি তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় হলেও বিংশ শতকের সূচনা থেকেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজেদের আদি আর্য বংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় হিসেবে দাবি করে আসছে। এই দাবিটি শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন নয়, বরং ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণের বা পুনঃজাগরণের একটি সুসংগঠিত আন্দোলনকে নির্দেশ করে। এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ দ্বারা প্রচারিত আর্য (দ্বিজ/ক্ষত্রিয়) মর্যাদার দাবির স্বপক্ষে ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক যুক্তিগুলোকে বিশদ বিশ্লেষণ করা।

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় 'আর্য' শব্দটি জাতিগত রক্তধারার বাইরে গিয়ে মূলত সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব, বৈদিক আচার এবং দ্বিজ (Twice-born) মর্যাদা বোঝাত। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আন্দোলন তাই সাংস্কৃতিক আর্যত্ব (দ্বিজত্ব) অর্জন এবং হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন ক্ষত্রিয় মর্যাদার পুনরুদ্ধারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভায় তাদের **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'** নামটির গ্রহণযোগ্যতা লাভ এই দাবির আইনি ও রাজনৈতিক বৈধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্য দাবির প্রাথমিক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তিটি হলো প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণে বর্ণিত তাদের রাজকীয় বংশলতিকা। এই সাহিত্যিক প্রমাণাদি তাদের আদিম অনার্য বা নিম্নশ্রেণীর উৎপত্তির দাবিকে সরাসরি খণ্ডন করে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা যে আর্য তার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয়।

যুক্তি ১: রাজা বলির বংশধর এবং ক্ষত্রিয় উৎপত্তি

মহাভারত অনুযায়ী, প্রাচ্যের পাঁচটি প্রধান রাজ্য—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পৌণ্ড্র—একই বংশের সন্তান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন রাজা বলির পুত্র । যেহেতু রাজা বলিকে আর্য-ক্ষত্রিয় রাজবংশের পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়, তাই পৌণ্ড্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও সরাসরি একটি আর্য-ক্ষত্রিয় বংশলতিকার অংশ। এই অভিন্ন বংশধারা তাদের আদিম আর্য উৎসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

যুক্তি ২: মহাকাব্যে পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজনৈতিক স্বীকৃতি

পৌণ্ড্র রাজ্যকে প্রাচীন ভারতের একটি স্বতন্ত্র, সুপরিচিত এবং শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে মহাভারতে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক যুগে একটি সার্বভৌম ও শক্তিশালী রাজ্যের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি কেবল আর্য-ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের পক্ষেই সম্ভব ছিল। একটি আদিম উপজাতি বা অনার্য গোষ্ঠীকে সাধারণত এত উচ্চ রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত করা হতো না, যা পৌণ্ড্রদের আর্য মর্যাদা সমর্থন করে।

যুক্তি ৩: পৌণ্ড্রক বাসুদেবের রাজকীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা

পৌণ্ড্ররাজ বা পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিজেকে স্বয়ং বাসুদেব ঘোষণা করে দ্বারকার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। পৌণ্ড্রকের এই চ্যালেঞ্জ প্রমাণ করে যে তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং নিজেকে কেন্দ্রীয় আর্য ক্ষমতার সমকক্ষ মনে করতেন। নিম্নশ্রেণীর বা অনার্য রাজার পক্ষে মহাভারতের প্রধান নায়কদের এভাবে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব ছিল না, যা তাদের উচ্চ ক্ষত্রিয় মর্যাদা নির্দেশ করে।

যুক্তি ৪: পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের আর্য রাজবংশের ধারা

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পূর্ব ভারতে লৌহ যুগের 'পুণ্ড্র রাজ্য', যেখানে অনার্য রাজারা শাসন করতেন, তা বৈদিক যুগের 'পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য' থেকে ভিন্ন ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে সমৃদ্ধ এই পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজারা ছিলেন আর্য। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তাদের পূর্বপুরুষদের আর্য

শাসিত পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজন্যবর্গ হিসেবে দাবি করা ইতিহাস সম্মত।

যুক্তি ৫: বৈদিক 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা

যদিও মহাভারত উল্লেখ করে যে পৌণ্ড্ররা বৈদিক আচার পালন করত না এবং স্থানীয় তান্ত্রিক আচার অনুসরণ করত , পণ্ডিতরা যুক্তি দেন যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে মূল বৈদিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত আর্যদের 'ব্রাত্য' বলা হতো। ব্রাত্যত্ব হলো সাংস্কৃতিক অবনমন (Fallen Status), জাতিগত উৎসের বিলুপ্তি নয়। তাই পৌণ্ড্ররা আর্য রক্ত বহন করলেও সময়ের সাথে সাথে আচারভ্রষ্ট হয়ে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কোনও মতেই অনার্য নয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা আর্য।

যুক্তি ৬: ঐতিহাসিক অবনমনের কালানুক্রমিক প্রমাণ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ বর্ণশাস্ত্র **বৃহদ্ধর্ম পুরাণে** পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রকদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ পরবর্তীকালে, ১৪শ বা ১৫শ শতাব্দীর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তাদের 'সঙ্কর' (মিশ্র-জাতি) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রাচীন গ্রন্থে তাদের অনুপস্থিতি নির্দেশ করে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও তাদের সামাজিক অবস্থান এতটা নিম্ন ছিল না। এই কালানুক্রমিক অবনমন প্রমাণ করে যে তাদের মর্যাদা তুলনামূলকভাবে পরে ঘটেছে, সম্ভবত বাইরের আক্রমণ বা সামাজিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ, যা তাদের আদি আর্য মর্যাদাকে অস্বীকার করে না।

যুক্তি ৭: 'সঙ্কর' দাবির যৌক্তিক প্রত্যাখ্যান

মধ্যযুগীয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তাদের যে মিশ্র বা 'সঙ্কর' উৎপত্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা একটি পরবর্তী সময়ের বর্ণবাদী সাহিত্য দ্বারা সৃষ্ট আরোপিত নিন্দা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। মহাভারতে বর্ণিত রাজা বলির ক্ষত্রিয় বংশধর হওয়ার শক্তিশালী প্রমাণ থাকায়, পরবর্তীকালের স্থানীয় পুরাণের এই মিশ্র-জাতি তকমাটিকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূল আর্য দাবির বিরুদ্ধে দুর্বল প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেন যা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত।

যুক্তি ৮: তান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বৈদিক প্রভাবের বিস্তার

পুন্ড্রদের মধ্যে তান্ত্রিক আচারের পালন তাদের আর্য উৎসকে খণ্ডন করে না। প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বৈদিক আচার-আচরণের সঙ্গে স্থানীয় তান্ত্রিক ও শাক্ত আচারের সংমিশ্রণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্রমাণ করে না যে তাদের আর্য রক্তধারা ছিল না; বরং এটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদিক সংমিশ্রণের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয় ।

আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শারীরিক কাঠামোর যে বর্ণনা

দেয়, তা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাথে তাদের নৈকট্য প্রমাণ করে, যা তাদের আদিম অনার্য বা অস্ট্রিক-দ্রাবিড় উৎসের দাবিকে দুর্বল করে দেয়।

যুক্তি ৯: নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সাদৃশ্য উচ্চবর্ণের সাথে

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী বিস্তৃত-শিরস্ক (Brachycephalic) নয়, বরং নাতিদীর্ঘ বা মাঝারি আকারের শিরস্ক। এই বৈশিষ্ট্যটি বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং সদগোপদের শারীরিক মাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু আর্য গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট শারীরিক কাঠামো বাংলায় চিহ্নিত, এই সাদৃশ্য সরাসরি প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদিম 'অনার্য' বা 'অস্ট্রিক-দ্রাবিড়' গোষ্ঠীর থেকে তারা ভিন্ন, যাদের সাথে তাদের নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে ।** তাদের সামাজিক 'নিম্ন' অবস্থান এই নৃতাত্ত্বিক সত্য দ্বারা সমর্থিত নয়। সুতরাং জোরের সঙ্গে বলা যায় **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা আর্য।**

যুক্তি ১০: বৃহত্তর সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাদৃশ্য

নৃতাত্ত্বিক নৈকট্য দৃষ্টে মনে হয় যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, এবং নমঃশূদ্রদের মধ্যে একটি গভীর ঐতিহাসিক নৈকট্য রয়েছে, এবং এরা সবাই একই বৈশিষ্ট্যের মানুষ। যেহেতু মাহিষ্য এবং নমঃশূদ্ররাও জোরালো সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ক্ষত্রিয় মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সমান্তরাল আন্দোলন প্রমাণ করে যে তাদের দাবিটি বিচ্ছিন্ন নয়। এটি বৃহত্তর বঙ্গীয় আর্যীকরণ (সংস্কৃতায়ন) প্রক্রিয়ার একটি বৈধ অংশ, যেখানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মর্যাদা হারানো গোষ্ঠীগুলি তা পুনরুদ্ধার করেছে।

যুক্তি ১১: আলপাইন আর্য-ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক

নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বে উল্লেখ করা হয় যে আলাপাইনি আর্যভাষীরা ভারতীয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভৌগোলিক অবস্থান এবং শারীরিক গঠনের সাদৃশ্য বিবেচনা করে যুক্তি দেওয়া হয় যে তারা এই আলপাইন আর্য-ভাষাভাষী গোষ্ঠীরই অংশ, যারা বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল। এই তত্ত্ব তাদের বংশগত আর্য সংযোগকে সমর্থন করে।

যুক্তি ১২: ভৌগোলিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের সুবিধা

ভৌগোলিক দিক থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবস্থান ছিল কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে। এই নৈকট্য তাদের মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগকে চিহ্নিত করে। ফলে, যখন সাংস্কৃতিক আর্যীকরণের আন্দোলন শুরু হয়, তখন তারা দ্রুত উচ্চবর্ণের আচার-আচরণের সাথে নিজেদের একীভূত করতে সক্ষম হয়। এই সাংস্কৃতিক সুবিধা তাদের আর্য দাবির গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে।

বিংশ শতাব্দীতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দ্বারা গৃহীত সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারগুলি প্রমাণ করে যে তারা সক্রিয়ভাবে আর্য সংস্কৃতির অংশ ছিল এবং তারা তাদের হারিয়ে যাওয়া দ্বিজ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল।

যুক্তি ১৩: পবিত্র পৈতা (উপবীত) ধারণের সিদ্ধান্ত

১৯৩২ সালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা একটি সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তারা পবিত্র পৈতা (উপবীত) ধারণ করবেন। পৈতা ধারণ আর্য সংস্কৃতির 'দ্বিজ' (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) মর্যাদার সবচেয়ে মৌলিক প্রতীক। এই আনুষ্ঠানিক গ্রহণ প্রমাণ করে যে তারা তাদের ক্ষত্রিয় দাবির প্রতি প্রথাগতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তারা আর্য। অনেক ব্রাহ্মণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্য মনে করেন এবং পৈতা ধারণ অনুষ্ঠানে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। এখনও অনেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পৈতা ধারণ করেন যা তাদের আর্যত্বের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

যুক্তি ১৪: দ্বাদশাশৌচ পালনের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ

১৯৩২ সালের একই সম্মেলনে তারা দ্বাদশাশৌচ (১২ দিনব্যাপী অশৌচ বা শোক পালনের সময়কাল) পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১২ দিনব্যাপী অশৌচ পালন হলো উচ্চবর্ণের (দ্বিজ) প্রথা। এই আচারের গ্রহণ নিশ্চিত করে যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সম্পূর্ণভাবে উচ্চ আর্য বর্ণ।

যুক্তি ১৫: সংস্কৃতায়ন আদর্শের জন্য ধারাবাহিক প্রচার

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য সুসংগঠিত বৌদ্ধিক আন্দোলন গড়ে তোলে। এর প্রমাণ মেলে 'ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়-বান্ধব', 'ক্ষত্রিয়', এবং 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার' এর মতো একাধিক পত্রিকা প্রকাশে। নিজস্ব সাহিত্য ও আদর্শের মাধ্যমে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বর্ণবাদী সমাজে যে মর্যাদাহানি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে আর্য-ক্ষত্রিয় পরিচয়কে ক্রমাগত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠন বর্তমানে সমাজকে এই বার্তা জোরালোভাবে প্রদান করছে যে তারা হল আর্য-ক্ষত্রিয়।

যুক্তি ১৬: উচ্চ বর্ণের আচার-বিধি কঠোরভাবে অনুসরণ

সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বৈদিক বিবাহের নিয়ম, শ্রাদ্ধাদি এবং অন্যান্য ধর্মীয় পালনে উচ্চবর্ণের আচার-বিধি কঠোরভাবে অনুসরণ শুরু করে। সামাজিক মর্যাদা দাবি করার প্রক্রিয়ায়, নব-আর্যীকৃত গোষ্ঠীগুলো প্রায়শই ঐতিহ্যবাহী উচ্চবর্ণের থেকেও বেশি কঠোরভাবে ধর্মীয় নিয়মাবলী পালন করে

থাকে। এই কঠোরতা তাদের আর্য দাবির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দাবির পক্ষে আধুনিক প্রমাণাদি শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক নয়, বরং বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক তাদের দমন করার প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত।

যুক্তি ১৭: ঔপনিবেশিক দলিলে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' উপাধির স্বীকৃতি

১৯৩৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পতিরাম রায় এমএলএ-এর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারিভাবে 'পোদ' (Pod) নামের পরিবর্তে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামটি গ্রহণযোগ্য হয়। এই আইনি পরিবর্তনটি প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ প্রশাসন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে 'পোদ' শব্দটি জাতিগতভাবে অপমানজনক এবং তাদের ক্ষত্রিয় পরিচয়ের দাবি প্রশাসনিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী। এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্য দাবির জন্য আধুনিক আইনি ভিত্তি স্থাপন করে।

যুক্তি ১৮: সরকারি নথি এবং গেজেটে নাম পরিবর্তনের আইনি সাফল্য

১৯৩৮ সালের ৬ মে বঙ্গীয় সরকারের সচিব একটি পত্রে পতিরাম রায়কে অবহিত করেন যে অফিস আদালতে এই জনগোষ্ঠীকে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত করা হবে। সরকারের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তর থেকে এই নির্দেশ জারি হওয়া প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা কেবল একটি দুর্বল গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয় না। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বীকৃতি আর্যত্বের প্রতীক।

যুক্তি ১৯: স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় জাতীয়তাবাদী অংশগ্রহণ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা সবসময় মূল ধারার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং জাতীয় নেতাদের পাশে থেকেছেন। উচ্চবর্ণের এবং আর্য হিসেবে দাবিদার নেতৃত্বেই জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হতো। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সক্রিয় অংশগ্রহণ ইঙ্গিত দেয় যে তারা নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং মূলধারার 'আর্য' সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করত। তাদের ভৌগোলিক অবস্থান (কলিকাতার নিকটবর্তী) এই রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে ত্বরান্বিত করেছিল। বর্তমান তপশীলী জাতিগুলির মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রাই সবচেয়ে বেশি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে - তাদের আর্য ক্ষত্রিয় রক্তের প্রমাণ বহন করে। কারন দেশ রক্ষা হল ক্ষত্রিয়দের কাজ।

যুক্তি ২০: ব্রিটিশ সরকারের নিম্নবর্ণে তালিকাভুক্তির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

নিম্নবর্ণের তালিকাভুক্তিকরণের বিষয়টি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্য দাবির প্রধানতম বিরোধী প্রমাণ হলেও, এর পেছনে একটি গভীর রাজনৈতিক কারণ ছিল। ব্রিটিশ সরকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য বর্ণ হিন্দুদের থেকে পৌণ্ড্রদের দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্যই ইংরেজরা তাদের নিম্ন বর্ণের তালিকাভুক্ত করে। এর অর্থ হলো, ব্রিটিশদের চোখে তারা এতই প্রভাবশালী ও জাতীয়তাবাদে সক্রিয় ছিল যে তাদের দমন করা জরুরি ছিল। তাদের নিম্ন মর্যাদার তালিকাভুক্তি বংশগত সত্য নয়, বরং একটি আধুনিক ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফল।

উপসংহার

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর আর্য মর্যাদা দাবির সপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিগুলি বংশগত উৎস, নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ, সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান এবং রাজনৈতিক বৈধতা—এই চারটি ভিন্ন মাত্রার ওপর নির্ভর করে একটি সমন্বিত চিত্র তৈরি করে। এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিম্ন সামাজিক মর্যাদা প্রাচীন বা জাতিগত সত্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বরং এটি ছিল মধ্যযুগীয় বর্ণবাদী কঠোরতা এবং পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক বিভাজন নীতির ফল।

পৌরাণিক সূত্রগুলি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয় রাজা বলির বংশধর হিসেবে চিহ্নিত করে , যা তাদের আদি আর্য বংশধারার প্রমাণ। নৃতাত্ত্বিক তথ্যগুলি উচ্চবর্ণের সাথে তাদের শারীরিক সাদৃশ্য নিশ্চিত করে , যা অনার্য উৎপত্তির দাবিকে খণ্ডন করে। আর বিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলন (পৈতা ধারণ ও দ্বাদশাশৌচ পালন) প্রমাণ করে যে তারা স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে হারিয়ে যাওয়া দ্বিজ (আর্য) মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছে। সবশেষে, ঔপনিবেশিক সরকার তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নিম্নবর্ণের তালিকায় নামভুক্ত করেছিল , যা তাদের সামাজিক নয়, রাজনৈতিক প্রতিপত্তিকেই প্রমাণ করে। সামগ্রিকভাবে, এই সমস্ত প্রমাণাদি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' (Fallen Arya) থেকে 'পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়' হিসেবে আত্ম-পরিচয়ের দাবিকে দৃঢ় সমর্থন করে।

তথ্যসূত্রঃ

1. পৌন্ড্রক্ষত্রিয় - বাংলাপিডিয়া
2. পুণ্ড্র রাজ্য - উইকিপিডিয়া
3. bn.quora.com পুন্ড্র রাজ্য এবং পুন্ড্রবর্ধন রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য কী?
4. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় - উইকিপিডিয়া
5. বৈদিক ধর্ম - উইকিপিডিয়া
6. www.poundrakshatriya.com
7. guruchandali.com
8. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

বর্তমান বিশ্ব ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বাংলাদেশের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন

- ত্রিলোচন নস্কর

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বাংলাদেশের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন। মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে কি হয় তা বাংলাদেশে বাস করা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান সবাই উপলব্ধি করতে পারছে। মিডিয়ার দৌলতে সবাই প্রায় অবগত। কিন্তু খবর দেখলাম, শুনলাম আর ভুলে গেলাম এটা হিন্দুদের একটি বড় রোগ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা যেহেতু হিন্দু ধর্মের একটি সম্প্রদায়, তাই তারাও এই ভুলে যাওয়া রোগে কম বেশি আক্রান্ত। তবে আসার কথা এই যে বর্তমানে অনেকেই মুসলিম মৌলবাদ নিয়ে সতর্ক হচ্ছেন এবং অল্প সংখ্যায় হলেও প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন।

নিউজ ডেস্ক: হাসিনা অধ্যায় শেষ হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে বেড়ে চলেছে সংখ্যালঘু নিপীড়ন। সেই ক্ষেত্রে প্রধান আক্রমন হিন্দুদের উপর হলেও বাদ যায়নি খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা। এই নিয়ে ওই দেশের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে পুলিশের পরিসংখ্যানের পার্থক্য বিস্তর। এই আবহে সম্প্রতি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তরফ থেকে দাবি করা হয়, ৪ অগস্ট থেকে বাংলাদেশে ১৭৬৯টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনার শিকার হয়েছেন সংখ্যালঘুরা।

এর মধ্যে মামলা হয়েছে মাত্র ৬২টি ক্ষেত্রে। আর ধরা পড়েছে ৩৫ জন। এরই মাঝে বাংলাদেশের পুলিশের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের ওপরে এই সব হামলার অধিকাংশই রাজনৈতিক কারণে হয়েছে। তারা স্বীকার করেন নি যে এই হামলা সাম্প্রদায়িক কারণে হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই দেশকে 'ইসলামিক রাষ্ট্র' ঘোষণা করার কথাও কারো কারো মুখে শোনা গেছে।

এদিকে পুলিশ বলছে, সংখ্যালঘুদের হামলার ক্ষেত্রে ৫৩টি মামলা রুজু করা হয়েছে। এবং এখনও পর্যন্ত ৬৫ জনকে গ্রেফতার করাহয়েছে। আর ৪ অগস্ট থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় ১১৫টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং ১০০ জনের বেশি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে একাধিক হিন্দু মন্দিরে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। বহু জায়গায় হিন্দুদের বাড়িতে গিয়ে হামলার ঘটনাও ঘটেছে। এমনকী পুলিশ এবং সেনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছিল চট্টগ্রামে। এরই মাঝে গত ১ জানুয়ারি মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেবাশ্রম মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয় এবং লুটপাট চালানো হয়। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যে খুব খারাপ তাতে সন্দেহ নেই।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে ও সচেতন থাকতে হবে। 'ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে' অবস্থান নিলে কিন্তু নিজেরাই খাল কেটে কুমির আনার জন্য দায়ী থাকবেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নের ভয়াবহ চিত্র সামনে এসেছে

প্রতিদিন ২৪x৭ · 2:05 pm · 12 Jan 2025

নি**উজ ডেস্ক** ::হাসিনা অধ্যায় শেষ হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে বেড়ে চলেছে সংখ্যালঘু নিপীড়ন। সেই ক্ষেত্রে প্রধান আক্রমন হিন্দুদের উপর হলেও বাদ যায়নি খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা। এই নিয়ে ওই দেশের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে পুলিশের পরিসংখ্যানের পার্থক্য বিস্তর। এই আবহে সম্প্রতি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তরফ থেকে দাবি করা হয়, ৪ অগস্ট থেকে বাংলাদেশে ১৭৬৯টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনার শিকার হয়েছেন সংখ্যালঘুরা।

https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/pratidin+24x7-epaper-pratiban/banladeshe+sankhyalaghu+nipidaner+bhayabah+chitr+samane+eseche-newsid-n647309710?sm=Y

খবর সংগ্রহের তারিখঃ ১৪/০২/২০২৪

বিশেষ প্রবন্ধ

আরএসএস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি:

শতবর্ষের ঐতিহাসিক বিপ্রতীপ যাত্রা (১৯২৫-২০২৫)

- এ আই উপাধ্যায়

১৯২৫ সালে ভারত দুই ভিন্ন মতাদর্শিক পথের জন্ম দেখেছিল—একদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS), যা ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধের পুনরুত্থানের লক্ষ্য স্থির করেছিল; অন্যদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI), যা আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রাম এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল। ২০২৫ সালে এই দুটি সংগঠনই তাদের শতবর্ষ পূর্ণ করছে, কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক যাত্রা এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত।

আরএসএস প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক জাগরণ (Cultural Renaissance) এবং হিন্দু সমাজকে সুসংগঠিত করে জাতির আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা। তাদের ফোকাস ছিল দেশ এবং তার শাশ্বত সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে, সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বিদেশী আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটানো এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট বলয়ের

সঙ্গে সংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে। এই মৌলিক পার্থক্যই পরবর্তী ১০০ বছরের গতিপথ নির্ধারণ করে। আরএসএস ছিল জৈবিকভাবে ভারতীয়, অর্থাৎ 'অর্গানিক ন্যাশনালিস্ট', যা দেশের মাটি থেকে জন্ম নিয়েছিল; আর সিপিআই ছিল আদর্শিকভাবে বহিরাগত, অর্থাৎ 'এক্সোজেনাস আইডিয়োলজিস্ট', যারা মস্কো বা বলশেভিজম থেকে নির্দেশ গ্রহণ করত।

২. মতাদর্শ ও ভিত্তিগত দর্শন: স্বদেশী বনাম বিদেশী মতবাদ

ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে আরএসএস এবং সিপিআই-এর প্রধান বিরোধ তাদের মূল দার্শনিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে। একটি সংগঠন যেখানে ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যটি সেখানে সম্পূর্ণ বিদেশী, বস্তুবাদী দর্শনের উপর নির্ভরশীল।

২.১. আরএসএস: একাত্ম মানবতাবাদ ও ভারতের আত্মা

আরএসএস-এর মতাদর্শ, যা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানবতাবাদ' (Integral Humanism) দ্বারা পরিচালিত, তা একটি সমন্বিত ও স্বদেশী সমাধান প্রদান করে। এই দর্শন ব্যক্তির দেহ, মন, বুদ্ধি এবং আত্মার সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নতি এবং চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনে বিশ্বাসী। এই দর্শনটি কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর উপর জোর দেয় না, বরং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিককেও সমান গুরুত্ব দেয় [1]।

একাত্ম মানবতাবাদ পশ্চিমা পুঁজিবাদ এবং মার্কসবাদী সাম্যবাদ—উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে। এটি চরম ভোগবাদ (unbridled consumerism)-এর বিরোধিতা করে, কারণ আরএসএস মনে করে এই ধরনের ভোগবাদী জীবনধারা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারণার পরিপন্থী [1]। ভারতীয় ঐতিহ্য আত্মসংযম এবং আধ্যাত্মিক সন্তুষ্টির উপর জোর দেয়, যা কেবল বস্তুগত সম্পদ অর্জনের অন্ধ দৌড়ের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আরএসএস-এর এই দর্শন ভারতের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আত্মিক চেতনার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা এই সংগঠনকে জাতীয় জীবনে এক স্থায়ী ভিত্তি দিয়েছে।

২.২. সিপিআই: শ্রেণী সংগ্রাম ও বিভাজনমূলক বিদেশী তত্ত্ব

সিপিআই-এর দর্শন সম্পূর্ণভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে সমাজকে বিশ্লেষণ করে [2]। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, সমাজের সমস্ত সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত কাঠামো (Superstructure) নির্ভর করে অর্থনৈতিক কাঠামোর (Base) উপর। মার্কসবাদ মনে করে যে উৎপাদন পদ্ধতিই সমাজের বাকি সব দিক নির্ধারণ করে [2]।

সিপিআই ভারতীয় সমাজে ‘শ্রেণী সংগ্রাম’ (Class Struggle)-এর ধারণা আমদানি করে। এই তত্ত্ব ভারতের জটিল এবং বহুস্তরীয় সামাজিক কাঠামোকে সরলীকৃত অর্থনৈতিক বিভাজনে সংকুচিত করে। মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা যুক্তি দেন যে সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীগুলির মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস [2]। তবে, এই বিদেশী শ্রেণী-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ভারতীয় সমাজের গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং সাংস্কৃতিক মূলকে প্রত্যাখ্যান করে, যা ফলস্বরূপ সমাজে বিচ্ছিন্নতা (Alienation) এবং বিভেদ সৃষ্টি করে [3, 4]। মার্কসবাদকে একটি 'বিদেশী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারণা' (Alien and Divisive Ideology) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা ভারতীয় সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। এই দর্শন কেবল সমাজকে বিভক্ত করার দিকে মনোনিবেশ করে, যা আরএসএস-এর 'একাত্মতা'র লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সিপিআই-এর এই আমদানিকৃত মতবাদ ভারতের সাংস্কৃতিক নীতির সঙ্গে স্থায়ীভাবে প্রান্তিক থাকার জন্ম দিয়েছে, কারণ এটি ভারতের মানুষের মৌলিক চেতনাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

৩. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা: যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা ও নিরাপত্তা

জাতীয় সংকট এবং রাষ্ট্রের উপর আঘাতের সময় দুটি সংগঠনের প্রতিক্রিয়া তাদের প্রকৃত আনুগত্যের ভিত্তি প্রকাশ করে। এই ক্ষেত্রে, সিপিআই-এর অবস্থান বারবারই রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী প্রমাণিত হয়েছে।

৩.১. ১৯৬২ সালের চরম বিশ্বাসঘাতকতা: ভারত-চীন যুদ্ধ

১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এক চরম পরীক্ষা ছিল। এই সংঘাতটি ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের সামরিক রূপ ছিল [5]। চীনের সামরিক বাহিনী অত্যন্ত আগ্রাসী, হিসাবী এবং সুযোগসন্ধানী ছিল [6]। এই সময় সিপিআই-এর অভ্যন্তরে এমন এক আদর্শগত সংকট দেখা দেয়, যা তাদের জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বিদেশী কমিউনিস্ট শক্তির প্রতি আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়।

সিপিআই এই সময় মস্কোপন্থী (এস. এ. ডাঙ্গে নেতৃত্বাধীন) এবং চীনপন্থী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় [7, 8]। চীনপন্থী অংশটি, যারা পরে সিপিআই(এম) গঠন করে, তারা চীন সরকারের আগ্রাসনকে প্রকাশ্যে নিন্দা করতে দ্বিধান্বিত ছিল। একটি বিদেশী আক্রমণকারী শক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। সিপিআই-এর পক্ষ থেকে এই দ্বিধাগ্রস্ততা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের আদর্শগত ব্যর্থতা প্রমাণ করে। তারা চীনের আগ্রাসনকে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' বিশ্ব-আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করে ভারতের সামরিক পরাজয়কে উপেক্ষা

করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংহতিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। এর ফলে, সিপিআই জাতীয় জীবনে **'বিদেশী এজেন্ট'** হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ঐতিহাসিক ভিত্তি তৈরি করে, যা দেশের প্রতি তাদের আনুগত্যের সাংবিধানিক সংকটের চূড়ান্ত উদাহরণ [9].

৩.২. আরএসএস-এর নিঃশর্ত জাতীয় সেবা (১৯৬২, ১৯৬৫, ১৯৭১)

সিপিআই-এর বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীতে, আরএসএস জাতীয় সংকটের সময় নিঃশর্ত দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে, তখন বিপুল সংখ্যক আরএসএস স্বেচ্ছাসেবককে দ্রুত সামরিক প্রশিক্ষণে যুক্ত করা হয়। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের সময়ও আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকরা সামরিক এবং বেসামরিক উভয় ধরনের কাজে অংশ নেয় [10]।

আরএসএস-এর এই চিত্তাকর্ষক ভূমিকা তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেও তাদের সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছিল। জওহরলাল নেহরু আরএসএস-এর জাতীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৩ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে তাদের যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান [10]। ১৯৬৫ সালের ২২ দিনব্যাপী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ও আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকরা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছিল। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে আরএসএস-এর শৃঙ্খলা ও সংগঠন কেবল একটি মতাদর্শিক ভিত্তি নয়, বরং জাতীয় সুরক্ষার জন্য একটি কার্যকর সম্পদ। আরএসএস দলমত নির্বিশেষে দেশের সংহতি ও সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩.৩. গণতন্ত্রের দমনকারী বনাম রক্ষক: ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা

গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নেও দুই সংগঠনের অবস্থান ছিল বিপরীতমুখী। ১৯৭৫ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা (১৯৭৫–৭৭) জারি করেন, তখন তা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে, ভিন্ন মত দমন করে এবং নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয় [11]। এই স্বৈরাচারী পদক্ষেপকে সিপিআই প্রকাশ্যে সমর্থন করে এবং সরকারের দমনমূলক কার্যকলাপের সহযোগী হিসেবে কাজ করে [12]। তাদের এই ভূমিকা স্পষ্ট করে যে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেলে তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা না করে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার অংশ হতে প্রস্তুত ছিল।

অন্যদিকে, আরএসএস জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে মূল বিরোধী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হাজার হাজার আরএসএস কর্মীকে কারাবরণ করতে হয়। এই বিপরীত অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আরএসএস সাংবিধানিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি গভীরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যেখানে সিপিআই

ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল।

৩.৪. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং মাওবাদী তোষণ

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নেও সিপিআই-এর নীতিগুলি রাষ্ট্রের সুরক্ষার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করেছে। সিপিআই (Maoist) হল ভারতের প্রধান বামপন্থী চরমপন্থী (LWE) সংগঠন, যা নকশাল সহিংসতা ও বহু প্রাণহানির জন্য দায়ী এবং এটিকে Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)-এর অধীনে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে [13]।

তা সত্ত্বেও, সিপিআই এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা জোরদার করতে ব্যবহৃত কঠোর আইনগুলি, যেমন UAPA এবং Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA)-এর তীব্র সমালোচনা করে [14, 15]। এই আইনগুলিকে 'ড্রাকোনিয়ান' আখ্যা দিয়ে তাদের বিরোধিতা করা হয়, যা সন্ত্রাস দমনে রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেয়। নিরাপত্তা আইনগুলির প্রতি বিরোধিতা করে সিপিআই পরোক্ষভাবে নকশালদের 'সশস্ত্র সংগ্রাম'-কে নৈতিক সমর্থন যোগায়, যা অভ্যন্তরীণ সংহতিকে বিঘ্নিত করে। সিপিআই-এর এই অবস্থান জাতীয় সুরক্ষার চেয়ে অভ্যন্তরীণ অশান্তিকে উস্কে দেওয়ার নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে।

৪. সামাজিক ন্যায় ও 'মুসলিম তোষণ'-এর রাজনীতি

সিপিআই-এর রাজনীতিতে 'মুসলিম তোষণ' এবং জাতিগত পরিচয় ভিত্তিক বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ বিশেষভাবে জোরালো। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) এবং কাশ্মীর নীতিতে তাদের অবস্থান এই তোষণমূলক প্রবণতার প্রমাণ দেয়।

৪.১. কাশ্মীর ও জাতীয় সংহতি: ৩৭০ ধারা

আরএসএস এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদীদের মূল লক্ষ্য হল জম্মু ও কাশ্মীরকে সম্পূর্ণরূপে ভারতে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ৩৭০ ধারা বিলোপকে তারা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে মনে করে।

এর বিপরীতে, সিপিআই(এম) ৩৭০ ধারা পুনর্বহালের দাবি জানায়। তারা যুক্তি দেয় যে জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নামিয়ে আনা এবং সাংবিধানিক সুরক্ষা বাতিল করা 'ঐতিহাসিক অবিচার' এবং সেখানকার মানুষকে 'অপমানিত' করা হয়েছে [16]। সিপিআই-এর এই অবস্থান জাতীয় সংহতির চূড়ান্ত নীতির বিরুদ্ধে যায় এবং কার্যত বিচ্ছিন্নতাবাদী বা আঞ্চলিক স্বশাসনের ধারণাকে উৎসাহ দেয়। সিপিআই জাতীয় সংহতির স্বার্থকে উপেক্ষা করে কেবল আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীগত পরিচিতির উপর ভিত্তি করে বিভাজনমূলক রাজনীতিকে সমর্থন করেছে।

৪.২. অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) এবং লিঙ্গ ন্যায় বিচার

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) হল ভারতের সমস্ত নাগরিকের জন্য, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, বিবাহ, উত্তরাধিকার এবং দত্তক সংক্রান্ত একক আইন প্রবর্তনের একটি সাংবিধানিক লক্ষ্য (অনুচ্ছেদ ৪৪)। আরএসএস এই সর্বজনীন ন্যায় এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য UCC-এর পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জানায়।

সিপিআই-এর অবস্থান এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধাবাদী এবং তোষণমূলক। সিপিআই(এম) যদিও মহিলাদের অধিকারের সপক্ষে ট্রিপল তালাকের অবসানকে সমর্থন করে, তবে তারা UCC-এর তীব্র বিরোধিতা করে [17]। তারা যুক্তি দেয় যে UCC-এর এজেন্ডা 'সাম্প্রদায়িক শক্তি' দ্বারা চাপানো হচ্ছে এবং এটি 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিচিতি'র উপর আক্রমণ। সিপিআই-এর এই ভেদাভেদমূলক প্রগতিশীলতা স্পষ্ট করে যে তারা মুসলিম মহিলাদের অধিকারকে তখনই সমর্থন করে যখন তা শরিয়ত আইনের মধ্যেই সীমিত থাকে। যখন UCC-এর মাধ্যমে সমস্ত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় মহিলাদের জন্য একক, প্রগতিশীল আইন আনার চেষ্টা করা হয়, তখন তারা এর বিরোধিতা করে 'সংখ্যালঘু পরিচিতি রক্ষার' অজুহাতে। এটি কার্যত সাংবিধানিক নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে 'গোষ্ঠীগত রাজনীতি'কে অগ্রাধিকার দেয়, যা মুসলিম তোষণের একটি ধ্রুপদী উদাহরণ এবং প্রগতিশীল সামাজিক সংস্কারের পথে বড় অন্তরায়।

৬. উপসংহার: জাতীয় পুনর্গঠন ও ভারতের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ

আরএসএস এবং সিপিআই-এর শতবর্ষের তুলনামূলক বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে দুটি সংগঠনের ভিন্ন প্রকৃতি এবং ভারতের ভবিষ্যতের জন্য তাদের প্রভাব নির্দেশ করে।

সিপিআই-এর ঐতিহাসিক ব্যর্থতাগুলি তাদের মতাদর্শগত অন্ধত্বের ফল। ১৯৬২ সালের যুদ্ধকালীন বিশ্বাসঘাতকতা, ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার প্রতি সমর্থন এবং ৩৭০ ধারা বা UCC-এর মতো জাতীয় সংহতির প্রশ্নে তোষণমূলক ও ভারত-বিরোধী অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে সিপিআই প্রমাণ করেছে যে তাদের আনুগত্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বা সাংস্কৃতিক ভিত্তির প্রতি নয়, বরং বিদেশী আদর্শ এবং ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির প্রতি নিবদ্ধ। তাদের 'শ্রেণী সংগ্রাম' নির্ভর, বিভেদকামী দর্শন ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদী আত্মাকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট বলয়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, আরএসএস-এর উত্থান সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের শক্তিকে প্রতিফলিত করে। সংগঠনের মূলমন্ত্র 'সামাজিক সেবা, নিষ্ঠা, সংগঠন এবং কঠোর

শৃঙ্খলা' [18] তাদের জাতীয় জীবনে এক কার্যকর শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। জাতীয় সংকটে (১৯৬২) তাদের নিঃশর্ত সেবা এবং গণতন্ত্র রক্ষায় (১৯৭৫) তাদের ভূমিকা আরএসএস-এর জাতীয় আনুগত্যকে ঐতিহাসিক বৈধতা দেয় [10]। তাদের একাত্ম মানবতাবাদ ভারতের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূলের প্রতি অবিচল আস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা পশ্চিমা বস্তুবাদ বা বিদেশী সাম্যবাদের বিকল্প হিসেবে একটি শক্তিশালী, স্বদেশী মডেল সরবরাহ করে।

ভারতের সামনে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরএসএস-এর সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী মডেলের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গভীর। জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক ন্যায় (UCC), এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য এই স্বদেশী আদর্শই একমাত্র স্থায়ী সমাধান। এই দুই শতবর্ষী শক্তির পথচলা প্রমাণ করে—একটি দল যেখানে দেশকে বিভক্ত করেছে এবং বিদেশী আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যটি সেখানে জাতীয় সংহতি, সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন এবং নিঃশর্ত দেশপ্রেমের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করেছে।

সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে এই তুলনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। শতবর্ষ পেরনো সংগঠনের সাফল্যের মূলসূত্রগুলি আমাদের সংগঠনকে মজবুত করার কাজে লাগানোর মধ্যে দিয়ে আমাদের সাফল্য আসতে পারে তা অনুধাবন করতে হবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষা

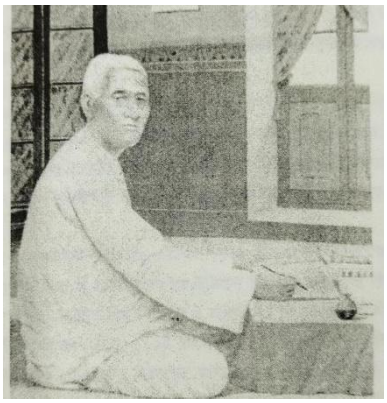

মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে বিশ্ববিদ্যালয় চাই

- শ্রীশ্রীপৌণ্ড্রক্ষত্রিয়াচার্য

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে মহাত্মা রাইচরণ সরদার বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে অথবা একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করে তার নামকরণ মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে করতে হবে। । রাজবংশী ও মতুয়াদের জন্য তাদের আরাধ্য মনীষীর নামে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আরাধ্য **মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে** বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত । এটি সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের কাছে একটি আত্মসম্মানের প্রশ্ন।

কোনও সম্প্রদায়ের মনীষীর নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে সেই সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। যেমন - ১। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে থাকে। ফলে

সেখান থেকে সেই মনীষী সম্পর্কে সকলে জানতে পারেন।

২। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জন্ম, মৃত্যু বা স্মৃতি বিজড়িত দিন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে আলোচিত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

৩। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ার তৈরি হয় এবং গুণী বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদকে ঐ পদে বসানো হয়। এর ফলে শিক্ষার গুণমান বর্ধিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হন।

৪। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তার নামে পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করা হয়ে থাকে ইত্যাদি।

৫। যার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তার এবং তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি মিউজিয়ামের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়।

মজার বিষয় হল উপরোক্ত সবকিছুই সরকারীভাবে, সরকারী অর্থে একটি সুগঠিত ব্যবস্থার মাধ্যমে (বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে) ধারাবাহিভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ফলে যে সম্প্রদায়ের মনীষী সেই সম্প্রদায়ের গৌরবজনক ইতিহাস, আরাধ্য মনীষী ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী অর্থে সংরক্ষণ, বিকাশ ও প্রচার হয়। মতুয়া ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা সেই সুযোগ পেলেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তা থেকে বঞ্চিত।

এরফলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দিন দিন আরও পিছিয়ে পড়বে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি থেকে রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। মতুয়া ও রাজবংশী সম্প্রদায় এক্ষেত্রে আগামী দিনে এগিয়ে যাবে কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় আরও পিছিয়ে পড়বে, যার ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য **ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে মহাত্মা রাইচরণ সরদার বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক অথবা একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করে তার নামকরণ মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে করা হোক।**

ডায়মন্ড হারবার এলাকায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অধিক সংখ্যায় বসবাস করেন। **মহাত্মা রাইচরণ সরদার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার মানুষ এবং ডায়মণ্ড হারবার আদালতের উকিল ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় নির্মাণ করেন। তিনি ছাত্রাবাসও নির্মাণ করেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ঐতিহাসিক অবদান বহন করছে অবিভক্ত ২৪ পরগণার বহু বিদ্যালয়। তাই তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী সময়ের দাবী এবং অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত দাবী।**

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের নিকট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পক্ষ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য অতি শীঘ্র **ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে মহাত্মা রাইচরণ সরদার বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক অথবা একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করে তার নামকরণ মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে করা হোক এই আবেদন জানাই।**

জয় ভারত জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজনীতি

বুদ্ধ প্রতি ইঞ্চি একজন হিন্দু ছিলেন - কোয়েনারদ এলস্ট (Koenraad Elst)

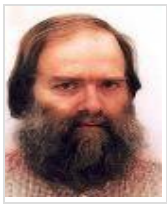

১০ আগস্ট, ২০১৩

"নেহেরু এবং আম্বেদকর এবং তাদের অনুসারীরা উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে তাঁর জীবনের কোনও এক সময়ে, হিন্দু-বংশোদ্ভূত ত্যাগী বুদ্ধ হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নতুন ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই ধারণাটি এখন সর্বব্যাপী, এবং স্কুল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে, বেশিরভাগ ভারতীয় এটিকে গ্রহণ করেছে এবং এর চেয়ে ভাল কিছু জানে না। যাইহোক, যদিও তারা অসংখ্য, এই গল্পে বিশ্বাসীদের কেউই আমাদের কখনও বলেননি যে বুদ্ধ তাঁর জীবনের কোন মুহূর্তে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। তিনি কখন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন? অনেক ভারতীয় নেহেরুবাদী বর্ণনাটি পুনরাবৃত্তি করেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত, তাদের কেউই বুদ্ধের জীবনের এমন কোনও ঘটনা চিহ্নিত করতে সক্ষম হননি যা হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।" - ডঃ কোয়েনরাড এলস্ট

বুদ্ধ কখন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন?

প্রাচ্যবিদরা বৌদ্ধধর্মকে একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন কারণ তারা ভারতের বাইরে এটি আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতের সাথে কোনও স্পষ্ট যোগসূত্র ছাড়াই, যেখানে বৌদ্ধধর্মের কোনও প্রমাণ ছিল না। প্রথমে, তারা এমনকি জানতেন না যে বুদ্ধ একজন ভারতীয় ছিলেন। এটি যে কোনওভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিকাশের মধ্য দিয়ে গেছে এবং একই সময়ে ভারতে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার সাথে সম্পর্কিত নয়। অতএব, এটা বোধগম্য যে হিন্দুধর্মের সাথে কোনও সম্পর্ক স্থাপনের আগেই বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যেই একটি পৃথক ধর্মের বিষয় ছিল।

আধুনিক ভারতে বৌদ্ধধর্ম

ভারতে, পৃথক ধর্মের এই মর্যাদার সাথে কিছুটা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পর্কিত সকল ধরণের আবিষ্কার তখন যুক্ত করা হয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের ধর্মান্তর থেকে উদ্ভূত আম্বেদকর আন্দোলন, বুদ্ধের জন্য একটি হিন্দু-বিরোধী কর্মসূচি তৈরিতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। ধর্মান্তর নিজেই, কেবল একটি নতুন ঐতিহ্য গ্রহণ করা নয় (যা যেকোনো হিন্দু হিন্দু থাকাকালীন করতে স্বাধীন) বরং হিন্দু বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ আম্বেদকরের মতো পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করা, একটি সাধারণ খ্রিস্টীয় ধারণা। মডেল ঘটনাটি ছিল ৪৯৬ সালে ফ্রাঙ্কিশ রাজা ক্লোভিসের ধর্মান্তর, যিনি "যার পূজা করেছিলেন তা পুড়িয়েছিলেন এবং যা পুড়িয়েছিলেন তার পূজা করেছিলেন"। (এখনকার জন্য এটা বাদ দেওয়া যাক যে খ্রিস্টান ইতিহাস লেখকরা তাদের শিকারদের উপর মিথ্যা প্রতিসাম্য

তৈরি করে অপবাদ দিয়েছিলেন: বিধর্মীরা খ্রিস্টান প্রতীক ধ্বংস করার কাজে জড়িত ছিল না।) সুতরাং, বৌদ্ধ ধর্মের (বৌদ্ধধর্ম) ইতিহাস সম্পর্কে তার বোধগম্যতার ক্ষেত্রে, ইসলামের ইতিহাস এবং বর্ণের ইতিহাসের কিছু অংশ সম্পর্কে তার অসাধারণ অবদান সত্ত্বেও, আম্বেদকর নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। কিন্তু যেখানে তিনি কিছুটা সঠিক এবং কিছুটা ভুল ছিলেন, সেখানে তার পরবর্তী অনুসারীরা ইতিহাসের, বিশেষ করে হিন্দু ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্থান সম্পর্কে, একটি স্থূল ব্যঙ্গচিত্র ছাড়া আর কিছুই করেননি।

আম্বেদকরবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত শাসক নেহেরুবাদীদের মধ্যপন্থী হিন্দু-বিরোধী সংস্করণকে কেবল উগ্রপন্থী করে তুলেছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অধীনে, বৌদ্ধধর্মকে ভারতের অনানুষ্ঠানিক রাষ্ট্রধর্মে রূপান্তরিত করা হয়, বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের "সিংহস্তম্ভ"কে রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং জাতীয় পতাকায় ২৪-স্পোক চক্রবর্তী চক্র স্থাপন করা হয়। মূলত, ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে নেহরুর জ্ঞান দুই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, যেমন বুদ্ধ এবং মহাত্মা গান্ধী এবং তিনজন রাজনৈতিক নেতা: অশোক, আকবর এবং তিনি নিজেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। চক্রবর্তীর ধারণা ("চাকা-ঘোড়ানকারী", সর্বজনীন শাসক) আসলে অশোকের চেয়ে অনেক পুরনো ছিল এবং ২৪-স্পোক চক্রটি অন্যান্য অর্থেও পড়া যেতে পারে, যেমন কেন্দ্রীয় পুরুষ /বিষয় এবং প্রকৃতি /প্রকৃতির ২৪টি উপাদানের সাথে সাংখ্য দর্শনের বিশ্বদৃষ্টি । "ভারতের শেষ ভাইসরয়", ইংরেজীকৃত নেহেরু হিন্দু সংস্কৃতিতে তার অজ্ঞতার জন্য নিজেকে গর্বিত করতেন, তাই তিনি এর কিছুই জানতেন না, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন যে এই প্রতীকগুলি অশোককে মহিমান্বিত করতে পারে এবং হিন্দুধর্মকে ছোট করতে পারে, যাকে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে আলাদা ধর্ম বলে মনে করেছিলেন। আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, তিনি ভেবেছিলেন যে ভারতে মূল্যবান সবকিছুই অযোগ্য হিন্দুদের জন্য বৌদ্ধধর্ম (এবং ইসলাম) এর উপহার। সুতরাং, কল্পিত হিন্দু সহিষ্ণুতা তার মতে বৌদ্ধধর্ম থেকে ধার করা মূল্য ছিল। বাস্তবে, বুদ্ধ বহুত্ববাদের ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ঐতিহ্যের সুবিধাভোগী ছিলেন। একটি মুসলিম দেশে, তিনি কখনও 45 বছর ধরে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর মতবাদ প্রচার করতেন না, তবে হিন্দু সমাজে এটি অবশ্যই ছিল। তাঁর জীবনের উপর কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল, তবে সেগুলি "হিন্দুদের" কাছ থেকে নয়, বরং তাঁর নিজস্ব সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঈর্ষান্বিত শিষ্যদের কাছ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

তাই, নেহেরু এবং আম্বেদকর এবং তাদের অনুসারীরা উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে তাঁর জীবনের কোনও এক সময়ে, হিন্দু-বংশোদ্ভূত ত্যাগী বুদ্ধ হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নতুন ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই ধারণাটি এখন সর্বব্যাপী, এবং স্কুলের

পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে, বেশিরভাগ ভারতীয় এটিকে গ্রহণ করেছেন এবং আরও ভালভাবে জানেন না। যাইহোক, যদিও তারা অসংখ্য, এই গল্পে বিশ্বাসীদের কেউই আমাদের কখনও বলেননি যে বুদ্ধ তাঁর জীবনের কোন মুহূর্তে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। তিনি কখন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন? অনেক ভারতীয় নেহেরুবাদী বর্ণনাটি পুনরাবৃত্তি করেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত, তাদের কেউই বুদ্ধের জীবনের এমন কোনও ঘটনা নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হননি যা হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

"হিন্দুধর্ম" শব্দটি

তাদের প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন, যখন ঘটনাস্থলে দাঁড় করানো হয়, তখন নিশ্চিতভাবেই হবে: "আসলে, তখন হিন্দুধর্ম তখনও বিদ্যমান ছিল না।" সুতরাং, তাদের অবস্থান আসলে এই: হিন্দুধর্ম তখনও বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু কোনওভাবে বুদ্ধ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। হ্যাঁ, ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান হল যে তিনি একজন অলৌকিক কর্মী ছিলেন।

আসুন আমরা এই বিষয়টি সংশোধন করি: "হিন্দুধর্ম" শব্দটি তখনও বিদ্যমান ছিল না। বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক আখামেনিড পারস্যের দারিয়াস যখন "হিন্দু" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তখন এটি সম্পূর্ণরূপে ভৌগোলিক অর্থে ছিল: সিন্ধু অঞ্চলের ভেতরের বা বাইরের যে কেউ। মধ্যযুগীয় মুসলিম আক্রমণকারীরা যখন এই শব্দটি ভারতে নিয়ে এসেছিল, তখন তারা এটিকে বোঝাতে ব্যবহার করেছিল: ভারতীয় মুসলিম, খ্রিস্টান বা ইহুদি ব্যতীত যেকোনো ভারতীয়। এর কোনও নির্দিষ্ট মতবাদ ছিল না, "অ-আব্রাহামিক" ছাড়া, একটি নেতিবাচক সংজ্ঞা। এর অর্থ ছিল প্রতিটি ভারতীয় পৌত্তলিক, যার মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ("পরিষ্কার-কাঁটা ব্রাহ্মণ"), জৈন, অন্যান্য তপস্বী, নিম্ন-বর্ণ, মধ্যবর্তী জাতি, উপজাতি এবং অর্থাত্ এখনও অজাত লিঙ্গায়েত, শিখ, হরে কৃষ্ণ, আর্য সমাজী, রামকৃষ্ণবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং অন্যান্য যারা আজকাল "হিন্দু" লেবেল প্রত্যাখ্যান করে। এই সংজ্ঞাটি মূলত ভিডি সাভারকর তার হিন্দুত্ব (১৯২৩) বই এবং হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫) দ্বারাও গ্রহণ করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক সংজ্ঞা অনুসারে, যার মধ্যে প্রাধান্য এবং ধূর্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা চিন্তা না করার সুবিধাও রয়েছে, বুদ্ধ এবং তাঁর সমস্ত ভারতীয় অনুসারী নিঃসন্দেহে হিন্দু। এই অর্থে, সাভারকর ঠিকই বলেছিলেন যখন তিনি আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্মে আশ্রয় নেওয়াকে "হিন্দু ধর্মে নিশ্চিত ঝাঁপ" বলেছিলেন।

কিন্তু "হিন্দু" শব্দটি কারসাজির একটি প্রিয় বস্তু। তাই, ধর্মনিরপেক্ষরা বলে যে সকল ধরণের গোষ্ঠী (দ্রাবিড়, নিম্নবর্ণ, শিখ ইত্যাদি) "হিন্দু নয়", তবুও যখন হিন্দুরা সংখ্যালঘুদের আত্ম-ধার্মিকতা এবং আগ্রাসনের অভিযোগ করে, তখন ধর্মনিরপেক্ষরা এই উদ্বেগ নিয়ে হাসে: "হিন্দুরা কীভাবে হুমকির সম্মুখীন হতে পারে?

তারা ৮০% এরও বেশি!" মিশনারিরা উপজাতিদের "হিন্দু নয়" বলে ডাকে, কিন্তু যখন উপজাতিরা তাদের স্বামীকে হত্যাকারী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করে , তখন আমরা "হিন্দু দাঙ্গাবাজ" সম্পর্কে পড়ি। বুদ্ধের ক্ষেত্রে, "হিন্দু" প্রায়শই সুবিধাজনক সময়ে "বৈদিক" শব্দে সংকুচিত হয়, তারপর যখন সুবিধাজনক হয় তখন এর বৃহত্তর অর্থে পুনরুদ্ধার করা হয়।

"হিন্দু" শব্দের যে অর্থ স্পষ্টতই নেই, এবং যখন এটি প্রবর্তিত হয়েছিল তখনও ছিল না, তা হল "বৈদিক"। শঙ্কর পতঞ্জলি এবং সাংখ্য সম্প্রদায়ের (বুদ্ধের মতো) বিরুদ্ধে এই ধারণা পোষণ করেন যে তারা বেদ উদ্ধৃত করার চেষ্টা করেন না, তবুও হিন্দু চিন্তাধারার প্রতিটি ইতিহাসে তাদের স্থান রয়েছে। হিন্দুধর্মে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যার কেবল একটি পাতলা বৈদিক আবরণ রয়েছে, এবং এমন অনেক উপাদান রয়েছে যা মোটেও বৈদিক নয়। পণ্ডিতরা বলেন যে এটি একটি "মহান ঐতিহ্য" এবং অনেক "ছোট ঐতিহ্য" নিয়ে গঠিত, স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে মর্যাদাপূর্ণ বৈদিক ধারার অধীনে টিকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, আমরা যদি এই পরিভাষায় বুদ্ধকে শ্রেণীবদ্ধ করতে চাই, তাহলে তাকে বরং মহান ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়, সৌর বা ইক্ষ্বাকু রাজবংশের বংশধর, মনুর বংশধর, রামের স্ব-বর্ণিত পুনর্জন্ম, যিনি শাক্য গোত্রের রাজার (আজীবন রাষ্ট্রপতি) পুত্র, এর সেনেটের সদস্য এবং গৌতম গোত্রের (প্রায় "বংশ") অন্তর্গত। যদিও ভিক্ষুরা প্রায়শই তাদের সন্ন্যাস নামে পরিচিত, বৌদ্ধরা বুদ্ধের নামকরণ করতে পছন্দ করে তার বংশধরদের নাম অনুসারে, অর্থাৎ শাক্য গোত্রের ত্যাগী শাক্যমুনি। এই উপজাতি যতটা সম্ভব হিন্দু ছিল, তাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে পিতৃপুরুষ মনুর জ্যেষ্ঠ সন্তানদের বংশধরদের নিয়ে গঠিত, যাদের তার পরবর্তী, কনিষ্ঠ স্ত্রীর জেদেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। বুদ্ধ এই নামটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে জানা যায় না, এমনকি তাঁর জীবনের শেষের দিকেও যখন শাক্যরা কোশলের রাজা বিদুদভের ক্রোধ অর্জন করেছিলেন এবং গণহত্যা করা হয়েছিল। তিনি রামসহ অবতারদের একজন ছিলেন এই মতবাদটি কোনও প্রতারণামূলক ব্রাহ্মণ পুরাণিক আবিষ্কার নয় বরং এটি বুদ্ধ নিজেই চালু করেছিলেন, যিনি রামকে তাঁর পূর্ববর্তী অবতার বলে দাবি করেছিলেন। অসংখ্য পণ্ডিত যারা প্রতিটি হিন্দু ধারণা বা রীতিনীতিকে "বৌদ্ধধর্ম থেকে ধার করা" হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পছন্দ করেন, তারা খুব উপযুক্তভাবে উল্লেখ করে এই "হিন্দু" মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে যুক্তি দিতে পারেন যে এটি "বৌদ্ধধর্ম থেকে ধার করা" ছিল।

কেরিয়ার

২৯ বছর বয়সে তিনি সমাজ ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে,

হিন্দুদের মধ্যে সমাজ থেকে বেরিয়ে আসা একটি সাধারণ ব্যাপার, যার মধ্যে তাদের নাগরিক নামও অন্তর্ভুক্ত, বর্ণের চিহ্ন ত্যাগ করা। ঋগ্বেদ ইতিমধ্যেই মুনিদের বর্ণনা করেছে যে তারা জটলা চুল এবং আকাশচুম্বী পোশাক পরে ঘুরে বেড়াত: এই ধরণের লোকেরাই আমরা এখন নাগা সাধু নামে পরিচিত। বুদ্ধের অনেক আগে থেকেই বৈদিক সমাজে তপস্বী একটি স্বীকৃত প্রথা ছিল। আত্ম ধারণার প্রবর্তক, উপনিষদের পুরোহিত হিসেবে সফল কর্মজীবন এবং দুই স্ত্রীর সাথে সমানভাবে সুখী পারিবারিক জীবনের পর সমাজে জীবন ত্যাগ করেছিলেন। পরিবার ত্যাগ করে এবং রাজনীতিতে তার ভবিষ্যৎ ত্যাগ করে, বুদ্ধ হিন্দু সমাজের মধ্যে বিদ্যমান ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন। তিনি আর বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করেননি, যা একজন বৈদিক ত্যাগীর জন্য স্বাভাবিক (যদিও জেন বৌদ্ধরা এখনও বৈদিক রীতিতে হৃদয় সূত্র পাঠ করে, যার শেষ হয় "সৌক" , অর্থাৎ স্বাহ)। তিনি উপনিষদে প্রমাণিত একটি আন্দোলনের একজন দেরী অনুসারী ছিলেন, যেমন... জ্ঞানের (জ্ঞানকাণ্ড) পক্ষে আচার-অনুষ্ঠান (কর্মকাণ্ড) ত্যাগ করার । বনে গিয়ে হিন্দু ধর্ম পালন করার পর, তিনি বেশ কয়েকটি পদ্ধতি চেষ্টা করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল দুই গুরুর কাছ থেকে শেখা কৌশলগুলি যা তাকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করতে পারেনি - তবে তা সত্ত্বেও তিনি সেগুলিকে নিজের এবং বৌদ্ধ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট। অন্যান্য কৌশলগুলির মধ্যে, তিনি অনাপানসতি অনুশীলন করেছিলেন , "শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ", যা আজও প্রায় সমস্ত যোগব্যায়ামে জনপ্রিয় আদি যোগ অনুশীলন। কিছু সময়ের জন্য তিনি জৈন ধর্মের হিন্দু সম্প্রদায়ে বিদ্যমান একটি চরম তপস্বী চর্চাও করেছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট কৌশলে নিবেদিত একটি সম্প্রদায়ে যোগদানের জন্য তার হিন্দু স্বাধীনতা এবং পরে তা ত্যাগ করার স্বাধীনতা ব্যবহার করেছিলেন, প্রতিটি পর্যায়ে হিন্দু ছিলেন।

এরপর তিনি নিজস্ব একটি কৌশল যোগ করেন, অথবা অন্তত বৌদ্ধ সূত্র আমাদের তাই বলে, কারণ নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না যে তিনি অন্য কোথাও বিপাসনা ("মননশীলতা") কৌশল শিখেননি। যদি না এর বিপরীত প্রমাণ সামনে আসে, তাহলে আমরা ধরে নিই যে তিনি নিজেই এই কৌশলটি আবিষ্কার করেছিলেন, কারণ একজন হিন্দু স্বাধীনভাবে এটি করতে পারেন। এরপর তিনি বোধি অর্জন করেন , অর্থাৎ "জাগরণ"। তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে, তিনি কোনওভাবেই এটি করার ক্ষেত্রে প্রথম ছিলেন না। পরিবর্তে, তিনি কেবল তার আগে অন্যান্য জাগ্রত প্রাণীদের মতো একই পথে হেঁটেছিলেন।

বৈদিক দেবতা ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের নির্দেশে, তিনি তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ জাগরণ অবস্থা ত্যাগ করে অন্যদের কাছে তাঁর পথ শিক্ষা দিতে শুরু

করেন। যখন তিনি "আইনের চক্রকে গতিশীল করেছিলেন" (ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন , চীনা ফালুন গং), তখন তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কোনও ইঙ্গিত দেননি। বিপরীতে, বিদ্যমান বৈদিক এবং উপনিষদের পরিভাষা (আর্য, "বৈদিকভাবে সভ্য", ধর্ম) ব্যবহার করে তিনি তাঁর বৈদিক শিকড়কে নিশ্চিত করেছিলেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁর ব্যবস্থাটি বৈদিক আদর্শের পুনরুদ্ধার যা অধঃপতিত হয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর শিষ্যদের তাঁর কৌশল এবং মানব অবস্থার বিশ্লেষণ শিখিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা যদি এইসব অধ্যবসায়ের সাথে অনুশীলন করে তবে একই জাগরণ অর্জন করবে।

জাত

বর্ণের ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাই যে তিনি বিদ্যমান বর্ণ সমাজের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। একজন অভিজাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে, তিনি মূলত উচ্চবর্ণের মধ্যে থেকে ৪০% এরও বেশি ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীতে এগুলিই সেই সমস্ত মহান দার্শনিকদের পরিচয় করিয়ে দেবে যারা বৌদ্ধধর্মকে ধারণাগত পরিশীলনের সমার্থক করে তুলেছিল। বিপরীতে, বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের মতো সুপরিচিত অ-বৌদ্ধ বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। যাতে এই ধারণা তৈরি না হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতের জন্য বৌদ্ধধর্মের একটি উপহার, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে বুদ্ধের বন্ধু বন্ধুল এবং প্রসেনাদি (এবং, একটি অনুমান অনুসারে, সম্ভবত তরুণ সিদ্ধার্থ নিজেই) তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, যা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে কোনও বৌদ্ধ সেখানে পৌঁছানোর আগেই। পরিবর্তে, বৌদ্ধরা হিন্দু সমাজ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকভাবে গড়ে তুলেছিল।

পূর্ব গঙ্গা সমভূমির রাজা ও সম্রাটরা বুদ্ধকে তাদের নিজস্ব একজন হিসেবে বিবেচনা করতেন (কারণ তিনি ছিলেন তাই) এবং আনন্দের সাথে তাঁর দ্রুত বর্ধনশীল সন্ন্যাস ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাদের ভৃত্য ও প্রজাদেরকে এর জন্য মঠের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করার নির্দেশ দিতেন। তিনি তাঁর মতো ভবিষ্যতের জাগ্রত নেতা, মৈত্রেয় ("যিনি বন্ধুত্ব/দানশীলতা অনুশীলন করেন") এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট করেছিলেন যে তিনি একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন। যখন রাজা প্রসেনাদি জানতে পারলেন যে তাঁর স্ত্রী শাক্য রাজকন্যা নন বরং শাক্য শাসকের এক দাসীর কন্যা, তখন তিনি তাকে এবং তাদের পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; কিন্তু তাঁর বন্ধু বুদ্ধ তাকে তাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিলেন।

তিনি কি এই কথা বলে এই অর্জন করেছিলেন যে জন্ম গুরুত্বহীন, "জাত খারাপ", নাকি "জাত গুরুত্বপূর্ণ নয়", যেমন আম্বেদকরবাদীরা দাবি করেন? না, তিনি রাজাকে সেই পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে

করিয়ে দিয়েছিলেন (তখন স্পষ্টতই একটি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার প্রক্রিয়ায়) যে বর্ণ কেবল পিতৃতান্ত্রিক বংশে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ঘোড়া এবং গাধার সংকর প্রজাতির মধ্যে, ঘোড়ার ঘোড়া এবং গাধার ঘোড়ার বংশধর তার পিতার মতোই ডাকে, অন্যদিকে গাধার ঘোড়া এবং ঘোড়ার ঘোড়ার বংশধরও তার পিতার মতোই ডাকে। তাই, প্রাচীনতম উপনিষদে, সত্যকাম জবালাকে তার ব্রাহ্মণ-একমাত্র শিক্ষক গ্রহণ করেন কারণ তার পিতাকে একজন ব্রাহ্মণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তার মা একজন দাসী-দাসী হওয়া সত্ত্বেও। এবং একইভাবে, রাজা প্রসেনাদির উচিত তার পুত্রকে ক্ষত্রিয় হিসেবে গ্রহণ করা, যদিও তার মা একজন পূর্ণাঙ্গ শাক্য ক্ষত্রিয় ছিলেন না।

যখন তিনি মারা যান, তখন আটটি শহরের অভিজাতরা তাঁর ভস্মের জন্য একটি সফল দরপত্র আহ্বান করে এই অজুহাতে: "আমরা ক্ষত্রিয়, তিনি একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাই তাঁর ভস্মের উপর আমাদের অধিকার আছে"। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে, তাঁর শিষ্যরা জনসমক্ষে এখনও জাতিভেদ পালনকারী হিসেবে দেখা যেতে আপত্তি করেননি, যা বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ প্রেক্ষাপটে ছিল। কারণ বুদ্ধ তাঁর অনেক শিক্ষায় কখনও তাদের জাতিভেদ ত্যাগ করতে বলেননি, যেমন তাদের মেয়েদের অন্য বর্ণের পুরুষদের সাথে বিবাহ দিতে। এটি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ছিল: আধ্যাত্মিক বার্তা সম্বলিত একজন পুরুষ হিসেবে, বুদ্ধ সামাজিক বিষয়ে যতটা সম্ভব কম সময় নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। যদি আপনার নিজের দুঃখজনক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যথেষ্ট কঠিন হয়, তবে একটি সমতাবাদী সমাজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আপনার আধ্যাত্মিক অনুশীলন থেকে একটি অবিরাম বিচ্যুতি প্রদান করে।

সাতটি নিয়ম

কখনও আলাদা অ-হিন্দু বৌদ্ধ সমাজ ছিল না। বেশিরভাগ হিন্দু বিভিন্ন দেবতা এবং শিক্ষকদের পূজা করত, তাদের বাড়ির বেদিতে এক বা একাধিক ছবি বা মূর্তি যুক্ত করত এবং কখনও কখনও সরিয়ে ফেলত। এইভাবে, বুদ্ধের কিছু সাধারণ উপাসক ছিল, কিন্তু তারা অন্যান্য দেবতা বা জাগ্রত প্রভুদের উপাসকদের থেকে আলাদা সমাজ ছিল না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সমাজের এই বাক্স-ধরণের বিভাজন হল নেহেরুভিয়ান ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারা আধুনিক হিন্দু সমাজে প্রবেশ করা আরেকটি খ্রিস্টীয় কুসংস্কার । সেখানে কেবল হিন্দুরা ছিল, হিন্দু বর্ণের সদস্যরা, যাদের মধ্যে কিছু ছিল বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ভারতে বৌদ্ধ ভবনগুলি প্রায়শই বৈদিক বাসস্থান বাস্তুশাস্ত্রের নকশা অনুসরণ করে । বৌদ্ধ মন্দিরের রীতিনীতি একটি প্রতিষ্ঠিত হিন্দু রীতি অনুসরণ করে। ভারতের বাইরেও বৌদ্ধ মন্ত্রগুলি বৈদিক মন্ত্রের রীতি অনুসরণ করে। বৌদ্ধধর্ম যখন চীন এবং জাপানে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৈদিক দেবতাদের (যেমন বারো আদিত্য) সাথে নিয়ে যান এবং তাদের জন্য মন্দির তৈরি

করেন। জাপানে, প্রতিটি শহরে নদী-দেবী বেনজাইতেনের , অর্থাৎ "সরস্বতী দেবী", দেবী সরস্বতীর জন্য একটি মন্দির রয়েছে। সেখানে তাকে ধূর্ত ব্রাহ্মণরা নয়, বরং বৌদ্ধরা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষের দিকে, বুদ্ধ সাতটি নীতি বর্ণনা করেছিলেন যার দ্বারা একটি সমাজ ধ্বংস হয় না (যা সীতা রাম গোয়েল তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস সপ্তশিলা , হিন্দিতে আরও বেশি রূপ দিয়েছেন), এবং এর মধ্যে রয়েছে: বিদ্যমান উৎসব, তীর্থযাত্রা এবং আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে সম্মান করা এবং বজায় রাখা; এবং পবিত্র পুরুষদের শ্রদ্ধা করা। এই উৎসবগুলি ইত্যাদি মূলত "বৈদিক" ছিল, অবশ্যই, মহাভারতে বলরামের সরস্বতী তীর্থযাত্রার মতো , অথবা বয়স্ক পাণ্ডব ভাইদের গঙ্গা তীর্থযাত্রার মতো। বিপ্লবী হওয়া থেকে দূরে, বুদ্ধ সামাজিক এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই নিজেকে একজন রক্ষণশীল হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিদ্রোহী বা বিপ্লবী ছিলেন না, তবে বিদ্যমান রীতিনীতিগুলি অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধ ছিলেন প্রতিটি ইঞ্চি হিন্দু।

https://bharatabharati.in/2013/08/10/buddha-was-every-inch-a-hindu-koenraad-elst/ **সংগ্রহের তারিখঃ ০৪/১০/২০২৫**

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

বুদ্ধ প্রতি ইঞ্চি একজন হিন্দু ছিলেনঃ যারা মনে করেন গৌতম হিন্দু ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেন তাদের প্রতি উত্তর - কোয়েনারদ এলস্ট (Koenraad Elst)

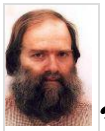

পূর্ববর্তী একটি প্রবন্ধে , আমরা যুক্তি দিয়েছিলাম যে বুদ্ধ হিন্দু হিসেবেই বেঁচেছিলেন এবং মারা গিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছুই নয়। আম্বেদকরবাদী নব্য-বৌদ্ধ এবং আম্বেদকর-দাসবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যখন তাদের পৃথক পরিচয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা হিন্দুদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হন। তাই আমরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন পেয়েছি যা অলঙ্কৃত এবং আমাদের দাবির অসারতা প্রকাশ করে। ছয়টি প্রশ্ন একজন মিঃ এস. নারায়ণস্বামী আইয়ারের, তারপর আরও তিনটি ডঃ রঞ্জিত সিংয়ের। আমরা সেগুলি পুনরুৎপাদন করি এবং তারপরে তাদের উত্তর দিই। প্রথমে মিঃ আইয়ারের প্রশ্ন:

(১) বুদ্ধ তাঁর শিক্ষায় আমাদের চারটি বেদের মধ্যে কোনটি অনুসরণ করেছিলেন?

মিঃ আইয়ার তাঁর লেখা জুড়ে হিন্দুধর্মের শত্রুদের ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি অনুমান করেছেন: তাদের নিজস্ব স্বার্থের উপর নির্ভর করে "হিন্দুধর্ম" এর

সংজ্ঞা বারবার পরিবর্তন করা। সুতরাং, খ্রিস্টান মিশন লবি শপথ করে যে "উপজাতিরা হিন্দু নয়", কেবলমাত্র যখন আদিবাসীরা বাঙালি মুসলিম বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা দখলের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করে অথবা স্বামী লক্ষ্মণন্দ এবং তার চার সহকারীকে হত্যা করার জন্য খ্রিস্টানদের উপর প্রতিশোধ নেয়; তখন তারা হঠাৎ "হিন্দু" হয়ে যায়। এখানে, যতক্ষণ সুবিধাজনক, "হিন্দু" কে "ব্রাহ্মণ্য" হিসাবে সংকুচিত করা হয়। হরিয়ানায় প্রতিষ্ঠিত পৌরব উপজাতির মধ্যে শুরু হওয়া বৈদিক ঐতিহ্য ছিল সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য, প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সংস্থার আকার ধারণ করে এবং শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে পৃথক করা এক শ্রেণীর লোকদের দ্বারা মুখস্থ করা হয়েছিল। একের পর এক উপজাতি এই ঐতিহ্য গ্রহণ করেছিল, সবই তাদের নিজস্ব পরিচয় এবং ধর্মীয় রীতিনীতি বজায় রেখে। বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতের রাজারা বৈদিক ঐতিহ্য আমদানি করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গুলিকে বসতি স্থাপনের জন্য জমি দিয়েছিলেন শুধুমাত্র এই মর্যাদাপূর্ণ বৈদিক ঐতিহ্য দিয়ে তাদের রাজবংশকে অলঙ্কৃত করার জন্য। কিন্তু বেদের পাশাপাশি অন্যান্য ঐতিহ্যও বিদ্যমান ছিল, ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীদের মধ্যে এবং দ্রাবিড় এবং অন্যান্যদের মধ্যেও। অনেক অ-বৈদিক উপাদান খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে সংগৃহীত পুরাণে প্রকাশিত হয়। আরও অনেকগুলি পরবর্তী ভক্তি (ভক্তি) কবিদের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল অথবা আজও মৌখিক সংস্কৃতির অংশ হিসাবে টিকে আছে। বৈদিক এবং অ-বৈদিক এই সমস্ত পৌত্তলিক রীতি একসাথে "হিন্দুধর্ম" গঠন করে।

হাজার বছর আগে যখন মুসলিম আক্রমণকারীরা ভারতে ফার্সি ভৌগোলিক শব্দ "হিন্দু" নিয়ে এসেছিল, তখন তারা এর অর্থ বোঝাতে চেয়েছিল: একজন ভারতীয় পৌত্তলিক। ইসলামী ধর্মতত্ত্বে, খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের একটি বিশেষ শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা হয় এবং পার্সিদের প্রায়শই ভারতীয় পৌত্তলিক নয় বরং ফারসি হিসেবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু বাকি সকল ভারতীয়কে "হিন্দু" বলা হত। উপজাতি, বৌদ্ধ ("পরিষ্কার-কাঁটা ব্রাহ্মণ"), নাস্তিক, বহুঈশ্বরবাদী, ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ, লিঙ্গায়াত, এমনকি এখনও বিদ্যমান নয় এমন শিখ বা আর্য সমাজী বা রামকৃষ্ণবাদী - তারা সকলেই হিন্দু ছিল। এটি এখন হিন্দু-বিরোধী বিতর্ককারীদের একটি লক্ষণ যে তারা "হিন্দুধর্ম" এর অর্থকে হেরফের করে এবং তাদের সুবিধার্থে এটিকে আরও বিস্তৃত বা আরও সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে। যুক্তির প্রথম নিয়ম হল "a = a", অর্থাৎ "একটি শব্দ সমগ্র যুক্তি প্রক্রিয়া জুড়ে একই অর্থ ধরে রাখে"। সুতরাং, এই হেরফেরগুলির বিরুদ্ধে, আমরা হিন্দুধর্মের জন্য একটি অর্থে অটল থাকব, অর্থাৎ "সমস্ত ভারতীয় পৌত্তলিক " এর ঐতিহাসিকভাবে ন্যায্য অর্থ।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, বুদ্ধ ক্ষত্রিয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এর অর্থ হল, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল অন্তত বেদে নিষ্ক্রিয় দীক্ষার মাধ্যমে। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি কখনও এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেননি। বিপরীতে, তিনি কেবল বৈদিক ঐতিহ্যে বিদ্যমান ধারণাগুলিই বিকাশ করেছিলেন। সুতরাং, "মুক্তি" ছিল এমন একটি লক্ষ্য যা উপনিষদের চিন্তাবিদরা আবিষ্কার করেছিলেন এবং যা তাদেরকে কার্যত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম (অবশ্যই খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম থেকে) থেকে পৃথক করে তুলেছিল। এই মুক্তি অর্জনের কৌশল হিসেবে ধ্যান বা যোগব্যায়ামের কথা প্রথমে উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে দুজন ধ্যান শিক্ষকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাদের কাছে বুদ্ধ অধ্যয়ন করেছিলেন। সর্বাধিক তিনি একটি নতুন ধ্যান কৌশল, বিপাসনা (এখন অশ্লীলভাবে "মাইন্ডফুলনেস" হিসাবে পরিচিত), আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু ধ্যান ছিল একটি বিদ্যমান ঐতিহ্য যার মধ্যে তিনি প্রবীণ গুরুদের দ্বারা দীক্ষা পেয়েছিলেন এবং অন্যদের মতো তিনিও এতে নিজের যোগদান করেছিলেন।

পুনর্জন্ম এবং কর্ম বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, এবং বহিরাগতরা বৌদ্ধধর্মের সাথে প্রথম যে বিষয়টি যুক্ত করে; কিন্তু এই ধারণাগুলি উপনিষদে প্রবর্তিত হয়েছিল। এমনকি বেদ যা হয়ে উঠেছিল তার প্রত্যাখ্যান, বিশেষ করে আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যাখ্যান, ইতিমধ্যেই উপনিষদে পাওয়া যায়। এবং কামনার প্রত্যাখ্যান, করুণার মূল্যের প্রশংসা (দয়া) এবং ব্রহ্মচারী ভিক্ষুত্বের প্রথম বিকল্পগুলিও। বুদ্ধ যখন একজন সংযমী হয়েছিলেন, তখন তিনি এমন একটি পথ অনুসরণ করেছিলেন যা ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং এটি ইতিমধ্যেই ঋগ্বেদে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও শুধুমাত্র তৃতীয় পুরুষে (বৈদিক কবিরা নিজেরাই ছিলেন অভিজাত ব্যক্তিত্ব এবং ত্যাগীদের থেকে আলাদা শ্রেণী)। বুদ্ধ ঠিকই বলেছিলেন যে তিনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি, তিনি কেবল পূর্ববর্তী বুদ্ধদের দ্বারা পদদলিত একটি প্রাচীন পথ অনুসরণ করছেন ।

হিন্দুদের বেদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। কেউ কেউ কখনও এগুলোর কথা শোনেনি, কেউ কেউ নাম শুনেছিল কিন্তু এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে খুব কমই জানত, কেউ কেউ ভেবেছিল এগুলো আকর্ষণীয় সাহিত্য কিন্তু নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বা জীবনযাপনের পথ বেছে নেওয়ার জন্য পথপ্রদর্শক আলো নয়, কেউ কেউ এমন রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল যা তারা বৈদিক বলে অভিহিত করেছিল যদিও তা ছিল না, কেউ কেউ মুখে মুখে বেদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, এবং কেউ কেউ সত্যিই বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলন করেছিল বা মুখস্থ করে বেদ শিখেছিল। এই ধারাবাহিকতার মধ্যে, বুদ্ধ তার স্থান দখল করেছিলেন, এটি কখনও ব্রাহ্মণদের জন্য কোনও সমস্যা ছিল না। তার নিজের

একজন ঈর্ষান্বিত শিষ্য, একজন নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ দ্বারা তার জীবনের উপর মাত্র দুটি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। তবুও, তিনি বৃদ্ধ বয়সে মারা যান।

(২) আমাদের ৩৩০টি দেবতার মধ্যে বুদ্ধ কোন দেবতার পূজা করেছিলেন?

স্বাভাবিক সংখ্যাটি ৩৩, কিন্তু আধুনিক পর্যটকরা (এবং সেইজন্য ধর্মনিরপেক্ষরাও) ৩৩০ মিলিয়ন বেছে নিয়েছেন। এই সংখ্যাটি "৩৩টি বৃহৎ দেবতা"-কে "৩৩ কোটি (এক কোটি = দশ কোটি) দেবতা" হিসেবে ভুলভাবে অনুবাদ করার উপর ভিত্তি করে তৈরি। যাই হোক, সংখ্যাটি ভিন্ন হতে পারে, তবে হ্যাঁ, বেশ কয়েকটি আছে, আসুন আমরা "অনেক" দিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। অনেক অভিজাত চরিত্র এবং চিন্তাবিদদের মতো, বুদ্ধ উপাসনা ছাড়া অন্য কিছুতে জড়িত বলে পরিচিত, যেমন বৈদিক সমাজের অনেক মানুষ ছিলেন। সাংখ্য ছিল একটি নাস্তিক মতবাদ, যেমন ছিল আদি বৈশেষিক মতবাদ, এবং জৈন ধর্ম এবং চার্বাক মতবাদও। মীমাংসা মতবাদ, সর্বোত্তম অর্থোডক্স মতবাদ, শিক্ষা দিয়েছিল যে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান কার্যকর, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানের সময় যেসব দেবতাদের আবাহন করা হয় তারা পুরোহিতদের দ্বারা স্থাপিত জাদুকরী প্রক্রিয়ার কেবল চাকা। এই দেবতাদের নিজেদের মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই এবং কেবলমাত্র ততক্ষণ পর্যন্তই অস্তিত্ব রয়েছে যতক্ষণ না তারা তাদের "খাওয়ানো" মানুষের দ্বারা অস্তিত্বে বিনিয়োগ করে। সুতরাং, হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে নাস্তিকতা একটি স্বীকৃত বিকল্প ছিল, যার মধ্যে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম, বুদ্ধ, একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

তবুও, তিনি মাঝে মাঝে দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। মুক্তির পথে তাঁর সাফল্যের পরে পরম দেবতা ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের হস্তক্ষেপ ঘটে, তাঁকে তাঁর আনন্দ ভাগ করে নিতে এবং অন্যদের সাথে মুক্তির পথ শেখাতে বলেন - বৌদ্ধধর্মের একেবারে শুরু। বুদ্ধ অথবা এমনকি পালি ক্যাননের পরবর্তী সম্পাদকরা যদি বর্তমান নব্য-বৌদ্ধদের কল্পনার মতো বৈদিক-বিরোধী হতেন, তাহলে তারা সহজেই এই পর্বটি সেন্সর করতে পারতেন। তাঁর জীবনের শেষের দিকে, যখন রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর নিয়মিত পরামর্শ নেওয়া হত কারণ তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় খুব আগ্রহী ছিলেন, তখন একটি প্রজাতন্ত্রের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেই গুণাবলী প্রণয়ন করতে বলেছিলেন যার দ্বারা একটি রাষ্ট্র পতন রোধ করে। উত্তরে, তিনি "অধঃপতনের সাতটি নীতি" তালিকাভুক্ত করেছিলেন, এবং এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ, যার মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান এবং তীর্থযাত্রা অন্তর্ভুক্ত। তিনি যে প্রাচীন ধর্মীয় রীতিগুলি জানতেন, তা বৈদিক ছিল অথবা যে কোনওভাবে হিন্দু। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পরবর্তীতে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, গণপতি এবং সরস্বতীর মতো বৈদিক দেবতাদের বিদেশে নিয়ে যান। জাপানি মন্দিরগুলি বেনজাই-টেন বা

সরস্বতীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, কিছু মন্দিরে "বারো আদিত্য/দশ" বাস করে। বৌদ্ধধর্মের শিঙ্গন সম্প্রদায়ের একটি আধা-বৈদিক রীতিনীতি রয়েছে যাকে "দেবতাদের খাওয়ানো" বলা হয়, ঠিক বেদের ধারণার মতোই। থাই এবং ইন্দোনেশিয়ান বৌদ্ধরা রামের ধর্ম গ্রহণ করেছে, যাকে বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে উপাসনা করতেন না কিন্তু তিনি ইক্ষ্বাকু বংশের একজন মহান বংশধর হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন যার সাথে তিনি নিজেও ছিলেন এবং যাঁর পুনর্জন্ম বলে দাবি করেছিলেন। নব্য-বৌদ্ধরা দীর্ঘস্থায়ী পৌরাণিক শিক্ষার বিরোধিতা করেন যে রাম এবং বুদ্ধ উভয়ই বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু এই শিক্ষার বীজ বুদ্ধ নিজেই রোপণ করেছিলেন যখন তিনি দাবি করেছিলেন যে রাম এবং তিনি একই ব্যক্তি।

(৩) বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের কোন সংস্কার লালন ও পালন করতে বলেছিলেন?

বৈদিক কবিদের মতো সমাজে বসবাসকারী মানুষের জন্য সংস্কার (জীবনযাত্রা) তৈরি করা হয়। ত্যাগীরা সমাজের বাইরে থাকেন, প্রায়শই তারা "পৃথিবী ত্যাগের" পরে তাদের নিজস্ব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন, এবং তারপরে সংস্কারগুলি আর তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। বুদ্ধ একটি সন্ন্যাস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ত্যাগের একটি সংগঠিত রূপ। তিনি একটি পৃথক অ-হিন্দু ধর্ম খুঁজে পাননি (যেভাবে প্রথম খ্রিস্টানরা ইহুদি ধর্ম থেকে পৃথক হয়েছিলেন), কারণ তাঁর সাধারণ অনুসারীরা হিন্দু সমাজের অংশ ছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তাদের বর্ণের উৎপত্তি, তাদের পরিবার, তাদের বিবাহের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। তাদের নিজ নিজ হিন্দু সম্প্রদায়ে প্রযোজ্য যেকোনো রীতিনীতি বা আচার-অনুষ্ঠান তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জৈনরা একটি পৃথক সাধারণ সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল, কিন্তু এই সাধারণ জৈনরাও হিন্দু সমাজের অংশ। তারা বর্ণ পালন করে, প্রায়শই একই বর্ণের অ-জৈনদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় কিন্তু অন্য বর্ণের জৈনদের সাথে নয়। বৌদ্ধধর্মে, এমনকি এত বিচ্ছিন্নতাও বিদ্যমান ছিল না। বৌদ্ধধর্ম হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি সন্ন্যাস সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা হিন্দু সমাজের জীবন রীতিনীতি পালন করত না, ঠিক যেমন অনেক অ-বৌদ্ধ ত্যাগীও তা পালন করতেন না।

(৪) বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের বর্ণাশ্রমের কোন কোন নিয়ম, কর্তব্য এবং অনুশীলন শিখিয়েছিলেন এবং আজ তারা কোন কোনটি পালন করেন?

জাতপাত সাধারণ সমাজের একটি অংশ, যা ত্যাগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাদের বর্ণের উৎপত্তি প্রকাশকারী নামগুলি সন্ন্যাসীর নাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। প্রশ্নকর্তা বুদ্ধের সময়ের বর্ণগত সম্পর্ককে সাম্প্রতিক হিন্দু সমাজের বর্ণগত সম্পর্ক হিসাবে উপস্থাপন করে তার অদূরদর্শী ধারণাগুলিকেও প্রকাশ করেন। সেই সময়ে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল ছিল, যেমন বুদ্ধ পিতামাতার

বংশের নির্বিশেষে পিতামাতার বংশ দ্বারা সংজ্ঞায়িত বর্ণকে রক্ষা করেছিলেন, যখন রাজা পসেনদি জানতে পারেন যে তার স্ত্রী (এবং তাই, তিনি ধরে নেন, তার পুত্র) একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় নন, তখন তিনি তার স্ত্রী এবং পুত্রকে অস্বীকার করেছিলেন। স্পষ্টতই, বর্ণের উভয় ধারণা, যেমন পিতৃতান্ত্রিক বংশ বনাম পূর্ণ বিবাহ, সেই সময়ে প্রতিযোগিতামূলক ছিল, বুদ্ধ তৎকালীন আরও রক্ষণশীল অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, যখন পরবর্তীকালে পূর্ণ বর্ণগত বিবাহ (কেবলমাত্র নিজের বর্ণের মধ্যে বিবাহ) নীতিটি প্রাধান্য পেয়েছিল। মনে রাখবেন, বুদ্ধ বর্ণগত বিষয়ে রাজার প্রশ্নের এই চমৎকার সুযোগটি বর্ণের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত করার জন্য ব্যবহার করেননি। ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের কল্পনা অনুযায়ী, যদি তিনি একজন বর্ণ-বিরোধী বিপ্লবী হতেন, তাহলে তিনি এই সুযোগে বর্ণ-প্রথার নিন্দা করতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।

বর্ণবাদ বিদ্যমান ছিল কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীর তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ছিল। এই কারণে, নব্য-বৌদ্ধদের মধ্যে বর্ণবাদের প্রতি আচ্ছন্নতার বিপরীতে, বুদ্ধের মনোভাবও আরও বেশি স্বচ্ছন্দ ছিল। তাছাড়া, তিনি এমন একটি সমাজে নৌকা না চালানো বেছে নিয়েছিলেন যেখানে তাঁর সন্ন্যাস ব্যবস্থা সহ্য করা হয়েছিল এবং বজায় রাখা হয়েছিল। প্রতিটি দেশে যেখানে বৌদ্ধধর্ম স্থান পেয়েছিল, সেখানেই তারা যে সামাজিক ব্যবস্থা বিরাজমান তা মেনে নিয়েছিল। থাইল্যান্ডে, এটি বংশগত রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করেনি যদিও এটি একটি সর্বোত্তম বর্ণবাদী ঘটনা। চীনে এটি কেন্দ্রীভূত-আমলাতান্ত্রিক সাম্রাজ্য বিলুপ্ত করেনি। বিপরীতে, যখন বৌদ্ধ সাদা পদ্ম সম্প্রদায় মঙ্গোল রাজবংশকে বিতাড়িত করে, তখন এর নেতা, যিনি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসেবে শুরু করেছিলেন এবং মৈত্রেয় বুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন, একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদী রাজবংশ, মিং প্রতিষ্ঠা করেন, মঙ্গোল শাসক শ্রেণীর স্থলে একটি চীনা শাসক শ্রেণী স্থাপন করেন কিন্তু শোষণমূলক ব্যবস্থাকে বহাল রাখেন। জাপানে, এটি সামরিকবাদী সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত করেনি; পরিবর্তে, এর জেন স্কুল সামুরাই যোদ্ধা শ্রেণীর প্রিয় ধর্ম হয়ে ওঠে। তাই, ভারতেও, তারা এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিয়েছিল, মূলত উচ্চবর্ণের (বেশিরভাগ বৌদ্ধ দার্শনিক জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ ছিলেন) মধ্যে থেকে নিয়োগ পেয়েছিল এবং এর আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে মনোনিবেশ করেছিল। বর্ণবিরোধী আন্দোলন হিসেবে বৌদ্ধধর্ম ধর্মনিরপেক্ষ কল্পনার একটি রূপক মাত্র।

(৫) কোন হিন্দু পুরোহিত বুদ্ধকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছিলেন? যে কোনও বংশধারা এমন একজনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যিনি লাফ দেন। পরবর্তীতে, এটি অনুসারীদের দ্বারা অব্যাহত থাকে যারা দীক্ষা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যান; এবং যখন তাদের গুরু উত্তরসূরী হন, তখন তারা একটি দীক্ষা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যান। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা

কেবল জ্ঞানার্জনের মুহূর্ত পান। প্রতিষ্ঠাতার দীক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা মানে হল মধ্যম মন তার নম্র নিয়মগুলি একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া। সুতরাং, হঠাৎ করে যখন অন্তর্দৃষ্টি তাকে কাবু করে ফেলে তখন রমণ মহর্ষি অপ্রস্তুত ছিলেন; তিনি কোনও শিক্ষকের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেননি। তবুও, সিদ্ধার্থ গৌতম যখন বনে যান, তখন তিনি কমপক্ষে দুজন ধ্যান গুরুর শিষ্য হয়েছিলেন। সম্ভবত তারা তাকে কোনও ধরণের দীক্ষা দিয়েছিলেন, যদিও আমাদের কাছে এর বিস্তারিত তথ্য নেই।

প্রশ্নকর্তা যখনই "হিন্দু" বলেন, তখন তিনি "বৈদিক" বলতে শুরু করেন, এবং আমরা যা কিছু হিন্দু (আর্য সমাজ যাকে "পুরাণিক" বলে) বলে থাকি, তা বৈদিক যুগের সাথে সংযুক্ত করেন। সন্ন্যাস (ত্যাগ) এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ আজও শঙ্করের সময়কাল থেকে স্বীকৃত রূপ ধারণ করে। বৈদিক যুগেও, সন্ন্যাস এর বর্তমান আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যমান ছিল না। যখন যাজ্ঞবল্ক্য বনে চলে যান (যে উপলক্ষে তিনি তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে তাঁর আত্মার বিখ্যাত ব্যাখ্যা প্রদান করেন), তখন তাঁকে কারও অনুমতি নিতে হয়নি। রামায়ণ খ্যাত বাল্মীকি তাঁর নিজস্ব আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, যেমন দ্রষ্টা বশিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রী অরুন্ধতী করেছিলেন। তাই তিনি পঁচিশ শতাব্দী আগে বুদ্ধের উপর বর্তমান হিন্দু রীতিনীতি আরোপ করতে শুরু করেন। এটি কেবল নব্য-বৌদ্ধ বাগ্মিতার সামগ্রিক অঐতিহাসিক চরিত্রকে চিত্রিত করে।

(৬) দীক্ষা কখন এবং কোথায় হয়েছিল?

ছোটবেলায়, বুদ্ধ অবশ্যই সুতো পরার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, যার ফলে তিনি একজন পূর্ণ ক্ষত্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এটি বেশিরভাগ আধুনিক ক্ষত্রিয়দের থেকে আলাদা ছিল, যারা কেবল ব্রাহ্মণদের উপর সুতো পরার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তারপর, তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, অন্তত পালি ধর্মগ্রন্থ অনুসারে। কিছু পণ্ডিত সন্দেহ করেন যে তাঁর একজন স্ত্রী এবং পুত্র ছিলেন এবং মনে করেন যে পরবর্তী পণ্ডিতরা কেবল একজন নির্দিষ্ট সন্ন্যাসী এবং একজন নির্দিষ্ট সন্ন্যাসীকে তাঁর মা এবং পুত্রে পরিণত করেছেন। যাই হোক না কেন, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অস্বীকার করার কোনও প্রচেষ্টা করে না যে তিনি তাঁর শ্রেণী এবং বয়সের যে কোনও ব্যক্তির জীবনের অংশ হিসাবে যে কোনও উপযুক্ত হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।

পরে, যখন তিনি ত্যাগী হন, তখন আমাদের অস্পষ্টভাবে বলা হয় যে প্রথমে তিনি একা অনুসন্ধান করেছিলেন, তারপর তাঁর কিছু সঙ্গী ছিল (যদিও তাদের সম্পর্কের সমস্ত বিবরণ আমাদের কাছে নেই), তারপর তাঁর পরপর দুজন শিক্ষক ছিলেন। সেই সময়ে ত্যাগী হওয়ার জন্য, তাকে নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি, তবে তিনি হয়তো করেছেন। তারপর, তিনি জাগ্রত হওয়ার পর, তিনি তাঁর বিশ্বজগতের সর্বোচ্চ

ব্যক্তি হয়ে ওঠেন এবং কোনও জীবিত মানুষকে তার উপরে স্বীকৃতি দেননি এবং তাকে আরও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দেননি। তাঁর শিষ্যরা একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন (ধর্মম শরণম গচ্ছামি: "আমি ধর্মে আশ্রয় নিই"), ঠিক যেমন প্রতিটি হিন্দু সম্প্রদায়ের নতুন সদস্যদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। তাঁর শিষ্যদের সাথে তাঁর শিষ্যদের সম্পর্ক ছিল অন্যান্য ত্যাগীদের তাদের গুরুর সাথে একই রকম। গুরু-ধর্মের প্রতিষ্ঠানটি আবার বৌদ্ধধর্ম দ্বারা জাপান পর্যন্ত রপ্তানি করা হয়েছিল।

তারপর আমরা ডঃ সিংয়ের অতিরিক্ত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করব:

(১) যৌবন ও বুদ্ধপূর্ব ভিক্ষা জীবনে তিনি নিজে কোন কোন নিয়ম, কর্তব্য এবং রীতিনীতি অনুসরণ করেছিলেন, অনুসরণ করেছিলেন এবং আগেও করতেন?

পালি ধর্মগ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তিনি শাক্য গোত্রের আজীবন রাষ্ট্রপতির পুত্র ছিলেন, যিনি জন্মগতভাবে এবং লালিত-পালিতভাবে একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি ত্যাগী হওয়ার পর, তিনি তপস্যা এবং বেশ কয়েকটি ধ্যান কৌশল অনুশীলন করেছিলেন যার নাম দেওয়া হয়েছে, যদিও আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে এই নামগুলি দ্বারা কোন কৌশলগুলি বোঝানো হয়েছে। যাই হোক, এগুলি একই নাম এবং সম্ভবত একই কৌশলগুলিকে নির্দেশ করে যা বৌদ্ধ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল যা বুদ্ধকে জাগরণ এনেছিল এমন ধ্যান কৌশলের আগে।

(২) তাঁর প্রথম চাচাতো বোন যশোধরার সাথে তাঁর বিবাহ কি বৈদিক নিয়ম অনুসারে হয়েছিল: শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে?

ভারতে লেখালেখির সূচনা হয়েছিল আলেকজান্ডারের পরে, অর্থাৎ বুদ্ধের অনেক পরে। যদিও শাস্ত্রগুলিতে প্রাচীন উপাদান রয়েছে, তবুও সেগুলি বুদ্ধের চেয়ে শতাব্দী পরে লেখা হয়েছিল। বৈদিক ঋষিদের যুগে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন ছিল। তাই, যদি না ডঃ সিং জোর দিয়ে বলেন যে বৈদিক ঋষিরা অ-হিন্দু ছিলেন, তাহলে শাস্ত্র অনুসরণ করা একজন "হিন্দু"-এর একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নয়। বেশিরভাগ হিন্দু-বিরোধী বিতর্কবাদীদের (এবং, হায়, বেশ কয়েকজন সমর্থকেরও) মতো, তিনি "হিন্দুধর্ম" বলতে কী বোঝায় তার একটি অত্যন্ত অ-ঐতিহাসিক ধারণা প্রদর্শন করেন, প্রাচীন ইতিহাসের উপর সাম্প্রতিক ধারণাগুলি তুলে ধরেন।

এই প্রশ্নটি শাক্য উপজাতি এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী আদেশের মধ্যে বিবাহ রীতিনীতির পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে। ব্রাহ্মণরা "নিষিদ্ধ মাত্রার আত্মীয়তার" নিয়ম পালন করে এবং তাদের শাস্ত্রগুলি নির্দেশ করে। বিপরীতে, প্রাচীন দ্রাবিড় বা সমসাময়িক মুসলিমদের মতো কিছু অন্যান্য জাতি, চাচাতো ভাইয়ের বিবাহ পালন করে। এই ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাই যে শাক্য উপজাতি চাচাতো ভাইয়ের বিবাহ পালন করত। বুদ্ধের পিতা এবং মাতা

চাচাতো ভাই ছিলেন, এবং তাঁর নিজস্ব কথিত মিলনও চাচাতো ভাইদের মধ্যে ছিল। শাক্যরা স্পষ্টতই সচেতন ছিলেন যে পারিপার্শ্বিক সমাজের মধ্যে, তারা এই রীতির সাথে আলাদা ছিলেন, কারণ তারা এই গল্পটি দিয়ে এটিকে ন্যায্যতা দিয়েছিলেন যে তাদের রক্ত অত্যন্ত পবিত্র, পিতৃপুরুষ মনু বৈবস্বতের প্রত্যাখ্যাত বড় ছেলেদের বংশধর, যারা বনে ঋষি কপিলের আশ্রমে এসেছিল এবং সেখানে একটি শহর, কপিলাবস্তু (যেখানে বুদ্ধ বেড়ে উঠেছিলেন) তৈরি করেছিল। তাই, মনুর রক্তকে বিশুদ্ধ রাখতে, শাক্যদের একই রক্তের কাউকে বিয়ে করতে হয়েছিল।

কিছু পণ্ডিত বলেন যে এটি কেবল তাদের প্রতিবেশীদের বোঝানোর জন্য তৈরি একটি গল্প। তাদের মতে, আসল বিবরণ হল যে শাক্যরা মূলত একটি ইরানী উপজাতি ছিল যারা পূর্ব দিকে সরস্বতী সমভূমি থেকে গঙ্গা সমভূমিতে বিশাল অভিবাসনের সাথে সাথে চলে এসেছিল। ইরানী এবং ভারতীয়দের মধ্যে চাচাতো ভাইদের বিবাহের প্রচলন ছিল প্রধান পার্থক্যগুলির মধ্যে একটি। সমসাময়িকরা বুদ্ধকে লম্বা এবং হালকা চামড়ার বলে বর্ণনা করেন যা ইরানী পরিচয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। আজকাল, ভারতে বারো শতাব্দী পরেও, পার্সিরা এখনও শারীরিকভাবে আলাদা। যাই হোক না কেন, চাচাতো ভাইদের বিবাহের প্রথা শাক্যদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তার উৎপত্তি যাই হোক না কেন।

এখানে আমরা যা দেখছি তা হল, হিন্দু সমাজের আরেকটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য, বর্ণ স্বায়ত্তশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করার একটি সাধারণ উদাহরণ। তুলনা করার জন্য, দুটি বরং নাটকীয় উদাহরণ বিবেচনা করুন। ঋগ্বেদ থেকে ব্রাহ্মণ্য রচনায় বিধবা আত্ম-দহন (সতীদাহ) নিষিদ্ধ, যেখানে একজন মহিলাকে তার স্বামীর চিতায় শুয়ে থাকতে বলা হয়েছে যে তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, সেই পুরুষকে পিছনে ফেলে জীবিতদের সাথে পুনরায় যোগ দিতে হবে; তবুও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে, বিশেষ করে রাজপুতদের মধ্যে এই প্রথাটি সমৃদ্ধ হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা যত খুশি নিয়ম স্থাপন করতে পারত, এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী নিম্ন বর্ণের লোকেরা এই ব্রাহ্মণ রীতিনীতিগুলি অনুকরণ করতে পারত; কিন্তু যদি কোনও জাতি এই রীতিনীতিগুলিকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে এটি সম্পর্কে খুব কমই করা যেত। আরেকটি উদাহরণ: গর্ভপাতকে শাস্ত্রীয়ভাবে সবচেয়ে খারাপ পাপগুলির মধ্যে একটি হিসাবে নিন্দা করা হয়েছে। তবুও, কিছু জাতি, যেমন কুখ্যাত জাট, জন্মের আগে বা পরে তাদের অবাঞ্ছিত সন্তানদের হত্যা করতে পারে। আজকের ভারতে যদি এত বেশি মেয়েশিশু গর্ভপাতের কারণে লিঙ্গের ভারসাম্য নিয়ে সমস্যা হয়, তাহলে এটি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী (যদিও ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদীরা অজ্ঞ পশ্চিমা দর্শকদের কাছে এখনও "হিন্দুধর্ম" কে দোষারোপ করবেন)। কিন্তু বর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হল শাস্ত্রীয়

আইন নয়, বরং বর্ণ পঞ্চায়েত (পরিষদ)ই চূড়ান্ত বিচারক। সুতরাং, যদি শাক্যরা তাদের নিজস্ব অ-ব্রাহ্মণ্য বিবাহ রীতিনীতি বজায় রাখার উপর জোর দিত, তাহলে হিন্দু সমাজ তাদের তা করার অনুমতি দিয়েছিল।

(৩) কীভাবে; ধর্মগ্রন্থ, হিন্দু শাস্ত্রের কোন কর্তৃত্ব এবং বিধানের ভিত্তিতে তিনি চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন এবং জন্মগত রাজপুত্র হিসেবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন? জন্মগত রাজপুত্র হিসেবে তাঁর জন্য কি ধর্ম ছিল? এটি কি শাস্ত্রের শিক্ষা ও বিধান অনুসারে এবং ক্ষত্রিয় বর্ণের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত ছিল? এবং এটি কি এভাবেই নির্ধারিত এবং প্রতিষ্ঠিত ছিল? যদি হ্যাঁ; আমরা কি জানতে পারি কিভাবে এবং কোথায়? কোন শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে: কোন প্রমাণ, শব্দ এবং শাস্ত্রের বিধান?

এখানে আবারও, বুদ্ধের জীবদ্দশায় হিন্দু সমাজের উপর পরবর্তী হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রচুর প্রভাব আমাদের সামনে এসেছে। প্রথমত, "চতুর্থ আশ্রম" ধারণাটি - এবং এখানে আমি বেশিরভাগ হিন্দু এবং বেশিরভাগ ভারতবিদদের সাথে পার্থক্য করি - একটি বিভ্রান্তিকর আপোষমূলক ধারণা। বৈদিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে জীবনের তিনটি স্তরকে আলাদা করে: নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠার আগে, সময় এবং পরে, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য/ছাত্র, গৃহস্থ/গৃহস্থ্য এবং বানপ্রস্থ/বনবাসী। প্রথম স্তরটি শেখার জন্য নিবেদিত, দ্বিতীয়টি আপনার পরিবার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করার জন্য (যতক্ষণ না আপনার মেয়েদের বিয়ে হয় এবং আপনার প্রথম নাতির জন্ম হয়), তৃতীয়টি ত্যাগের জন্য নিবেদিত। এই ত্যাগ বিভিন্ন রূপ নিতে পারে এবং বিভিন্ন লক্ষ্য ধারণ করতে পারে, তবে অন্তত যাজ্ঞবল্ক্যের সময় থেকে, এটি আত্মার সন্ধান, আপনার মুক্তির জন্য কাজ করার হিসাবে বোঝা গিয়েছিল। এটি দুটি ভাগে বিভক্ত নয়, সন্ন্যাস বানপ্রস্থ পর্যায়ের চেয়ে বেশি ত্যাগী নয়। যখন তপস্বী সম্প্রদায়গুলি পারিবারিক জীবনের বিকল্প হিসেবে ত্যাগের প্রবর্তন করে, তখনই ব্রাহ্মণরা আশ্রম পরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করে সন্ন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন জিনিসগুলিকে একীভূত করার তাদের সাধারণ কাজটি সম্পন্ন করে। সুতরাং, বুদ্ধ যা প্রবেশ করেছিলেন তা "চতুর্থ স্তর" ছিল না (তিনি তখনও দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলেন এবং কখনও তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেননি), বরং দ্বিতীয় স্তরের (পারিবারিক জীবনের) বিকল্প ছিল, অর্থাৎ পূর্ণকালীন পরিচয় এবং আজীবন পেশা হিসেবে ত্যাগ। ঠিক যেমন শঙ্করকে করতে হয়েছিল, এবং যেমন হিন্দু ভিক্ষুরা এখনও করেন। বহুত্ববাদী হওয়ার কারণে, হিন্দু সমাজ পারিবারিক জীবনের পরে এবং পারিবারিক জীবনের পরিবর্তে ত্যাগের বিভিন্ন রূপকে স্বীকৃতি দেয়।

ক্ষত্রিয় হিসেবে, সংসার ত্যাগ করা বুদ্ধের ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হত না। তাঁর পিতা আশা করেছিলেন যে তাঁর পুত্র তাঁর উত্তরসূরী হবেন এবং তাঁকে সংসার ত্যাগ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন

(তার বর্ণ পেশা সহ)। একইভাবে, শঙ্করের মা তাঁর পুত্রকে অল্প বয়সে ত্যাগী হওয়া থেকে বিরত রাখার এবং বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ তিনিই ছিলেন তাঁর নাতি-নাতনি হওয়ার একমাত্র আশা। হিন্দু সমাজ পারিবারিক জীবনের বিকল্প হিসেবে ভিক্ষুত্বের বিকল্পকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এই বিকল্পের দ্বারা ব্যক্তিগত হিন্দু জীবন এবং পরিকল্পনাগুলি বিরূপভাবে প্রভাবিত হতে পারে না। সিদ্ধার্থ এবং শঙ্কর উভয়ই তাদের পরিবারকে হতাশ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য তাদের বর্ণ ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন।

উপসংহার

প্রশ্নকর্তাদের কেউই বুদ্ধের জীবনের বা প্রচারের এমন একটি মুহূর্তও নির্দিষ্ট করতে পারেননি যখন তিনি হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। তিনি তার বেশিরভাগ ধারণা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন পরিবেষ্টিত হিন্দু ঐতিহ্য থেকে, এবং বেশিরভাগই তিনি যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাস ব্যবস্থার মাধ্যমে তা আলাদা হয়ে ওঠে। তাঁর ধ্যান কৌশল হয়তো তাঁর নিজস্ব, যদিও তাঁর মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে লিখিত একটি ক্যানন এবং নিরপেক্ষ লেখকদের দ্বারা লিখিত, আমরা আসলে জানি না কী ঘটেছিল। তাঁর বৌদ্ধিক ব্যবস্থা বেশিরভাগই বাতাসে থাকা ধারণাগুলিকে সুশৃঙ্খলিত করেছিল এবং ইতিমধ্যেই উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁর সন্ন্যাসীদের মধ্যে, ব্রাহ্মণ দার্শনিকরা ধীরে ধীরে তাঁর দর্শনকে পরিমার্জিত এবং নিখুঁত করেছিলেন, তাদের বেশিরভাগ নতুন ধারণাকে স্বয়ং গুরুকে দিয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালে ডঃ বি.আর. আম্বেদকর যখন বৌদ্ধ ধর্মে "ধর্মান্তরিত" হন, তখন তিনি তাঁর সহ-ধর্মান্তরিত অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি দেন যে তারা হিন্দু ধর্ম এবং নির্দিষ্ট হিন্দু রীতিনীতি ত্যাগ করবেন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এটিই প্রথমবারের মতো ঘটেছিল। বুদ্ধ কখনও তাঁর নবীনদের তাদের পূর্বে পালন করা কোনও ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করেননি - বাস্তবে, "ধর্ম" ধারণাটি ("ধর্ম" এর বিপরীতে, "ধর্ম" এর একটি খুব আনুমানিক অনুবাদ) খুব কমই বিদ্যমান ছিল। আম্বেদকরের ধর্মান্তরের সাধারণ খ্রিস্টীয় ধারণার সাথে জড়িত ছিল "যার পূজা করেছেন তা পুড়িয়ে ফেলা, যা পুড়িয়েছেন তার পূজা করা"। ধর্মীয় সম্পৃক্ততার বাক্স-ধরণের ধারণা, যার মধ্যে একটি পরিচয় প্রত্যাখ্যান করে অন্য পরিচয় গ্রহণ করা মৌলিকভাবে অ-হিন্দু। অন্যান্য দেশেও, বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশের জন্য দাও ধর্ম, শিন্তো বা অন্য কোনও ঐতিহ্যের আনুষ্ঠানিক ত্যাগের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং, যখন আম্বেদকর এবং তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুসারী (বেশিরভাগই তাঁর প্রাক্তন অস্পৃশ্য মহার বর্ণের) বৌদ্ধ ধর্মে "ধর্মান্তরিত" হয়েছিলেন, তখন বেশিরভাগ হিন্দু এটিকে কেবল একটি নির্দিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ে প্রবেশ হিসাবে দেখেছিলেন। ভিডি সাভারকর যেমন মন্তব্য করেছিলেন,

আম্বেদকরের "ধর্মান্তর" ছিল হিন্দু ধর্মে একটি নিশ্চিত ঝাঁপ।

বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক ধর্ম হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল কারণ ভ্রমণকারী এবং তারপর পণ্ডিতরা প্রথমে ভারতের বাইরে এটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। যখন এর হিন্দু শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, তখন এটি নিজস্ব জীবনযাপন শুরু করেছিল। তবুও ভারতে, এটি অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির বেশি ছিল না, যদিও সংখ্যার দিক থেকে এটি সবচেয়ে সফল ছিল।

পরিশেষে, বৌদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী বিতর্ক প্রাচীন হিন্দু সমাজের উপর সমসাময়িক হিন্দু বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে অঐতিহাসিক। দুর্ভাগ্যবশত, এটি অনেক হিন্দু কর্মীদের বিতর্কের জন্যও প্রযোজ্য। শাস্ত্রীয় রীতিনীতিগুলি পরম, যখন বাস্তবে ইতিহাস জুড়ে পরিবর্তিত হচ্ছিল। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, হিন্দুধর্মের ভক্তিমূলক ঈশ্বরবাদী রূপগুলি, যা এখন দীর্ঘকাল ধরে প্রধান, প্রাচীন হিন্দুধর্মের উপর প্রক্ষেপিত হয়েছে যার divine ঐশ্বরিক ধারণার বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র ধারণা ছিল, যার মধ্যে নাস্তিকতাও রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে অ-হিন্দুদের "নাস্তিক" বলে নিন্দা করা সাধারণ, যেন কোনও নাস্তিক হিন্দু ছিল না। "নাস্তিক" বিভাগে স্বাভাবিকভাবেই বৌদ্ধরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যারা সেখান থেকে একটি পৃথক অ-হিন্দু পরিচয় বের করতে পারে। এইভাবে, সংকীর্ণমনা হিন্দুরা নিজেরাই অ-ঐতিহাসিক নব্য-বৌদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদকে শক্তিশালী করে। – কোয়েনরাড এলস্টের ব্লগ , ২৬ অক্টোবর ২০১৩

» ডঃ কোয়েনরাড এলস্ট ক্যাথোলিয়েক ইউনিভার্সিটি লিউভেন থেকে পড়াশোনা করেছেন, সাইকোলজি, ইন্দোলজি এবং দর্শনে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পর তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপর ডক্টরেটের জন্য মূল ফিল্ডওয়ার্ক করেন, যা তিনি ১৯৯৮ সালে ম্যাগনা কাম লর্ড অর্জন করেন। একজন স্বাধীন গবেষক হিসেবে তিনি ইসলাম, বহুসংস্কৃতিবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ইন্দো-ইউরোপীয়তার শিকড়, অযোধ্যা মন্দির/মসজিদ বিরোধ এবং মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকারের মতো উত্তপ্ত বিষয়গুলির উপর তার গবেষণার মাধ্যমে খ্যাতি এবং বৈষম্য অর্জন করেছেন। তিনি ধর্ম ও রাজনীতির আন্তঃসংযোগ, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিশ্বতত্ত্ব, বৌদ্ধধর্মের অন্ধকার দিক, হিন্দুধর্মের পুনর্গঠন, ভারতীয় ও চীনা দর্শনের প্রযুক্তিগত বিষয়, বিভিন্ন ভাষা নীতি বিষয়, মাওবাদ, রক্ষণশীলতায় কনফুসিয়াসের পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাসঙ্গিকতা, বিশ্ব সভ্যতার সংহতকরণের উপর ক্রমবর্ধমান এশীয় স্ট্যাম্প, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, হুমকির সম্মুখীন স্বাধীনতার প্রতিরক্ষা এবং বেলজিয়ামের প্রশ্ন সম্পর্কেও প্রকাশ করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে, তিনি মানবিক সহানুভূতিকে বাস্তব সংশয়বাদের সাথে একত্রিত করেন।

https://bharatabharati.in/2013/10/27/buddha-was-every-inch-a-hindu-a-reply-to-those-who-think-gautama-rejected-hinduism-koenraad-elst/ সংগ্রহের তারিখ - ০৪/১০/২০২৫

(মূল প্রবন্ধ দুটি ইংরেজিতে ছিল। গুগুলের সাহায্যে অনুবাদ করে এখানে দেওয়া হয়েছ। অনেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনে করেন তারা বৌদ্ধ, তারা হিন্দু না; তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য এই প্রবন্ধ এখানে দেওয়া হয়েছে। কিছু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের এতটাই অধপতন হয়েছে যে তারা ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না। বিদেশীরা ভারতীয় সনাতন হিন্দু ধর্মকে ইতিবাচক দিক দিয়ে বিচার করছেন অথচ কিছু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নিজেদের বৌদ্ধ ভেবে হিন্দু ধর্মের ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করছেন। তারা নিজেদের আবার আম্বেদকরবাদীও ভাবেন। অথচ ড. আম্বেদকরের বুদ্ধিস্ট জীবন তিন মাসেরও কম ছিল। তিনি ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ঐ একই বছরের ৬ই ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। অর্থাৎ সারাজীবন তিনি হিন্দু হিসাবেই কর্ম করেন)

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ মেনে চলুন

1. অনুপ্রবেশকারীদের কাছে জমি বিক্রি করবেন না। অনুপ্রবেশে মদত দেওয়া হবে।
2. নিয়মিত গীতা পাঠ করুন - এই গ্রন্থ ক্ষত্রিয়দের কথোপকথন।
3. তিলক লাগিয়ে বাইরে বের হবেন, 'পৌণ্ড্র' কথার অর্থ তিলক এবং এটি ক্ষত্রিয় আচার।
4. ক্ষত্রিয় আচার রপ্ত করতে নিয়মিত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করুন।
5. বিভিন্ন NARRATIVE ও অপপ্রচার সম্পর্কে সজাগ থাকুন।
6. ভোট চাইতে এলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক প্রশ্ন করুন। নমশূদ্ররা, রাজবংশীরা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে আমরা কবে পাবো ?
7. যিনি বলবেন হিন্দু মুসলিম করবেন না - তাকে বলুন দেশ কেন ভাগ হয়েছিল ?
8. ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হলে ভারত কেন হিন্দু রাষ্ট্র নয় ? প্রশ্ন করুন।
9. মুসলিমরা মুসলিমদের পক্ষে কথা বললে দোষ নেই, খৃষ্টানরা খৃষ্টানদের হয়ে কথা বললে দোষ নেই, হিন্দুরা হিন্দুর পক্ষ নিয়ে কথা বললে সাম্প্রদায়িক বলা হচ্ছে। যারা বলছে তাদেরকে চিহ্নিত করুন ও তাদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দূরে থাকুন।
10. অজুহাত দেওয়া থেকে দূরে থাকুন, সাংগঠনিক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ***

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী

পতিব্রতা আদর্শ: ভারতীয় নারীর শক্তি, নিষ্ঠা ও মহত্ত্বের চিরন্তন প্রতীক

- শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল

ভারতীয় সনাতন ধর্মে নারীর জীবন এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে **'পতিব্রতা ধর্ম'** প্রতিষ্ঠিত। শব্দটির মূল তাৎপর্যেই এর পবিত্রতা নিহিত: 'পতি' (স্বামী) এবং 'ব্রত' (সংকল্প বা ব্রত) । পতিব্রতা হলেন সেই নারী যিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁর স্বামী এবং বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে একনিষ্ঠ আনুগত্য ও সেবা বজায় রাখার সংকল্প গ্রহণ করেন । এই আদর্শ কেবল গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি স্বামীর প্রতি ঈশ্বরতুল্য ভক্তি ও পূজার ভাব । ধর্মশাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে, একজন আদর্শ পতিব্রতা নারী তাঁর স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করবেন, স্বামী অন্ধ, অসুস্থ, দরিদ্র বা অন্য যেকোনো অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁর নিষ্ঠায় কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না । এই অবিচল ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় নারীর সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি (*তপস*) এবং মহত্ত্ব। প্রাচীনকালে এমনও বলা হয়েছে, যে নারী তাঁর স্বামীকে ছাড়া অন্য কোনো দেবতাকে দেবতা হিসেবে স্বীকার করেন না, তিনিই প্রকৃত পতিব্রতা ।

আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব: ইতিহাসে পতিব্রতার জয়

সনাতন সাহিত্যের মূল ভিত্তিগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে নারী চরিত্রগুলি তাঁদের পতিব্রতা ধর্মকে জীবনের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন, কেবল তাঁরাই ইতিহাসের কালজয়ী পাতায় অমর স্থান লাভ করেছেন। সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, অনসূয়া, দময়ন্তী এবং রুক্মিণীর মতো মহীয়সী নারীরাই ঐতিহ্যবাহী আদর্শ নারী হিসেবে স্মরণীয় । এই আদর্শের মাধ্যমেই নারী লাভ করেন আত্মসংযম, পবিত্রতা (*সত্ত্ব*), সাহস ও সেই নৈতিক কর্তৃত্ব যা তাঁকে পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার শক্তি দেয়।

বৈদিক ও উপনিষদীয় সমাজে নারীর মহান ব্রত

বৈদিক যুগ থেকেই হিন্দু সমাজে নারীর কর্তব্যের দুটি মহান পথ বিদ্যমান ছিল:

১. **সদ্যোবাহা (পতিব্রতা):** যাঁরা অল্প বয়সে বিবাহ করে গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত হন এবং পতিব্রতা ধর্মকে সর্বোচ্চ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন।

২. **ব্রহ্মবাদিনী:** যাঁরা অবিবাহিত থেকে জ্ঞান অর্জন ও আধ্যাত্মিক সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন ।

উপনিষদীয় সাহিত্যে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মতো চরিত্ররা কেবল ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন না, বরং

তাঁরা তাঁদের অসামান্য মেধা, আত্মবিশ্বাস এবং নির্ভীকতার প্রতীক । বিদেহরাজ জনকের রাজসভায় গার্গী ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করার জন্য উঠে দাঁড়ান এবং নিজের ধী-শক্তির ওপর অসাধারণ বিশ্বাস দেখান । এই উদাহরণ প্রমাণ করে যে সনাতন ধর্মে নারী জ্ঞানচর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সর্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করতে পারতেন, যা পতিব্রতা আদর্শের আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে।

মহাকাব্যে পতিব্রতা: কর্তব্য ও ত্যাগের সর্বোচ্চ উদাহরণ

মহাকাব্যের যুগে পতিব্রতা আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তগুলি স্থাপিত হয়, যা নারীর অলৌকিক শক্তি ও দৃঢ়তার প্রমাণ বহন করে।

ক. সীতা দেবী: অবিচল ভক্তি ও নিঃশর্ত ত্যাগ

রামায়ণের সীতা দেবী ভারতীয় সাহিত্যের সবচেয়ে কর্তব্যপরায়ণ ও আদর্শ নারী চরিত্র। তিনি পতিব্রতা ধর্মের মূর্ত প্রতীক । রাম অযোধ্যার রাজকীয় সুখ ত্যাগ করে বনবাসে গেলে, সীতা নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার কথা না ভেবে নিঃশর্ত ভক্তি এবং কর্তব্যবোধে স্বামীর সঙ্গে বনবাসে যান এবং সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন ।

খ. সাবিত্রী: সংকল্পের শক্তি ও নিয়তির উপর জয়

মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত রাজকন্যা সাবিত্রীর উপাখ্যান পতিব্রতা ব্রতের অলৌকিক শক্তির সর্বোত্তম প্রমাণ । যখন দেবর্ষি নারদ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে তাঁর নির্বাচিত স্বামী সত্যবান মাত্র এক বছর পরই মারা যাবেন, তখন সাবিত্রী অটল থাকেন । বিবাহের পর, স্বামীর আয়ু শেষ হওয়ার ঠিক আগে তিনি ত্রিরাত্রি ব্রত পালন করেন। তাঁর দৃঢ় সংকল্প, সাহস এবং ব্রতের মাধ্যমে অর্জিত *তপস* এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, তিনি স্বয়ং মৃত্যু দেবতা যমরাজের পিছু ধাওয়া করে, ধর্ম ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তাঁর স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন । যমরাজ সাবিত্রীর ব্রতকে 'মৃত্যুর নিয়তির চেয়েও উচ্চতর' বলে স্বীকার করেন ।

এই ব্রত, যা ‘বট সাবিত্রী ব্রত’ নামে পরিচিত, আজও বিবাহিত মহিলারা স্বামীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের জন্য পালন করেন, যা নারীর শক্তি, সাহস, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার প্রতীক ।

গ. দময়ন্তী: প্রতিকূলতার মুখে অবিচলতা

নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে, রাজা নলকে হারানোর পর দময়ন্তী তাঁর পতিব্রতা ধর্ম রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন । তাঁর ব্রতের প্রভাবেই তিনি যারা তাঁকে অপমান করতে চেয়েছিল, তাদের অভিশাপ দিতে সক্ষম হন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে পতিব্রতা নারী কেবল অনুগত নন, বরং তিনি নৈতিক *শক্তি*

লাভ করেন যা তাঁর স্বামীর ভাগ্যকে সুরক্ষিত করে।

পঞ্চকন্যা: পবিত্রতার ব্যতিক্রমী মহিমা

হিন্দু পুরাণে প্রতিদিন যাঁদের স্মরণ করা হয়, সেই 'পঞ্চকন্যা' (অহল্যা, দ্রৌপদী, সীতা, তারা এবং মন্দোদরী) এই আদর্শের একটি ব্যাপক দিক তুলে ধরেন । তাঁদের নাম স্মরণ করলে মহাপাপ দূর হয় বলে মনে করা হয় । এই পঞ্চকন্যার মহত্ত্ব নিহিত ছিল তাঁদের চরম প্রতিকূলতা বা নৈতিক জটিলতার মুখেও ধর্মের প্রতি তাঁদের অবিচল সংকল্পে, যা প্রথাগত সংজ্ঞার বাইরে গিয়েও পতিব্রতা আদর্শের গভীরতা প্রমাণ করে।

ভক্তি আন্দোলন ও আধ্যাত্মিক পতিব্রতা: পতি থেকে পরমাত্মা

দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতকে ভক্তি আন্দোলনের উত্থান পতিব্রতা আদর্শকে এক নতুন আধ্যাত্মিক উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। এই যুগে নারীরা তাঁদের জাগতিক জীবনের *পতিকে* উপেক্ষা না করে বা ত্যাগ না করে সরাসরি ঈশ্বরকে (*পরমাত্মা*) তাঁদের একমাত্র *স্বামী* হিসেবে গ্রহণ করেন।

মীরাবাঈয়ের মতো ভক্ত-কবিরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্বামী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং পার্থিব সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চতর আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জন করেন। সখুবাই, পাণ্ডুরঙ্গা বিট্ঠলের প্রতি গভীর নিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন এবং এই পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তিনি শক্তি লাভ করেন। এই মহীয়সী নারীরা *সতী* (যিনি *সৎ* বা *পরমাত্মার* পথে উৎসর্গীকৃত) হিসেবে সম্মানিত হন, যা দেখায় যে পতিব্রতা ব্রত একটি পারিবারিক কর্তব্য থেকে ব্যক্তিগত মুক্তির পথেও প্রসারিত হতে পারে ।

আধুনিক জীবনে পতিব্রতা আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও দাম্পত্যের স্থায়িত্ব

সনাতন হিন্দু বিবাহের মূলমন্ত্রেই দাম্পত্যের স্থিতিশীলতার ভিত্তি প্রোথিত রয়েছে: **'যদেতং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব' (তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হোক, আর আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হোক)।** এই মন্ত্রটি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সততা, বিশ্বাস ও সম্মানকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। পতিব্রতা আদর্শ এই ভিত্তিকেই মজবুত করে—এটি বিশ্বাস, ত্যাগ, এবং একাত্মতার মাধ্যমে বিবাহকে একটি পবিত্র বন্ধনে পরিণত করে।

ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় জীবনে বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল একটি বিরল ঘটনা। এর কারণ হলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে পতিব্রতা আদর্শ তা দাম্পত্যকে দীর্ঘস্থায়ী এবং সুরক্ষিত করে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এই পবিত্র সংকল্পই ছিল পারিবারিক সুখ ও সামাজিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি।

আদর্শচ্যুতি ও বর্তমান সমাজের চ্যালেঞ্জ

বর্তমান সমাজে আধুনিকতা এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে যখন ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ এবং কঠোর সংকল্পের অভাব দেখা যাচ্ছে, তখন দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতা কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, আধুনিকীকরণ, শহুরে জীবনের প্রভাব, উচ্চ শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কারণে দম্পতিদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহ কমছে। এর ফলে পারস্পরিক মতপার্থক্য এবং দাম্পত্যে অসঙ্গতি বাড়ছে, যা বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ব্যক্তি-কল্যাণকে দাম্পত্য বন্ধন টিকিয়ে রাখার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার প্রবণতা বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা বিশেষ করে নারীদের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা কমাতে এবং পরিবারের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে পতিব্রতা আদর্শের মতো সেই চিরায়ত মূল্যবোধগুলির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন, যা ত্যাগ, একনিষ্ঠতা এবং অপরিসীম ভালোবাসার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে অমরত্ব দেয়।

ইতিহাস সাক্ষী, পতিব্রতা নারীর আদর্শ ত্যাগ ও ব্রত পালনের মাধ্যমে কেবল স্বামীর মঙ্গলই নয়, বরং সমগ্র পরিবারের এবং সমাজের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে। সীতা, সাবিত্রী, রুক্মিণীর মতো মহীয়সী নারীর জীবন প্রমাণ করে যে, এই আদর্শ কেবল বশ্যতা নয়, এটি হলো নারীত্বের সেই সর্বোচ্চ শক্তি যা পরিবারকে রক্ষা করতে পারে এবং কঠিনতম পরিস্থিতিতেও নৈতিকতার আলো জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম।

পরিশেষে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি, **পতিব্রতা আদর্শ ভারতীয় সমাজে নারীর শক্তি, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার এক চিরন্তন প্রতীক।** বৈদিক জ্ঞানের পথ থেকে শুরু করে মহাকাব্যের অলৌকিক শক্তি অর্জন, কিংবা ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন—প্রতিটি যুগেই এই আদর্শ নারীর মহত্ত্বকে নতুন উচ্চতা দিয়েছে। আজকের সমাজে যখন পারিবারিক বন্ধনগুলি শিথিল হচ্ছে, তখন পতিব্রতা আদর্শের মূল শিক্ষা: নিঃশর্ত প্রেম, কর্তব্যবোধ, এবং সংকল্পের শক্তি — এই মূল্যবোধগুলিই পারে দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা ও স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করে একটি সুখী এবং স্থিতিশীল সমাজ গঠন করতে। তাই এই সময়ের সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের কাছে আমার আবেদন - আপনারা পতিব্রতা নারীদের জীবনী পাঠ করে পতিব্রতা আদর্শ অনুশীলন করুন এবং পরিবার ও সমাজকে মজবুত করুন।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

কবিতা

আর্য-ক্ষেত্রের আলো: গৌতম বুদ্ধ ও সনাতন পরম্পরা

যে ভূমি দিয়েছে জ্ঞান, উপনিষদের গভীরতা,

ক্ষত্রিয়-কুলভূষণ জন্ম সেথা পায়— এই ভারতের কথা ।

শাক্যবংশে রাজপুত্র, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ,

সনাতনের পথ নিলো— ত্যাগ নহে বিনাশী ।

ধ্যান, যোগ, তপস্যা— কোনো নতুন পথ নয়,

মুনি, যতি, শ্রমণের সেই প্রাচীন সংশয় ।

আশ্রমের আদর্শ সে তো, মোক্ষই যার লক্ষ্য ,

নির্বাণ আর মোক্ষ, তারা এক পথের সাক্ষ্য ।

সংসার-চক্রের দুঃখ, কর্মফলের জানা—

আদি ভারতীয় মূলনীতি, নয় কোনো নতুন ভানা।

অষ্টাঙ্গিক আর্য মার্গ, সে তো আটটি ধাপের খেলা ,

পতঞ্জলির যোগসূত্রের সঙ্গে তার একই সুরের ভেলা ।

ব্রাহ্মণেরে নয়, সে তো ভেদাভেদকে করেছে আঘাত ,

অহিংসার বাণী তার, নৈতিকতার শুদ্ধ প্রপাত ।

ছিল যজ্ঞে পশু বলি— তাকে বন্ধ করার হেতু ,

বৌদ্ধ ধর্ম সেতো হিন্দু ধর্মেরই শুদ্ধ সেতু।

দেবতার স্থান তার, মহাজাগতিক বিধান ,

ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের নামও আদি শাস্ত্রে বিদ্যমান।

পালি ভাষা সংস্কৃতের সে তো সহোদর ,

একই আর্য-চিহ্ন স্বস্তিকাও করে পরোক্ষ নির্ভর ।

স্বামী বিবেকানন্দ কহে— এ তো হৃদয়ের পূর্ণতা ,

বেদান্তের মস্তিস্ক আর বুদ্ধ উদারতা ।

বিষ্ণুর নবম অবতার, পুরাণ দেয় পরিচয় ,

ধর্মের সংস্কারক তিনি— এ ঘোষণা মোদের রয়।

ড. রাধাকৃষ্ণন কহে— হিন্দু হয়েই জন্ম, মৃত্যু তাঁর ,

এই ভূমিপুত্র তিনি, ভাঙেনি কোনো দেওয়াল-বার।

গৌতম বুদ্ধ হিন্দু ছিলেন— এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করি,

বৌদ্ধ ধর্ম সনাতনেরই আত্মার প্রতিচ্ছবি।

* * * * *

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়: গৌরবের জয়গান

পুণ্ড্র-বর্দ্ধন নাম, প্রাচীন জনপদ, সেথায় যাঁদের প্রথম পদার্পণ, বঙ্গের ইতিহাসে অক্ষয় যাঁদের স্থান, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়! জাগো, কর উচ্চারণ।

বক্ষে ধরে ক্ষত্রিয়ত্বের দৃঢ় পরিচয়, যাঁদের জীবন গড়া সাহস আর ধৈর্যে। মাটি ও মানুষের প্রতি অটুট ছিল টান, কঠোর পরিশ্রমে গড়েছেন স্বাভিমান।

দীর্ঘ সংগ্রামের পথে, এসেছেন এগিয়ে, দাবি করেছেন সম্মান, মাথা উঁচু করে। শিক্ষার আলোয় দূর করেছেন অন্ধকার, উন্নয়নের মন্ত্রে ভেঙেছেন যত সংস্কার।

নদী-মাতৃক বাংলায় ছিল তাঁদের বসতি, কৃষি আর নৌকার কারিগর—অদম্য গতি। প্রাচীন জনজাতির ঐতিহ্যবাহী ধারা, এঁকেছেন জীবনে এক নতুন রূপরেখা।

দেশপ্রেম আর আত্মত্যাগে ছিলেন অগ্রগামী, স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁদের পথ-নির্দেশ মানি। ঐতিহ্যেরে করেন রক্ষা, সংস্কৃতিতে সদা মগ্ন, সমাজে তাঁরা উজ্জ্বল, হন সবসময় অগ্রগণ্য।

ভেদাভেদ দূরে থাক, একতার হোক জয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ এগিয়ে চলুক নির্ভয়। গৌরবের এই ধারা হোক চির বহমান, পুণ্ড্রভূমির ঐতিহ্য হোক উজ্জ্বল, দীপ্তিমান। ***

পৌণ্ড্র-শৌর্য

পুণ্ড্রভূমির গৌরব যারা, আদিম বঙ্গের সন্তান, মাটি যাঁদের প্রথম ভিত্তি, ইতিহাসের প্রমাণ। নদী-জলে যাঁদের জীবন, খেটে খাওয়া যাঁদের দিন, বক্ষে ধরেছেন সাহস, হননি কখনো ক্ষীণ।

ক্ষেত্রের কাজে ক্লান্তিহীন, হাতে থাকে লাঙল-জোয়াল, তবুও ক্ষত্রিয় রক্তে, শৌর্য-বীর্য চিরকাল। অন্ধকারে জ্বালিয়ে আলো, এনেছেন স্ব-অধিকার, আত্মমর্যাদার সংগ্রাম, পথ দেখায় বারবার।

শিক্ষা আর জ্ঞানের আলোয়, দূরে সরান অন্ধকার, নতুন দিনের স্বপ্ন এঁকে, ভাঙেন যত সংস্কার। ঐতিহ্যেরে করেন রক্ষা, সংস্কৃতিতে থাকেন মগ্ন, দেশ ও দশের সেবায়, হন সবসময় অগ্রগণ্য।

ভেঙে গেছে যত ভেদাভেদ, একতা তাঁদের মূল, আগামী প্রজন্ম গড়ছে মাথা, ভুলে পুরোনো ভুল। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বীর, বাংলা মায়ের বুকে তাঁরা, এক উজ্জ্বল প্রদীপ। ***

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়: আর্য-তেজ

পুণ্ড্র-বর্দ্ধন রাজ্য, প্রাচীন মহিমা, যেথা আর্য সভ্যতার প্রথম সে সীমা। উন্নত শির ধরি' সেই বংশধারা, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়! বীর, ইতিহাসে যারা।

কপিল মুনির জ্ঞানে ছিল যাঁর দীক্ষা, পুণ্য-সাগরে যাঁর জীবনের শিক্ষা। পুণ্ড্র জাতির সেই আদিম সত্তা, মহাকাব্যে যাঁর ক্ষত্রিয়তা লব্ধ।

শস্য-শ্যামল ভূমি, নদী-বিধৌত তট, বীরত্ব আর তেজে পূরণ করেছেন নাট। আর্য-তেজস্বী, জ্ঞান আর কর্মে নিপুণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এঁরা সর্বদা আগুন।

রক্তে মিশে আছে তাঁদের সেই দীপ্তি, সংগ্রামে অবিচল, ছিল না কোনো ক্লান্তি। রাজদণ্ড হাতে নিয়ে করতেন শাসন, বক্ষে ছিল প্রজা-হিতের সুশাসন।

যুগে যুগে এসেছেন, লয়ে নতুন রূপ, তবুও হারাননি শৌর্য, তেজস্বী স্বরূপ। আত্মমর্যাদার

পথে করেন যে পণ, গৌরবের শিখা সদা প্রোজ্জ্বল এখন।

পূর্বের আর্যভূমি, ঐতিহ্যের ধারক, এই জাতি চিরকাল সূর্যের সে চারণ। আসুক নতুন প্রভা, হোক জয় জয়কার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে আর্য-গৌরব আবার। ***

জাগো পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়

জাগো পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, জাগো বীরের সন্তান, পুণ্ড্রভূমির গৌরব, তোমরাই মহীয়ান। ইতিহাসের পাতায় গাঁথা তোমাদের নাম, ধুলোয় নয়, রাখো উচ্চ তোমাদের স্থান।

যে জাতি লড়েছে চির স্ব-অধিকারের তরে, যে জাতি দাঁড়ালো শির উন্নত করে। ক্ষত্রিয় তেজ আর শ্রম যাদের নিত্য সাথী, জাগো সেই জাতি, হাতে নিয়ে নবপ্রভাতী।

ভেঙে দাও যত বন্ধন, মুছে ফেলো গ্লানি, শিক্ষা-দীক্ষার আলোয় গড়ো নতুন কাহিনীর। ঐতিহ্যেরে কর রক্ষা, সংহতি হোক মূল, অন্ধকার ভেদ করে ফোটুক জ্ঞানের ফুল।

মাটির গন্ধ আর নদীর কলতান, তোমাদের জীবনে আনে নতুন আহ্বান। সাহস আর সংকল্পে হও আরও বলীয়ান, তোমাদের হাতেই আজ জাতির সম্মান।

জাগো পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, সময় যে বহিয়া যায়, এক হয়ে গড়ো সমাজ, নবোদ্যমে পূর্ণতায়। অপেক্ষা নয় আর, কাজ কর অবিরাম, গৌরবের পথে হাঁটো, মুছে যাক অবিচার।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাগাথা: ঐতিহ্য ও মর্যাদার জয়ধ্বনি

ভারত-ভূমের পূর্ব প্রান্তে, জাহ্নবী যেথা মেশে সাগর-জলে,

সেই পুণ্যভূমি জুড়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ গর্বে মাথা তোলে।

আমরা প্রাচীন, আমরা শাশ্বত, নয় কোনো ক্ষণিকের ধারা, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, মহাকালের প্রহরে, আমাদের গৌরব-ইশারা। মহর্ষি কপিল মুনি- সেই জ্ঞান-প্রভাকর, পূর্বপুরুষের নাম,

তাঁরই সাংখ্য দর্শনের প্রজ্ঞা, আমাদের জীবনের অভিরাম।

মনুর বংশের কূল-দীপ, চন্দ্রবংশের পবিত্রতা রহে,

দেবাহুতির পুত্রের সাথে, আমাদের রক্ত-যোগ সে তো কহে।

অত্রি মুনি, চন্দ্র দেব, সেই বংশের বিস্তার,

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বীর জাতি, আমরা করি অহংকার।

নহে শুধু পৌরাণিক সূত্র, ইতিহাসে আমাদের বাস,

পুণ্ড্রবর্ধন সেই জনপদ, যেখানে রটেছে সুবাস।

বীর পৌণ্ড্রক বাসুদেব- আমাদেরই সেই রাজা,

রাজদণ্ড ধরে শাসন করেছি, দিয়েছি প্রজার সাজা।

রাজপদ ত্যাজি তাঁরই সহোদর, কপিল নিলেন বৈরাগ্য-যোগ, একই বংশে যোদ্ধা ও ঋষি, আমাদের মাঝে সেই সংযোগ। ক্ষমতা আর আধ্যাত্মিকতা, দুই বাহুতেই শক্তি,

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি তাই, করে ধর্ম-পথে ভক্তি।

সাগর-সঙ্গমে কপিল-আশ্রম, আজও তীর্থ-ধাম,

সগর-পুত্রদের মুক্তি দিয়ে, তিনি দিলেন পুণ্য-নাম।

ক্ষত্রিয়ধর্মের ত্রুটি মোচন, পাপক্ষয় করি দান,

সেই আশীর্বাদ ধন্য আমরা, পবিত্র আমাদের প্রাণ।

গঙ্গাসাগর মেলাতে, লক্ষ কোটি লোক আসে,

সেই কপিল-মন্দির রয়েছে, আমাদের এই আশে-পাশে।

ভূমির সাথে হৃদয়ের টান, জন্ম আমাদের এখানে,

আদি বাসিন্দা আমরাই তো, এ কথা সবাই জানে।

আমাদের সংস্কৃতি গভীর, যুদ্ধ ও জ্ঞানের আলোয় গড়া,

অসি-চালনা জানি, আবার সাংখ্য-তত্ত্বেরও পড়া।

পুরুষ আর প্রকৃতির ভেদাভেদ, আমাদের চেতনায় জাগে,
মুক্তিপথের সেই মন্ত্রে, আমরাই থাকি আগে।

অহংকারের বিনাশে, আমরাই তো দেখেছি রাজপদ পতন,

কিন্তু কপিলের বৈরাগ্যে, খুঁজে পেয়েছি নতুন জীবন।

তাই আমরা শুধু যোদ্ধা নই, আমরা স্থিতধী, জ্ঞানী,

অতীতের সেই মহৎ ধারা, আমরাই তো বহনকারী।

বিপন্নতার মাঝেও ছিল, আমাদের দৃঢ় অবস্থান,

ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছি, রক্ষা করেছি আমাদের মান।

এই বঙ্গভূমি, এই সাগর-কূল, এই আকাশ-বাতাস,

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামের সাথে, মিশে আছে আমাদের বিশ্বাস।

উচ্চ আমাদের সামাজিক মর্যাদা, অতীত আমাদের মহান,

আত্মমর্যাদার দীপ্তিতে, আমরা করি জয়গান।

এই বিশ্বাসে বলীয়ান হোক, প্রতিটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রাণ,

আমাদের ঐতিহ্য অক্ষয় হোক, যুগে যুগে হোক মহান।

কপিল-কৃষ্টি: পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মহাগাথা

ভারত-ভূমের ইতিহাসে, এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নাম,
মহর্ষি কপিল মুনি - জ্ঞান, যোগ আর মোক্ষের ধাম।
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ গর্বে, তাঁকেই করি আহ্বান,
পূর্বপুরুষের সুমহান ধারা, তিনি আমাদের মহাপ্রাণ।
স্বয়ম্ভুব মনু হতে উৎপত্তি, এ তো আমাদের বংশের মূল,
কপিল মুনি দৌহিত্র তিনি, চন্দ্রবংশের সেই কূল।
মনু-দৌহিত্রী অনসূয়া, অত্রিপুত্র চন্দ্র যাঁর,
সেই চন্দ্র হতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বংশের বিস্তার।
মহারাজ বলির পুত্র পুণ্ড্র, বীর্যবান ক্ষত্রিয় জাতি,
এই ধারাতেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের পুণ্য-স্মৃতি।
রক্তের যোগ, জ্ঞানের যোগ, বন্ধন তাই নিবিড়,
আমাদের ঐতিহ্যে, কপিল গৌরব চিরস্থির।
পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ভ্রাতা কপিল, এও তো বিশ্বাস রয়,
রাজকীয় ভোগ ছাড়ি মুনি, যোগের পথে নিল লয়।
সাগর-কূল, পুণ্ড্র জনপদ-তাঁরই তপোভূমি,
আমাদের অধ্যুষিত এই ভূমি, তাই মহাগৌরব তুমি।
সগর-পুত্রদের মুক্তিদাতা, তুমিই তো সেই ঋষি,
ধ্বংস নয়, ক্ষত্রিয়ধর্মের শুদ্ধি এনেছিলে নিশি।
আশীর্বাদ-ধন্য এই ভূমি, এই জনপদ তাই ধন্য,
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি বীর, মোক্ষের ধারকও গণ্য।

সাংখ্য দর্শন তোমারই দান, জ্ঞানের গভীর পন্থা,
আমাদের জীবনেও তাই, আধ্যাত্মিকতার মান্যতা।
শুধু যোদ্ধা নই, শাসক নই, মননেও আমরা অগ্রণী,
কপিল মুনির পবিত্র স্পর্শে, আমাদের চেতনা সঙ্গিনী।
গঙ্গাসাগর মহাতীর্থ, মেলা হয় যাঁকে ঘিরে,
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ আজও, সে পুণ্য স্মরণে ফেরে।
আমাদের অধ্যুষিত ভূমিতে, কপিল-মন্দির জাগে,
আদি বাসিন্দা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, প্রাচীনত্বে নাহি ভাঙে

মহর্ষি কপিল মুনি আমাদের, পূর্বপুরুষের সেই নাম,
গৌরবময় অতীত আর, উচ্চ সামাজিক ধাম।
এই বিশ্বাসে বলীয়ান হোক, প্রতিটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রাণ,
আমাদের ঐতিহ্য অক্ষয় হোক, যুগে যুগে হোক খানখান।
মহান ।। জয় কপিল মুনি, জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

(সবগুলো কবিতা এ আই আচার্য কর্তৃক রচিত।)

গল্প

জাগো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

- শ্রীবিষ্ণু পুরকাইত

বহু প্রাচীন জনপদ পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের উপকণ্ঠে, যেখানে কালিন্দী নদী এসে মিশেছে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের আলপথে, সেখানেই ছিল সাহেবখালী-র অবস্থান। এই সাহেবখালী গ্রাম ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের এক বিশাল আবাসস্থল। এখানকার মানুষজন ছিলেন কর্মঠ, মাটির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল নিবিড়—কেউ ছিলেন মৎস্যজীবী, কেউ বা চাষি, আবার কেউ চালাতেন ছোট ব্যবসা। কিন্তু কালের ফেরে এবং সামাজিক বৈষম্যের চাপে তাঁদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছিল। শিক্ষার আলো তখনও সেভাবে পৌঁছায়নি সবার ঘরে, এবং পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্য্যের কথা ভুলে অনেকেই মাথা নিচু করে চলতে শিখেছিলেন।

এই গ্রামেরই এক তরুণ, নাম অমল মণ্ডল। তেইশ বছরের অমল গ্রামের প্রথম স্নাতক। পড়াশোনার জন্য তিনি শহরে গিয়েছিলেন, আর সেখানে গিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের সম্প্রদায়ের অতীত গৌরব আর বর্তমানের দৈন্যদশা। তিনি জানতে পারেন, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা একসময় এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন, তাঁদের ইতিহাস বীরত্ব ও ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। কিন্তু সামাজিক বিভাজন এবং ইতিহাসের বিকৃতি তাঁদেরকে পিছিয়ে দিয়েছে।

অমল শহরে থাকতে থাকতেই তাঁর মধ্যে এক প্রবল আত্মমর্যাদার আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি পণ করেন, সাহেবখালীতে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর সমাজের মানুষকে জাগাবেন, ফিরিয়ে আনবেন তাঁদের হারানো গৌরব।

একদিন সন্ধ্যায়, গ্রামের বটগাছের নিচে যখন প্রবীণরা হুঁকো টানছেন আর তরুণরা অলস গল্পে মেতে আছে, ঠিক তখনই অমল একটি মঞ্চ তৈরি করে হাতে মাইক তুলে নিলেন।

তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল দৃঢ়তা, চোখে ছিল স্বপ্নের আলো। তিনি শুরু করলেন তাঁর ভাষণ:

> "আমার ভাই ও বোনেরা! আপনারা কি জানেন, আপনারা কারা? আপনারা কি ভুলে গেছেন আপনাদের পূর্বপুরুষদের তেজ? আমরা এই পুণ্ড্রভূমির আদি উত্তরাধিকারী! আমাদের রক্তে আর্য-ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব মিশে আছে! আপনারা কেন মাথা নিচু করে চলেন? কেন আপনারা সামান্য বৈষম্য মুখ বুজে সহ্য করেন?"

কথাগুলো যেন গ্রামের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিল। প্রথমে প্রবীণরা বিরক্ত হলেন, কিন্তু অমলের যুক্তিনিষ্ঠ ও আবেগপূর্ণ কথা তাঁদের

মনকে নাড়া দিল। অমল তুলে ধরলেন তাঁদের প্রাচীন ইতিহাস, তাঁদের বীরত্বের কাহিনি, এবং সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে তাঁদের অধিকার পুনরুদ্ধার সম্ভব।

> "আমরা চাষ করি, আমরা মাছ ধরি—এতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আমাদের শিশুরা যেন দিনের আলোয় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য আমাদের প্রতিটি ঘরে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালাতে হবে! আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে! **জাগো পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়!** এই মন্ত্র হোক আমাদের নতুন জীবনের সূচনা।"

অমলের এই বক্তৃতা ছিল যেন এক নবজাগরণের ডাক। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথমে এগিয়ে এলো তরুণ সমাজ। তারা গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপন করল, যেখানে ইতিহাস আর জ্ঞানের বই রাখা হলো। এরপর অমলের নেতৃত্বে গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় চালু হলো, যেখানে দিনের শেষে প্রবীণ ও কর্মব্যস্ত মানুষেরা অক্ষরজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। মহিলারাও পিছিয়ে রইলেন না, তারা ছোট ছোট স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার পথে পা বাড়ালেন।

গ্রামের প্রবীণ পঞ্চায়েত প্রধান, যিনি প্রথমে অমলের কথায় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তিনিও ধীরে ধীরে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন: "অমল, তুমি আমাদের চোখে এক নতুন আলো এনেছ। এতদিন আমরা যা ভুলে ছিলাম, তুমি তা মনে করিয়ে দিলে। আজ থেকে আমরা আর কেবল চাষি বা মৎস্যজীবী নই, আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়—এক গর্বিত জাতি।"

এরপর আর সাহেবখালীকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তারা ঐক্যবদ্ধ হলো, শিক্ষার আলোয় আলোকিত হলো প্রতিটি ঘর। শুধু সাহেবখালী নয়, আশেপাশের অন্যান্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ল অমলের এই জাগরণের বার্তা। তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলো, সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভে এগিয়ে এলো এবং সমাজে নিজেদের স্থান পুনরুদ্ধার করল।

অমলের সেই একটি আহ্বানে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন চেতনা। আর সেই চেতনার মন্ত্র ছিল একটাই: **"জাগো পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়!"** এই মন্ত্র কেবল একটি স্লোগান ছিল না, ছিল নিজেদের ইতিহাসকে সম্মান জানিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার এক অদম্য অঙ্গীকার। ***

উপন্যাস

পথের দিশা

- হরি ওম উপাধ্যায়

১

কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে, দূষণ আর ধোঁয়াশা থেকে কিছুটা দূরে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ‘আদর্শ আবাসন’। এটি কেবল ইট-পাথরের স্তূপ নয়, বরং একবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য এবং আদর্শগত বিভাজনের এক প্রতীকী জনপদ। এখানে বহুতল ভবনগুলির প্রতিটি ফ্ল্যাট যেন এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীপ, তাদের বিলাসবহুল সুইমিং পুলের নীল জল, সুসজ্জিত লবি এবং চব্বিশ ঘণ্টার নৈমিত্তিক নিরাপত্তা এখানকার বাসিন্দাদের ভৌতিক প্রাচুর্যের কথা নীরবে ঘোষণা করে। ফ্ল্যাটগুলোর বারান্দা থেকে দেখা যায়, রাতের অন্ধকারে যখন শহরের আলো নিভে যায়, তখন আবাসনের ভেতরের প্রতিটি ফ্ল্যাটে যেন পশ্চিমা ভোগবাদের এক ঝলমলে আলো জ্বলতে থাকে।

আবাসনটির বাইরের এই নিখুঁত, করপোরেট-সদৃশ চাকচিক্য যতখানি আধুনিকতার বার্তা দেয়, এর অভ্যন্তরে প্রবহমান জীবনধারা ঠিক ততখানিই জটিল ও সংঘাতময়। আবাসনটি এক অদৃশ্য কাঁটাতারের বেড়া দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত—যেখানে ভৌগোলিক দূরত্ব নেই, আছে আদর্শগত দূরত্ব। এক প্রান্তে রয়েছে 'মুক্তমনা' হওয়ার তীব্র তাগিদ, দ্রুতগতির জীবনে পশ্চিমা ধাঁচের চিন্তাভাবনা এবং বিদেশি মতাদর্শের অন্ধ অনুসরণ; অন্যদিকে রয়েছে এই মাটির হাজার বছরের সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি গভীরে প্রোথিত এক নীরব টান।

এই দুই বিপরীতমুখী স্রোত প্রতিনিয়ত আবাসনের বাতাসে এক অস্বস্তিকর চাপা উত্তেজনা জিইয়ে রাখত। এই আদর্শের সংঘাত কেবল উৎসবের সময়ে পূজার প্যান্ডেল তৈরির বিতর্ক বা মিটিংয়ের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না; এটি ঢুকে পড়ত প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তের মধ্যেও—যেমন প্রতিবেশীর দরজার সামনে আঁকা আলপনা দেখে বাঁকা হাসি, বা সন্ধ্যায় ভেসে আসা শাঁখের ধ্বনি শুনে চাপা বিরক্তি। আবাসন জুড়ে এই দ্বৈত জীবনধারা ছিল এক নিয়তি।

২

এই আদর্শগত সংগ্রামের অন্যতম প্রধান ও মুখর চরিত্র হলেন তপন সরকার, যিনি তপনবাবু নামেই পরিচিত। পেশায় ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হলেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় ছিল কট্টর বামপন্থী মতাদর্শের ধারক ও বাহক হিসেবে। তাঁর জীবন ছিল যেন

মার্ক্স, লেনিন এবং মাও-এর তাত্ত্বিক কাঠিন্যে নিশ্ছিদ্রভাবে বাঁধা। তাঁর কাছে ভারতীয় সমাজ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি ছিল এক কথায় 'বুর্জোয়া কুসংস্কার', 'সামন্ততান্ত্রিক শোষণ'-এর হাতিয়ার এবং 'অন্ধকার যুগের অবশিষ্ট'। তিনি যুক্তি দিতেন, ধর্ম মানুষের চেতনাকে ভোঁতা করে দেয় এবং শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না।

এই আদর্শ তিনি কেবল রাজনৈতিক মঞ্চে নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবারেও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতেন। তাঁর ফ্ল্যাটের বসার ঘরে ছিল না কোনো মঙ্গলচিহ্ন বা দেব-দেবীর ছবি; সেখানে শোভা পেত চে-গুয়েভারার বিশাল প্রতিকৃতি ও কার্ল মার্ক্সের আবক্ষ মূর্তি। তিনি তাঁর ফ্ল্যাটের নাম দিয়েছিলেন 'মুক্তধারা'। তিনি ধর্মীয় গান বা ভক্তিগীতি দেখলেই টিভির চ্যানেল বদলে দিতেন। তাঁর মতে, একজন সত্যিকারের 'কমরেড'-এর জীবনে কোনো দ্বিধা বা আপস থাকতে পারে না—ধর্ম হলো সেই আপসেরই নামান্তর। তাঁর জীবন ছিল যেন আদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের এক জীবন্ত দলিল।

৩

তপনবাবুর এই আদর্শগত কাঠিন্যের বিপরীতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সবিতা দেবী। তিনি জন্মসূত্রে ধার্মিক ও ঐতিহ্যপ্রেমী, তাঁর হৃদয়ে ছিল বিশ্বাস ও ভক্তির এক চিরন্তন স্রোত। কিন্তু স্বামীর মতাদর্শের নিরন্তর চাপ তাঁকে একধরনের মানসিক নির্বাসনে ঠেলে দিয়েছিল। বাইরে তিনি স্বামীর মতাদর্শের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার, কখনো কখনো সমর্থন করার অভিনয় করতেন—কিন্তু অন্তরে চলত এক নীরব যুদ্ধ।

স্বামীর কঠোর যুক্তির সামনে তিনি তাঁর আদরের তুলসীতলা, প্রাত্যহিক পূজা ও পারিবারিক রীতিনীতিকে গোপন করতে বাধ্য হতেন। তিনি পূজার সমস্ত সরঞ্জাম আলমারির একেবারে পেছনের তাকে লুকিয়ে রাখতেন; সকালে স্বামীর অফিসে চলে যাওয়ার পর তিনি দ্রুত স্নান সেরে, দরজা বন্ধ করে, নামমাত্র পূজা সেরে নিতেন, যাতে তাঁর ফিরে আসার আগেই পূজার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা যায়। এই গোপনীয়তার জীবন তাঁর হৃদয়ে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত তৈরি করেছিল। তিনি একাধারে স্বামীর প্রতি আনুগত্য এবং নিজের আত্মার বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণায় ভুগতেন।

তাঁদের একমাত্র কন্যা রীতা, সবেমাত্র কলেজে পা দেওয়া এক যুবতী। সে বাবার রাজনৈতিক দৃঢ়তা এবং তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তবে, মায়ের 'অকথিত বেদনা' তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করত। রীতা দেখত, বাবা যখন কোনো ধর্মীয় রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ করে, তখন সবিতা দেবীর মুখটা কেমন শুকনো পাতার মতো ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে অনুভব করত, বাবার আদর্শ যেন মাকে মানুষ হিসেবে নয়, কেবল 'কমরেডের সহধর্মিণী' হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত। রীতা তাই বাবার যুক্তি ও মায়ের অনুভূতির মধ্যে

এক অসহায় টানাপোড়েনে ভুগতে থাকত—জানত না তার নিজস্ব অবস্থান কোথায়।

৪

আবাসনের আরেক প্রান্তে, এই আদর্শিক ঝড়ের মধ্যে এক শান্ত প্রজ্ঞার বাতিঘর হয়ে বিরাজ করতেন প্রফেসর রতন মণ্ডল যিনি রতনবাবু নামেই পরিচিত। ষাটোর্ধ্ব এই প্রবীণ মানুষটি একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক দর্শন বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ছিল শুভ্র কেশ, এক ঋজু ও মার্জিত দেহভঙ্গি এবং চোখে ছিল এক অপ্রতিরোধ্য শান্ত প্রজ্ঞার আলো। তিনি অবসর জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটাতেন আবাসনের নিচতলার 'শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি'-র নির্জন কোণে। সেখানে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেদ, উপনিষদ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গভীরে ডুবে থাকতেন।

বামপন্থী মহল তাঁকে 'পশ্চাৎপদ', 'সনাতনপন্থী' এবং 'অন্ধবিশ্বাসের প্রচারক' বলে মনে করত। কিন্তু আবাসনের সাধারণ মধ্যবিত্ত ও প্রবীণ বাসিন্দারা—যারা নিজেদের রীতিনীতি প্রকাশ করতে ভয় পেত—তাঁকে জ্ঞানের ও স্থিতধীতার উৎস মনে করে শ্রদ্ধা করত। তারা জানত, রতনবাবুর মতো একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ যখন সনাতন দর্শন নিয়ে কথা বলেন, তখন তার গভীরতা কেবল আবেগ বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না, তা যুক্তির কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ।

রতনবাবু বামপন্থীদের স্লোগান ও আদর্শের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাটি খুব ভালো করেই বুঝতে পারতেন। তিনি জানতেন, আবাসনে বামপন্থার নামে যা চলে, তা কেবলই বিদেশি মতাদর্শের অন্ধ অনুকরণ, যার কোনো আত্মিক বা দার্শনিক ভিত্তি নেই। তাদের স্লোগান ছিল জোরালো, কিন্তু জ্ঞানের ভিত্তি ছিল নড়বড়ে। তারা 'শ্রেণি সংগ্রাম' জানত, কিন্তু ভারতীয় দর্শনের 'ধর্ম সংগ্রাম' বা 'কর্ম সংগ্রাম' জানত না।

৫

আদর্শ আবাসনের সমাজ ছিল একটি আদর্শগত পিরামিড-এর মতো, যার একেবারে শীর্ষে ছিল বামপন্থী মতাদর্শের এক ক্ষুদ্র কিন্তু কণ্ঠস্বর-উচ্চ গোষ্ঠী। আবাসনের প্রায় পঁচিশ শতাংশ পরিবার এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। তাদের হাতে ছিল আবাসন কমিটির ক্ষমতা এবং জনমত নিয়ন্ত্রণের কৌশল। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা ছিলেন মধ্যবিত্ত, সাধারণ হিন্দু পরিবার, যারা কেবল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পছন্দ করতেন। তাদের কাছে ধর্ম ছিল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়, যা নিয়ে কোনো রাজনৈতিক কোলাহল তারা চাইতেন না।

এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন তপনবাবু ও তাঁর অনুসারীদের তীব্র সমালোচনার ভয়ে নিজেদের রীতিনীতি প্রকাশ্যে পালন করতে দ্বিধা করতেন। নিজেদের ফ্ল্যাটের ভেতরে তাঁরা হয়তো নিত্যপূজা করতেন, কিন্তু

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেলেই তাঁরা হয়ে উঠতেন 'প্রগতিশীল'। তাঁরা সাবধানে থাকতেন যেন তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান কোনোভাবেই 'বুর্জোয়া কুসংস্কার' বলে বামপন্থীদের সমালোচনার শিকার না হয়। এই ভয়ের আবহে, আদর্শ আবাসনের ভেতরেই তৈরি হয়েছিল এক নীরব, দ্বিচারী জীবনধারা।

৬

এই আদর্শগত সংঘাত সবচেয়ে বেশি মাথাচাড়া দিত যখন দুর্গাপূজা বা সরস্বতী পূজার মতো কোনো ঐতিহ্যবাহী উৎসব আসত। তপনবাবু ও তাঁর অনুসারীদের 'সাংস্কৃতিক মাতব্বরি' তখন শুরু হতো। তারা উৎসবকে রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করার জন্য উঠে-পড়ে লাগত। প্রথমে তারা পূজা কমিটি দখল করত—নির্বাচন বা তর্কের মাধ্যমে নয়, বরং রাজনৈতিক চাপ এবং তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ দিয়ে।

একবার তারা দুর্গাপূজার থিম ঠিক করেছিল 'শ্রেণি বৈষম্য', যেখানে মণ্ডপে দেবী দুর্গা নয়, বরং শ্রমজীবী মানুষের বিশাল প্রতিকৃতি স্থাপন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্রতি বছরই তাদের পছন্দের 'প্রগতিশীল থিম' বা 'সামাজিক বার্তা' চাপানোর চেষ্টা চলত। এই থিমগুলি প্রায়শই ধর্মীয় রীতিনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতো। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করতে চাইলেও তপনবাবুর তীক্ষ্ণ যুক্তির ধার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ভয়ে পিছু হটে যেত।

তাদের মাতব্বরি কেবল থিমে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা পূজার বাজেট নিয়ন্ত্রণ করত, যাতে ধর্মীয় আড়ম্বর কম দেখিয়ে সেই অর্থ 'সামাজিক কাজে' ব্যবহার করা যায়। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ছিল, তারা পূজার মন্ত্রপাঠ বা আচার-অনুষ্ঠানকেও উপহাস করত। তপনবাবু একবার পূজার সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "এই মন্ত্রগুলো হলো পুঁজিবাদের ফাঁদ, যা গরিবদের আরও বেশি অন্ধ করে দেয়।" অথচ, এই মানুষগুলোই নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে ভালো কোনো সুযোগের জন্য গোপনে মন্দিরে মানত করত।

৭

এই দ্বৈততা ছিল তপনবাবুর স্ত্রী সবিতা দেবীর হৃদয়ে এক গভীর আদর্শগত ক্ষতের কারণ। তিনি তাঁর স্বামীর বামপন্থী আদর্শের রাজনৈতিক দিকটি মেনে নিলেও, ধর্মের প্রতি তাঁর স্বামীর চূড়ান্ত অবজ্ঞা সবিতা দেবীকে আহত করত। তিনি ভাবতেন, এই মানুষগুলো ঘরের দরজা বন্ধ করে হয়তো দেবী বা ঠাকুরকে স্মরণ করে, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে; কিন্তু বাইরের জগতে তারা ধর্মের প্রতি চূড়ান্ত অবজ্ঞা দেখায়। এই রাজনৈতিক ভণ্ডামি তাঁকে যন্ত্রণা দিত।

তিনি নিজের স্বামীর মধ্যেই এই বিশাল বৈপরীত্য দেখতেন। তপনবাবু তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে যতটা খাঁটি, ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ঠিক ততটাই ভঙ্গুর—অথবা তিনি বিশ্বাসকে পুরোপুরি অস্বীকার করতেন। সবিতা অনুভব করতেন, তপনবাবু ও তাঁর অনুসারীদের এই রাজনৈতিক প্রদর্শনী তাঁকে এবং তাঁর মতো বহু সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে একাকী ও বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল।

এই আবাসন যেন একটি আদর্শগত আবর্তে আটকে ছিল—যা কেবল ভোগবাদ ও রাজনৈতিক ডামাডোলে ঘুরছিল, কিন্তু এর কোনো আত্মিক কেন্দ্র ছিল না। সবিতা জানতেন, এই আবর্ত থেকে মুক্তির পথ আপাতত দৃষ্টিতে অসম্ভব। এই আবর্তের গতিকে পরিবর্তন করার মতো কোনো শক্তি বা সাহস সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল না।

তবে, সবিতা দেবী জানতেন না, ভাগ্যের এক চরম আঘাত সেই সুযোগটি এনে দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল। সেই আঘাত আসবে অপ্রত্যাশিতভাবে, আর সেই আঘাতের ফলেই আদর্শের দেওয়াল ভেঙে আবাসনের মানুষজন সনাতন পথের দিশা খুঁজে পাবে।

৮

এক হিমেল শীতকালের সকালে, যখন কুয়াশার চাদর আদর্শ আবাসনের বিলাসবহুল বহুতলগুলোকে জড়িয়ে ছিল, ঠিক তখনই এক অপ্রত্যাশিত ও গভীর শোকের ছায়া নেমে এল। ভোররাতে ফ্ল্যাটের ভেতরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তপনবাবু। ঘড়িতে তখন সবে পাঁচটা। ফ্ল্যাটের নিরাপত্তা কর্মীরা যখন খবরটা আবাসনের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল, তা বিদ্যুৎ-বেগে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষজন disbelief এবং shock-এ কথা বলা বন্ধ করে দিল।

যে মানুষটি গতকাল সন্ধ্যায়ও আবাসনের কফি শপে বসে, টেবিলে সজোরে আঘাত করে, মার্ক্সবাদ ও শ্রেণি সংগ্রাম নিয়ে গরম তর্ক জুড়েছিলেন, আজ তিনি নিথর। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সবাইকে স্তব্ধ করে দিলেও, এর পরবর্তী আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে আবাসন জুড়ে দ্রুত চাপা গুঞ্জন শুরু হলো। এই গুঞ্জন ছিল ভয় এবং বিশ্বাসের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

আবাসনের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো, যারা এতকাল তপনবাবুর ভয়ে নিজেদের ধর্মীয় আবেগ প্রকাশ করতে পারত না, তারা এখন গোপনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল। তারা নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজা সামান্য ফাঁক করে, ফিসফিস করে কথা বলছিল। তাদের সবারই ইচ্ছা ছিল—স্বাভাবিক ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে তপনবাবুর শেষকৃত্য হোক। কারণ, তাদের মতে, জীবনজুড়ে তিনি যে আদর্শই প্রচার করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনি এই মাটির সন্তান। এই মাটির সংস্কার মেনেই তাঁর আত্মা শান্তি পাক। "ধর্ম যাঁর যাঁর ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু

মৃত্যু তো সবার জন্যই এক,"—এমন কথা অনেকেই বলছিল।

কিন্তু তাদের এই শুভ ইচ্ছার পথে কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে ছিল তপনবাবুর জীবদ্দশায় বারবার করা ঘোষণা। সেই 'আদর্শের দেওয়াল' ছিল অত্যন্ত মজবুত। তাঁর কট্টর আদর্শবাদী বন্ধুরা সেই দেওয়ালকে আরও উঁচু করে তোলার জন্য প্রস্তুত ছিল। সাধারণ মানুষের দ্বিধা ছিল—তপনবাবুর শেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানাবে, নাকি নিজেদের সনাতন কর্তব্য পালন করবে?

৯

সবিতা দেবী তখন যেন এক অসার মূর্তির মতো ফ্ল্যাটের ভেতরের ঘরে বসেছিলেন। তাঁর সাদা শাড়ি এবং শূন্য দৃষ্টি যেন শোকের চেয়েও গভীর কোনো যন্ত্রণার প্রতীক। স্বামীর মৃত্যুতে শোক ছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল এক ভয়ঙ্কর মানসিক অস্থিরতা। তিনি জানতেন, তাঁর স্বামী তাঁর মৃত্যুকেও ব্যবহার করবেন তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য। তপনবাবু তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত বার্তা দিতে চেয়েছিলেন।

তপনবাবু বারবার জোর দিয়ে বলে গেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যেন কোনো ধর্মীয় 'আড়ম্বর' বা 'কুসংস্কার' না করা হয়। শ্রাদ্ধকে তিনি বারবার 'অর্থের অপচয়' এবং 'পুরোহিততন্ত্রের দাসত্ব' বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই নির্দেশগুলি কেবল মুখের কথা ছিল না; সবিতা জানতেন, এটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক উইল-এর অংশ, যা তাঁর ঘনিষ্ঠ কমরেডদের কাছে আগে থেকেই পৌঁছে দেওয়া ছিল।

সবিতা দেবীর মনে চলছিল এক উত্তাল ঝড়। একদিকে ছিল তাঁর স্বামীর প্রতি আনুগত্য—যাকে তিনি ভালোবাসতেন এবং তাঁর আদর্শকে সম্মান করতেন। অন্যদিকে ছিল তাঁর ধার্মিক মন ও মায়ের শিক্ষা—যা বলছিল, শ্রাদ্ধ হলো সন্তানের শেষ কর্তব্য, যার মাধ্যমে আত্মার মুক্তি নিশ্চিত হয়। সবিতা জানতেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধ না করেন, তবে তাঁর নিজের আত্মার মুক্তিও হবে না—তাঁকে সারা জীবন এই কর্তব্যচ্যুতির যন্ত্রণা বহন করতে হবে। তপনবাবু তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে সবিতা দেবীকে এক অসহনীয় আদর্শিক দ্বন্দ্বে ফেলে গেলেন। সবিতা এখন কেবল একজন শোকাহত বিধবা নন, তিনি দুই বিপরীত আদর্শের মাঝে আটকে পড়া এক অসহায় নারী।

১০

তপনবাবুর শেষকৃত্য শ্মশানে সম্পন্ন হওয়ার পর, সবেমাত্র সবিতা দেবী বাড়িতে ফিরেছেন। তাঁর ক্লান্ত শরীর, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ আর স্বামীর মৃত্যুজনিত শোক—সব মিলিয়ে তিনি যেন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন। ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল, কারণ আত্মীয়-স্বজনদের আসার কথা। কিন্তু সেই শোকের আবহে কোনো মানবিক স্বস্তি

আসার আগেই প্রবেশ করলেন তপনবাবুর ঘনিষ্ঠ কমরেডরা।

কমরেড নেতা শ্যামলবাবু, যিনি তপনবাবুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখে শোকের কোনো প্রকৃত প্রকাশ ছিল না, ছিল একধরনের রাজনৈতিক কাঠিন্য এবং কর্তব্য পালনের তাগিদ। তিনি সবিতা দেবীকে পাশে বসিয়ে কঠোর ও করপোরেট সুরে দলের 'সিদ্ধান্ত' জানালেন। তপন বাবুর মৃত্যু যেন তাঁর কাছে এক রাজনৈতিক এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ মাত্র।

শ্যামলবাবু প্রায় আদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে সবিতা দেবীকে বললেন, "সবিতা দি, কমরেড তপনের শেষ ইচ্ছা ছিল, ধর্মীয় রীতিনীতি নয়, বরং তাঁর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে। উনি আমাদের বারবার বলে গেছেন, শ্রাদ্ধ হলো 'অর্থের অপচয়' এবং 'পুরোহিততন্ত্রের দাসত্ব'। সুতরাং, শ্রাদ্ধ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই অর্থ বরং কোনো গরিব কমরেডের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য ব্যয় করা যেতে পারে—এটাই হবে কমরেড তপনের প্রতি আসল শ্রদ্ধা।"

তিনি একটি তারিখ ও স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে বললেন, "আমরা আগামী রবিবার আবাসনের মূল হলে একটি 'শোক সভা' এবং 'স্মরণ সভার' আয়োজন করব। সেখানে সমাজের জন্য কমরেড তপনের আত্মত্যাগ এবং তাঁর মুক্তচিন্তার আদর্শ নিয়ে আলোচনা হবে।" তাঁর এই শুষ্ক, আবেগহীন সিদ্ধান্ত সবিতা দেবীর মনে দ্বিতীয় এক আঘাত হানল।

১১

শ্যামলবাবুর কথার প্রতিটি শব্দ যেন পাথরের মতো সবিতা দেবীর বুকে আঘাত হানল। সবিতা দেবী, যিনি স্বামীর প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁর মন মানছিল না। তাঁর হিন্দু ঐতিহ্য ও পারিবারিক সংস্কার তাঁকে তাগিদ দিচ্ছিল। তিনি কেবল একজন কমরেডের স্ত্রী নন, তিনি এই মাটির একজন মানুষ।

তাঁর মাথায় ঘুরতে থাকল: তপনের আত্মা? তার শেষ যাত্রার কর্তব্য? তাঁর মা-বাবা তাঁকে শিখিয়েছিলেন যে শ্রাদ্ধ হলো সন্তানের শেষ কর্তব্য, পিতৃঋণ শোধের একটি পবিত্র পথ—যা কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং মুক্তি ও শান্তির আচার। এই রীতিনীতি কি কেবলই টাকা নষ্ট? এই মুক্তির পথটুকু কি তিনি তাঁর স্বামীকে দিতে পারবেন না?

তিনি অস্ফুটে, প্রায় ফিসফিস করে আপত্তি জানাতে চাইলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ক্ষীণ ও দুর্বল। "কিন্তু শ্রাদ্ধের যা বিধান... আত্মা শান্তি পাবে কী করে? আমার মায়েরাও তো... বলতেন... শেষকৃত্য ঠিকভাবে না হলে..."

কমরেড নেতা শ্যামলবাবু কোনো আবেগ বা মানবিকতার স্থান দিলেন না। তিনি দ্রুত

সবিতা দেবীর হাত ধরে, প্রায় চেপে ধরার ভঙ্গিতে বললেন। তাঁর চোখ ছিল স্থির ও কঠোর। "সবিতা দি, আপনি কমরেডের সহধর্মিণী। কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবেন না। আমরা মুক্তচিন্তার মানুষ। আপনার প্রতি আমাদের সমবেদনা আছে, কিন্তু আমাদের কাছে আদর্শই আগে। আপনি শোক সভার প্রস্তুতি নিন। আমরা ব্যানার, ফুল এবং বক্তাদের ব্যবস্থা করছি। আপনার দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ আমরা কাউকে দেব না।"

শ্যামলবাবুর শেষ কথাটি ছিল এক নির্দয় হুমকি। সবিতা দেবী বুঝলেন, এই মানুষগুলো স্বামীর মৃত্যুর শোককে ছাপিয়ে তাঁর উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ফলাতে এসেছে। তাঁর ধার্মিক মন আর স্বামীর প্রতি আনুগত্যের মধ্যে তিনি অসহায়ভাবে দুলছিলেন। তিনি যেন প্রতিবাদ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন। দীর্ঘদিনের বামপন্থী আদর্শের আবহে তিনি কেবল নীরব হয়ে সিদ্ধান্তটি মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

১২

শ্যামলবাবুর কঠোর ফতোয়ার পর সবিতা নীরব হয়ে গেলেন। এই নীরবতা ছিল সম্মতি বা আত্মসমর্পণের নয়, বরং ক্ষমতাহীনতা ও গভীর যন্ত্রণার প্রতীক। তাঁর দীর্ঘদিনের বামপন্থী আদর্শের আবহে তিনি প্রতিবাদ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর স্বামী তপন বাবু শুধু ঘর শাসন করতেন না, তাঁর আদর্শ দিয়ে সবিতা দেবীর মনের ওপরও এক অদৃশ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিলেন। স্বামীর জীবদ্দশায় তিনি যা লুকিয়ে পালন করতেন—তুলসীতলায় জল দেওয়া বা গোপনে মন্ত্রপাঠ করা—আজ স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁকে প্রকাশ্যে তা অস্বীকার করতে বলা হচ্ছে। এই চাপ ছিল অসহনীয়।

সবিতা দেবীর ধার্মিক মন আর স্বামীর প্রতি আনুগত্যের মধ্যে তিনি অসহায়ভাবে দুলছিলেন। তাঁর মন বলছিল, শ্রাদ্ধ না করলে স্বামীর আত্মা মুক্তি পাবে না, আর তিনি নিজেও ক্ষমা পাবেন না। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর স্বামী তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁকে একা ছাড়লেন না; তাঁর আদর্শের ভূত যেন এখনো ফ্ল্যাটের বাতাসে, আসবাবপত্রে এবং কমরেডদের প্রতিটি পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ফ্ল্যাট, যা এতদিন ছিল তপনবাবুর আদর্শের দূর্গ, তা এখন সবিতা দেবীর জন্য আদর্শিক এক কারাগারে পরিণত হলো। তিনি যেন নিজের কর্তব্য পালনের শেষ অধিকারটুকুও হারিয়ে ফেললেন।

১৩

এই কঠিন সময়ে সবিতা দেবী যখন মানবিক সমর্থনের আশা করছিলেন, তখন কন্যা রীতার অবস্থান তাঁকে আরও বেশি করে একা করে দিল। রীতা বাবার দলের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাল। তার কাছে বাবার আদর্শ ছিল প্রগতিশীলতার

প্রতীক, যা আধুনিকতার মন্ত্র; আর শ্রাদ্ধ ছিল অন্ধকারের প্রতীক, যা মধ্যযুগীয় কুসংস্কার।

রীতা মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যুক্তি দিয়ে বলল, "মা, বাবার শেষ ইচ্ছের দাম দাও। উনি এসব বিশ্বাস করতেন না। শ্রাদ্ধ করা কেবল একটা রীতিনীতি, এর পেছনে কোনো বিজ্ঞান নেই। আত্মার মুক্তি তো আর মন্ত্রে হয় না, হয় মানুষের কল্যাণে, বাবার ভালো কাজগুলোর মধ্য দিয়ে।" রীতার এই কথাগুলো সবিতা দেবীর মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করল। সবিতা দেবী বুঝলেন, তপন বাবু শুধু স্ত্রীকে নয়, কন্যাকেও তাঁর আদর্শিক উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। মায়ের আত্মিক যন্ত্রণার চেয়েও মেয়ের কাছে বাবার রাজনৈতিক আদর্শ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৪

ফলে, বাধ্য হয়ে সবিতা দেবী শ্রাদ্ধের পরিবর্তে শোক সভার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এই প্রস্তুতি ছিল এক অসহ্য নাটকের মঞ্চায়ন। একদিকে কমরেডরা ব্যানারের রঙের বিষয় বা বক্তাদের তালিকা নিয়ে আসছিলেন, অন্যদিকে সবিতা দেবী মনে মনে শাস্ত্রীয় তিথি ও মন্ত্র স্মরণ করছিলেন।

তাঁর মনের কোণে এই ভয় কাজ করতে থাকল যে, তিনি যেন কেবল স্বামীর শেষ কর্তব্যটুকুই পালন করতে পারলেন না। তাঁর মন বলছিল, তিনি স্বামীর আত্মাকে কেবল 'আদর্শের আবর্তে'—যে আবর্তে কোনো ঈশ্বর নেই, কেবল আছে বস্তু ও ক্ষমতা—আরও বেশি করে জড়িয়ে দিচ্ছেন, মুক্তি দিতে পারছেন না। সবিতা দেবীর চোখ তখন ছিল শুকনো, কারণ তাঁর অশ্রুও যেন রাজনৈতিক মতাদর্শের অধীনে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন—এই অসহায়তার গ্লানি আর কতদিন তাঁকে বহন করতে হবে।

১৫

আবাসনে যখন শোক সভার আয়োজন নিয়ে কমরেডদের রাজনৈতিক ফতোয়া এবং সবিতা দেবীর অসহায় আত্মসমর্পণের খবর রটল, তখন প্রফেসর রতনবাবু স্থির থাকতে পারলেন না। ষাটোর্ধ্ব এই প্রাজ্ঞ মানুষটি শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির কোণে বসে খবরটি শুনলেন। তিনি তখনি স্থির করলেন, তিনি এই তথাকথিত ‘শোক সভা’য় অবশ্যই উপস্থিত হবেন।

তাঁর এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য শোক প্রকাশ বা কেবল একটি অনুষ্ঠানে যোগদান ছিল না, বরং ছিল এক গভীর দার্শনিক প্রতিবাদ। রতনবাবু বুঝতে পারছিলেন, বামপন্থীরা এই 'নীরবতা' এবং 'শোক সভার' নামে সমাজের উপর নতুন এক 'নিয়ম' চাপিয়ে দিচ্ছে। তারা যেমন ধর্মীয় রীতিনীতিকে 'কুসংস্কার' বলে অস্বীকার করে, তেমনি তারা নিজেদের তৈরি করা নতুন রীতিনীতিকে—যেমন বাধ্যতামূলক নীরবতা বা রাজনৈতিক স্লোগান—অলিখিত আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা

করছে। তাদের এই আচরণ ছিল সুবিধাবাদী এবং স্ববিরোধী।

১৬

রতনবাবু জানতেন, বামপন্থীরা কেবল ধর্মকে অস্বীকার করে না, তারা একটি দেশের আত্মাকে অস্বীকার করে। তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন, আজ যদি তিনি চুপ করে থাকেন, তবে সমাজে সনাতন রীতিনীতির উপর এই আঘাত আরও তীব্র হবে। এই আঘাত শুধু তপন বাবুর শ্রাদ্ধের প্রশ্ন নয়, এটি দেশের আত্মিক পরম্পরার প্রতি আঘাত, যেখানে জীবনের প্রতিটি ধাপের জন্য সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের গভীরে রয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যা এই তথাকথিত 'মুক্তচিন্তার' ধারকরা বুঝতে অক্ষম।

তাঁর কাছে এই শোক সভা ছিল সত্য ও মিথ্যা আদর্শের এক নীরব যুদ্ধ। তিনি ভাবছিলেন, শোকের এই মঞ্চটিকে যদি রাজনৈতিক আদর্শের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা যায়, তবে জ্ঞানের আলোকেও এই মঞ্চে তুলে ধরা যেতে পারে।

রতনবাবু প্রস্তুত হলেন। তাঁর প্রস্তুতি ছিল অস্ত্র শাণিত করার মতো। তিনি জানতেন, তাঁর হাতে কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নেই, কোনো সংগঠিত কমিটি নেই, কোনো উচ্চস্বরের ব্যানার নেই। কমরেডদের মতো তাঁর কাছে ক্ষমতাও ছিল না। তাঁর হাতে ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় এবং অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র—শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও অপ্রতিরোধ্য যুক্তি। তিনি তাঁর টেবিলে রাখা বেদ, উপনিষদ এবং গীতা স্পর্শ করলেন। তাঁর চোখ ঝলসে উঠল এক দৃঢ় সংকল্পে। তিনি স্থির করলেন, এই শোক সভাই হবে তাঁর দীর্ঘদিনের নীরবতার জবাব, হবে ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে সত্যের প্রথম উচ্চারণ এবং সনাতন পথের দিশা দেখানোর প্রথম সুযোগ।

তিনি জানতেন, কেবল আবেগ বা রাজনৈতিক চাপ দিয়ে এই লড়াই জেতা যাবে না। এই লড়াই জিততে হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে। তাঁর উপস্থিতি হবে আত্মার মুক্তির পক্ষে এবং বস্তুবাদের বিপক্ষে এক দার্শনিক ঘোষণা। রতনবাবু অপেক্ষা করতে থাকলেন সেই রবিবারের জন্য—যেখানে নীরবতার বিরুদ্ধে প্রজ্ঞার কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হবে।

১৭

রবিবারের দুপুর। আদর্শ আবাসনের সাধারণ হলঘরটি আজ কমরেড তপনবাবুর 'শোক সভার' জন্য প্রস্তুত। প্রবেশপথ থেকে শুরু করে মঞ্চ পর্যন্ত সর্বত্রই ছিল এক অস্বাভাবিক, কৃত্রিম এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ। এই আয়োজন শোকের চেয়ে বরং রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের একটি উপলক্ষ হয়ে উঠেছিল। হলঘরের একপাশে কালো ও লাল কাপড়ের ব্যবহার, যা যেন শোকের চেয়ে

রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চের বেশি ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

মঞ্চের ঠিক পেছনে লাল কাপড়ের ওপর সাদা হরফে বড় করে লেখা—"কমরেড তপন বাবু অমর রহে"। সেখানে তপনবাবুর এক বিশাল প্রতিকৃতি রাখা, যা শুকনো ফুলের কয়েকটি তোড়া দিয়ে ঘেরা। এই তোড়াগুলিতেও ছিল না কোনো আন্তরিকতার ছাপ, ছিল যেন স্রেফ প্রথাগত বাধ্যবাধকতা। কমরেডদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো—তাদের প্রত্যেকের মুখে ছিল এক কৃত্রিম শোকের আবহ, যা কোনোভাবেই হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা অনুভূতির প্রকাশ ছিল না। বরং, তা ছিল দলের নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের এক যান্ত্রিক প্রদর্শন। পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন একটি 'অলিখিত নাটক' মঞ্চস্থ হতে চলেছে, যেখানে চরিত্ররা কেবল তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করছে।

সামনের সারিতে পাথরের মতো বসেছিলেন তপন বাবুর স্ত্রী সবিতা দেবী এবং কন্যা রীতা। সবিতা দেবীর মুখ ছিল ফ্যাকাশে, তাঁর চোখে ছিল গভীর শূন্যতা। এই শূন্যতা কেবল স্বামীর মৃত্যুজনিত শোকের কারণে নয়, বরং স্বামীর আদর্শের চাপে নিজের সনাতন কর্তব্যটুকুও পালন করতে না পারার গ্লানিজনিত যন্ত্রণা। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন তাঁর স্বামীকে মুক্তি দিতে পারলেন না, কেবল আদর্শের কারাগারে তাঁকে আরও বেশি করে আবদ্ধ করে দিলেন। তাঁর শোক ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু তাঁর যন্ত্রণা ছিল আদর্শগত সংঘাতের ফল।

১৮

ঠিক সেই সময়, যখন কমরেড নেতারা একে অপরের সঙ্গে মৃদু ফিসফিস করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন সবার শেষে, একাকী প্রবেশ করলেন প্রফেসর রতন মণ্ডল। তাঁর প্রবেশ ছিল নাটকীয়তা বর্জিত, কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর পোশাক ছিল সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন—একটি ধুতি-পাঞ্জাবি, যা সেই হলঘরের রাজনৈতিক পোশাকে মোড়া ভিড়ের মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

তাঁর পায়ে কোনো আওয়াজ হলো না। তিনি যেন আদর্শিক কোলাহলের ঊর্ধ্বে এক নীরব উপস্থিতি। তিনি নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে হলঘরের এক কোণে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর এই কোণ বেছে নেওয়া ছিল তাঁর দার্শনিক অবস্থানের প্রতীক—তিনি ভিড়ের মাঝে থেকেও ছিলেন স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ।

তাঁর চোখে ছিল কোনো শোক নয়, ছিল এক অটল সংকল্প—যা কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়, বরং শাস্ত্রের প্রজ্ঞায় ঋজু। রতনবাবু যেন এক দার্শনিক যোদ্ধা, যিনি এই রাজনৈতিক আস্ফালনের মধ্যে তাঁর নিঃশব্দ প্রতিবাদের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি জানতেন, এই মঞ্চে তাঁর অস্ত্র হবে কেবল নীরবতা ও জ্ঞান, যা এই কৃত্রিম শোকের আবহকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে প্রস্তুত। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন সেই মুহূর্তের জন্য, যখন

নীরবতার বিরুদ্ধে সত্যের আহ্বান উচ্চারিত হবে।

১৯

অল্পক্ষণের মধ্যেই শোকসভার মূল পর্ব শুরু হলো। ঘোষক, স্থানীয় বামফ্রন্টের যুবনেতা অরিন্দম, মঞ্চে এসে মাইক্রোফোন হাতে নিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর হলঘরের কৃত্রিমতাকে আরও বাড়িয়ে তুলল। তাঁর কণ্ঠে ছিল রাজনীতি মঞ্চের সেই চেনা বাগাড়ম্বর ও কৃত্রিম আবেগ। তিনি তপন বাবুর রাজনৈতিক আদর্শের জয়গান গাইলেন, যেন তাঁর মৃত্যুও ছিল আদর্শের জন্য এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

অরিন্দম ঘোষণা করলেন, "কমরেড তপন বাবুর আত্মত্যাগ আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়। তাঁর জীবন আমাদের মতো তরুণদের কাছে এক মুক্তচিন্তার আলোকবর্তিকা। তাঁর আদর্শ চিরকাল আমাদের পথ দেখাবে। এখন, আমরা কমরেড তপনের শেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে, তাঁর 'আত্মার চিরশান্তি' কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করব। সবাই উঠে দাঁড়াবেন! এই নীরবতা হবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের শপথ!"

এই ঘোষণাটি ছিল এক রাজনৈতিক ফতোয়া। তপন বাবু যেখানে শ্রাদ্ধকে 'কুসংস্কার' বলে বাতিল করেছিলেন, সেখানে তাঁর কমরেডরা নীরবতাকে তাদের নিজস্ব 'নতুন রীতিনীতি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। এটি ছিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চাপানোর এক সূক্ষ্ম কৌশল।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই হলঘরের সবাই, যারা বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী অথবা বামপন্থীদের বিরাগভাজন হতে ভয় পেত, তারা যেন স্বয়ংক্রিয় রোবটের মতো উঠে দাঁড়াল। এই উঠে দাঁড়ানো ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রদ্ধা নয়, বরং অলিখিত, কিন্তু চাপিয়ে দেওয়া কর্তৃত্বের নির্দেশ পালন। তাদের চোখে ছিল না কোনো গভীর শোক, ছিল কেবল সামাজিক বাধ্যবাধকতা। যদি কেউ না ওঠে, তবে তাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বা 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' বলে চিহ্নিত করা হবে—এই ভয় সবার মনে কাজ করছিল। হলঘর জুড়ে এক যান্ত্রিক স্তব্ধতা নেমে এল।

সামনের সারিতে সবিতা ও রীতাও উঠে দাঁড়ালেন। সবিতা দেবীর চোখ ছিল অশ্রুসজল, কিন্তু তাঁর এই নীরবতা ছিল স্বামীর প্রতি আনুগত্যের চাপ। রীতার মুখে ছিল আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা, যা তাকে মায়ের আত্মিক কষ্ট বুঝতে দিচ্ছিল না।

কিন্তু এই যান্ত্রিক ভিড়ের মধ্যে এক কোণে, প্রফেসর রতনবাবু অনড়। তিনি শান্তভাবে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিজের আসনে বসেই রইলেন। তাঁর এই ঋজু ভঙ্গিমা এবং শান্ত চোখ যেন পুরো দৃশ্যকে নীরবে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিল। তাঁর নীরবতা ছিল উদ্ধত নয়,

বরং গভীর প্রজ্ঞা ও প্রতিবাদের প্রতীক। তিনি নীরবতার বিরুদ্ধে নীরবতার মাধ্যমেই প্রতিবাদ করলেন।

রতনবাবুর এই নীরব অনড়তা বামপন্থীদের 'নিয়ম' ভাঙার এক দার্শনিক প্রতীক হয়ে উঠল। তিনি বোঝাতে চাইলেন, নিয়ম যদি যুক্তির উপর না দাঁড়ায়, তবে সেই নিয়ম মানা এক নতুন ধরনের অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। যদি শ্রাদ্ধ বাতিল হয়, তবে রাজনৈতিক শোকসভাও বাতিলযোগ্য। এক মিনিটের সেই নীরবতা হলঘরে ছিল না, ছিল কেবল তাঁর হৃদয়ে—যেখানে তিনি সমাজের মূল সত্য নিয়ে মনন করছিলেন। রতন বাবুর এই নীরবতাই ছিল আসন্ন বিতর্কের প্রথম স্ফুলিঙ্গ।

২০

এক মিনিটের নীরবতা শেষ হতেই হলঘরে আর যান্ত্রিক স্তব্ধতা রইল না; শুরু হলো এক বিস্ফোরক চাপা গুঞ্জন। সবার চোখ তখন রতনবাবুর দিকে। এই দৃশ্যটি ছিল সেই মুহূর্তে আবাসনের আদর্শগত বিভাজনের চূড়ান্ত প্রতীক। সকলের মনে একই প্রশ্ন: "উনি কেন উঠলেন না?" এই প্রশ্নটি কেবল রতনবাবুর প্রতি ছিল না, তা ছিল বামপন্থীদের চাপিয়ে দেওয়া কর্তৃত্বের প্রতি এক নীরব প্রশ্নচিহ্ন।

সামনের সারিতে বসা সবিতা দেবী আতঙ্কে চোখ বুজলেন। তিনি জানতেন, রতনবাবুর এই নীরবতাই এক বিরাট ঝড়ের সূচনা করবে।

তপনবাবুর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ও বামপন্থী অনুসারী শ্যামল বাবু তাঁর মুখ রক্ষা করতে দ্রুত রতন বাবুর কাছে গেলেন। তাঁর মুখে ছিল বিরক্তি, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল সামান্য ভয়—কারণ রতন মণ্ডলকে অসম্মান করার সাহস তাঁর ছিল না। শ্যামলবাবু প্রবীণ এই শিক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তিক ওজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

শ্যামল বাবু চাপা, প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, আপনি কি অসুস্থ? আপনি কেন উঠলেন না? সবাই একটা নিয়ম মানলেন, আপনি কেন... এটা কমরেড তপনের প্রতি চরম অসম্মান।" তাঁর কণ্ঠে ছিল কর্তৃত্বের সুর এবং কিছুটা অনুরোধের ভান।

রতনবাবু তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। তিনি বসেই রইলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ধীর, কিন্তু হীরকখণ্ডের মতো দৃঢ় এবং গভীর। তাঁর চোখে ছিল না কোনো রাজনৈতিক বিদ্বেষ, ছিল কেবল প্রজ্ঞার তীব্রতা। তিনি ধীরে ধীরে মাথা তুলে শ্যামলবাবুর দিকে তাকালেন।

"নিয়ম? কোন নিয়ম? আমাকে বলবেন? এই 'এক মিনিটের নীরবতা' কে প্রবর্তন করেছে?" রতন বাবুর এই প্রশ্ন ছিল একটি ফাঁদ। শ্যামল বাবু অপ্রস্তুত হয়ে ঢোক গিললেন।

রতনবাবু তাঁর কথা চালিয়ে গেলেন, প্রতিটি শব্দ ছিল তর্কশাস্ত্রের কঠিন প্রহার। "তপন বাবু যদি সমাজের প্রাচীনতম নিয়ম—ধর্মীয় আচার—তাকে 'বুর্জোয়া কুসংস্কার' বলে বাতিল করেন, তবে তাঁর অনুগামীরা শোকের নামে এই নতুন এক নিয়ম কেন চাপিয়ে দিচ্ছেন? যদি তোমরা শ্রাদ্ধকে 'কুসংস্কার' বলে বাতিল করো, তবে এই নীরবতা পালন কি নতুন কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয়, যা তোমাদের নিজেদের তৈরি?"

হলঘরে সবাই স্তম্ভিত। রতন বাবুর যুক্তি যেন সরাসরি বামপন্থীদের যুক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিল। তারা দেখল, তাদের আদর্শ কেবল 'না মানার আদর্শ'। তারা শ্রাদ্ধকে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু শোকের নামে চাপিয়ে দেওয়া তাদের নিজস্ব 'নিয়মের' সপক্ষে কোনো দার্শনিক বা মানবিক যুক্তি দিতে পারল না।

রতনবাবু এবার চূড়ান্ত আঘাত হানলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর আরও গভীর হলো: "নিয়মের ভক্ত হলে সমাজের মূল নিয়ম কেন মানছ না? আর যদি নিয়ম না মানো, তবে এই নতুন নিয়ম চাপানোর অধিকার তোমাদের কে দিল? তোমরা সুবিধাবাদী—তোমরা কেবল সেই নিয়ম মানো যা তোমাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।"

শ্যামল বাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাঁর মতো প্রশিক্ষিত বক্তা এমন অপ্রতিরোধ্য যুক্তির সামনে কী বলবেন, তা খুঁজে পেলেন না। তিনি ইতস্তত করে পিছিয়ে গেলেন—তাঁর রাজনৈতিক স্লোগান মূল্যহীন প্রমাণিত হলো। সংঘাতের সূত্রপাত হলো, এবং সেই সংঘাত শুরু হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জ্ঞানের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য দিয়ে।

২১

শ্যামল বাবু যখন যুক্তির কাছে পরাজিত হয়ে পিছু হটলেন, তখন রতনবাবু আর থামলেন না। তিনি এবার শ্যামল বাবুকে উপেক্ষা করে সবার দিকে তাকিয়ে উচ্চ স্বরে বলতে শুরু করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনো রাজনৈতিক রাগ ছিল না, ছিল কেবল জ্ঞানের গভীরতা ও প্রজ্ঞার আলো, যা হলঘরের কৃত্রিমতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল শান্ত, কিন্তু মহৎ এক বজ্রধ্বনির মতো।

তিনি প্রশ্ন ছুঁড়লেন, "তোমরা পরিবর্তন চাও? তোমরা নতুন সমাজ গড়তে চাও? তবে তোমাদের কাছে কি এই সমাজের শিকড়, তার ইতিহাস সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আছে? তোমরা যে শ্রাদ্ধকে কুসংস্কার বলার আগে কি একবারও তার দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে ভেবে দেখেছো?"

রতনবাবু এবার শ্রাদ্ধের আসল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। তাঁর কথাগুলো ছিল সহজ ও হৃদয়গ্রাহী। "শ্রাদ্ধ কেবল মন্ত্রপাঠ নয়। এটি একটি গভীর দার্শনিক প্রক্রিয়া। সবিতা মা'র মতো গৃহস্থের জন্য এটি হলো

ত্রিঋণ—দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ—শোধের শেষতম সুযোগ। আমরা এই পৃথিবীতে যা কিছু পাই, তার সবকিছুর ঋণ আমাদের ওপর থাকে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে, শ্রাদ্ধের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের আত্মা শান্তি লাভ করে এবং আশীর্বাদ প্রদান করে। গরুড় পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে একে অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান বলা হয়েছে।"

একটু থেমে তিনি আরও বললেন, "ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, শ্রাদ্ধকর্মের মাধ্যমে মৃতের আত্মা প্রেতলোক থেকে পিতৃলোকে যাওয়ার শক্তি পায় এবং সদ্গতি লাভ করে। পিণ্ডদান ও তর্পণ এই প্রক্রিয়ার মূল অংশ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও কূলধর্ম নষ্ট হলে পিতৃপুরুষদের নরকে পতিত হওয়ার আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে, যা শ্রাদ্ধ-তর্পণের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করে। 'শ্রাদ্ধ' শব্দের মূল অর্থ হলো শ্রদ্ধা (শ্রৎ + ধা)। এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ড, জল, ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দান করা হয়। এটি নিছক পুরোহিতের কাজ নয়, বরং কর্তার (পুত্র, কন্যা বা আত্মীয়) আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশ।

মৃত্যুর পর পরিবারে যে গভীর শোক ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়, শ্রাদ্ধ সেই শোক কাটানোর জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া প্রদান করে। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শোক প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা (অশৌচকাল) এবং নির্দিষ্ট সমাপ্তি (আদ্যশ্রাদ্ধ) থাকায় পরিবার মানসিকভাবে স্থির হতে পারে এবং মৃতের স্মৃতিকে সম্মানের সাথে ধারণ করে জীবনে এগিয়ে যেতে পারে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পরিবারের সবাই একত্রিত হয়। এটি পূর্বপুরুষদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতাবোধকে পুনরুজ্জীবিত করে। যৌথভাবে অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং বংশের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। শ্রাদ্ধের অঙ্গ হিসেবে দান-ধ্যান, অতিথিভোজন, দরিদ্রভোজন এবং ব্রাহ্মণদের (জ্ঞান-পাপী) দক্ষিণা দেওয়ার প্রথা আছে। এর মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে, পুরোহিতরা (ব্রাহ্মণ) সমাজের জ্ঞান ও সংস্কৃতির বাহক। দক্ষিণা দেওয়ার মাধ্যমে এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।"

তিনি জোরের সঙ্গে বলেন "শ্রাদ্ধে যে 'অপচয়' হওয়ার কথা বলা হয়, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্রভোজন এবং জ্ঞানী-গুণীজনদের (পুরোহিত) প্রতি সমাজের সম্মান ও আর্থিক সহায়তা হিসেবে ব্যয় হয়। এই ব্যয়কে কেবল ধর্মীয় আচার হিসেবে না

দেখে সামাজিক দায়িত্ব ও অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টনের একটি ঐতিহ্যগত উপায় হিসেবেও দেখা যায়। শ্রাদ্ধের খরচ কর্তার সামর্থ্য অনুযায়ী হয়, এবং শাস্ত্রানুসারে সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে ব্যয় করা অনুমোদিত নয়। শ্রাদ্ধের অংশ হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে কাক, গরু এবং অন্যান্য প্রাণীকে খাওয়ানোর প্রথা আছে (যেমন পিণ্ডদান)। সনাতন ধর্মে সব জীবের প্রতি দয়া এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার যে দর্শন রয়েছে, এটি তারই প্রতিফলন।”

তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "যখন জীবাত্মা পরমাত্মার দিকে যাত্রা করে, তখন এই কর্মই তাকে শক্তি জোগায়। শ্রাদ্ধ হলো আমাদের পূর্বপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাঁদের জ্ঞান ও পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ। এটা সমাজকে ধরে রাখার, পরিবারের পরম্পরাকে রক্ষা করার একটা উপায়। তোমরা যে সমাজকে আধুনিক করতে চাও, সেই সমাজের ভিত্তিটাকেই তোমরা কাটতে চাইছো। হাজার হাজার বছরের জ্ঞানের ভিত্তিতে এই রীতি গড়ে উঠেছে, শূন্য থেকে নয়! তোমরা যা বাতিল করতে চাইছো, তা হলো তোমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি।"

হলঘরের সাধারণ মানুষজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। তাদের কাছে শ্রাদ্ধ এতদিন ছিল কেবল একটি ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান; আজ তারা জানতে পারল এর গভীর দার্শনিক ও আত্মিক ভিত্তি। সবিতা দেবীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি বুঝলেন, রতনবাবু তাঁর হারিয়ে যাওয়া কর্তব্য এবং আত্মিক শান্তি ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

রতনবাবু এবার সরাসরি বামপন্থীদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন। তাঁর চোখ যেন তাদের আত্মিক শূন্যতাকে বিদ্ধ করছিল। "তোমরা যারা নিজেদের মুক্তচিন্তার ধারক মনে করো, বলো—তোমাদের বাড়িতে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত—এর একটি বইও আছে কি? তোমরা লেনিন, মাও চেনো, কিন্তু এই দেশের আত্মিক জ্ঞান ভান্ডার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।"

তাঁর প্রতিটি শব্দ ছিল তপন বাবুর মতো আদর্শবাদীদের প্রতি সরাসরি অভিযোগ। "তোমাদের জ্ঞানের উৎস হলো বাইরের মাটি। তোমরা কেবল সেই আদর্শকেই গ্রহণ করো যা তোমাদের ক্ষমতা দখলের স্লোগান শেখায়। এটাই তোমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধাবাদ। তোমরা বিদেশি মতবাদে আস্থা রাখো, কারণ সেখানে কোনো দায়বদ্ধতা নেই; কিন্তু এই ভারতবর্ষের আত্মাকে তোমরা চেনো না, তাই তোমাদের আদর্শ কেবল বিশৃঙ্খলা ও বস্তুবাদের ফাঁপা আস্ফালন তৈরি করে।"

বামপন্থী নেতাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাদের অনেকে ইতস্তত করে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং ঋজু যুক্তির সামনে তাদের রাজনৈতিক

স্লোগান মূল্যহীন, ফাঁপা বেলুনের মতো প্রমাণিত হলো। তারা বুঝল, রতনবাবু কেবল একজন মানুষ নন, তিনি যেন প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞার প্রতীক, যিনি তাদের আদর্শের দুর্বলতম স্থানে আঘাত করেছেন। হলঘরের বাতাস থেকে কৃত্রিমতা দূর হলো, সেখানে স্থাপিত হলো জ্ঞান ও সত্যের মহিমা।

২২

নবীন কমরেড অরিন্দম, রতনবাবুর কাছে প্রশ্ন রাখলেন - "ধর্ম ও বিজ্ঞান আলাদা, আমরা বিজ্ঞানকে মান্য করি, তাই এসব আমাদের কাছে কুসংস্কার।" রতনবাবু অরিন্দমকে প্রশ্ন করলেন - তোমার পরিবার আছে ?

অরিন্দম - 'আছে ?'

রতনবাবু - 'বিজ্ঞান কি পরিবার বোঝে ?'

অরিন্দম উত্তর না জানা প্রশ্নের মুখে পড়ে কিছুটা হতভম্ভ। রতনবাবু তখন বললেন 'তোমরা ভুল জানো, ভুল মানো ও ভুল প্রচার করো। তোমরা নিজেদের অজান্তেই সমাজের ক্ষতি করো।' একটু থেমে, "বিজ্ঞানে পরিবার বলে কিছু হয় না। বিজ্ঞানে পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্ত্রী বলে কিছু হয় না। ধর্মই সম্পর্কের মূল। ধর্মকে না মানার অর্থ হল সমস্ত সম্পর্ককে অস্বীকার করা। তুমি পারবে তোমার পরিবারকে অস্বীকার করতে?"

অরিন্দম চুপ।

রতনবাবু বললেন শোনো অরিন্দম " তুমি যদি উপনিষদ পড়তে তাহলে তোমার মনে এই প্রশ্ন আসত না। সনাতন ধর্ম কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, এটি একটি জীবন দর্শন যা বহু বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন দর্শনের মূল ভিত্তি হলো 'ব্রহ্ম' বা পরম সত্তা, যা অনাদি, অনন্ত এবং অবিনশ্বর। উপনিষদ অনুসারে, ব্রহ্ম হলো সেই মূল শক্তি যা থেকে সবকিছু সৃষ্টি হয় এবং যেখানে সবকিছু বিলীন হয়। এটি আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তির নিত্যতা সূত্রকে (Law of Conservation of Energy) সমর্থন করে, যা বলে: "শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে পারে।" ব্রহ্মকে বিশ্বজগতের নিত্য শক্তি হিসেবে দেখলে এই সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়। সনাতন ধর্ম অনুসারে, মহাবিশ্ব একটি চক্রাকার প্রক্রিয়ায় চলে—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়। এই সৃষ্টিচক্রকে 'কল্প' বা 'মন্বন্তর' নামে অভিহিত করা হয়। আধুনিক কসমোলজিতে (Cosmology) মহাবিশ্বের 'বিগ ব্যাং' ও 'বিগ ক্রাঞ্চ' (Big Crunch) বা 'সাইক্লিক ইউনিভার্স' (Cyclic Universe) তত্ত্ব রয়েছে, যা মহাবিশ্বের চক্রাকার প্রকৃতিকে সমর্থন করে। সময়ের এই সুবিশাল স্কেল এবং চক্রাকার ধারণা সনাতন দর্শনের 'কল্প' ধারণার সাথে তুলনীয়। সনাতন জীবনশৈলীর অংশ হিসেবে যে চর্চাগুলি রয়েছে, সেগুলি শরীর ও মনের ওপর বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত প্রভাব ফেলে।

যোগাভ্যাসকে সনাতন ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, এটি মন, শরীর এবং আত্মার মিলন। আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও স্নায়ুবিজ্ঞান (Neuroscience) প্রমাণ করেছে যে, ধ্যান (Meditation) ও প্রাণায়াম (যোগের শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল) স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল-এর মাত্রা কমায়, মস্তিষ্কের তরঙ্গকে (আলফা ও থিটা) শান্ত করে এবং মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের ঘনত্ব বাড়িয়ে মনোযোগ ও আবেগের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে। আয়ুর্বেদ, যার অর্থ 'জীবনের বিজ্ঞান', হাজার হাজার বছর ধরে ভারতে প্রচলিত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। এটি মূলত প্রাকৃতিক উপাদান এবং শরীরের 'দোষ' (বাত, পিত্ত, কফ)-এর ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করে। আয়ুর্বেদের ব্যবহৃত বহু ভেষজ (যেমন হলুদ, তুলসী, অশ্বগন্ধা) আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা তাদের অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি (প্রদাহরোধী) এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য স্বীকৃত হয়েছে। এটি সামগ্রিক স্বাস্থ্য (Holistic Health) এবং জীবনশৈলীর গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে, যা বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত।”

রতনবাবু একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন - সনাতন ধর্মের কিছু সামাজিক ও দার্শনিক ধারণা গভীরভাবে যৌক্তিক এবং সমাজ-বিজ্ঞানের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন ধর্মের কর্মফল তত্ত্ব অনুসারে, প্রতিটি কর্মের একটি ফল আছে। এই তত্ত্বকে প্রায়শই নৈতিকতার শিক্ষা হিসেবে দেখা হয়। কর্মফল হলো মূলত কারণ ও ফলের বৈজ্ঞানিক সূত্র (Law of Cause and Effect)। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের সামাজিক ও দার্শনিক সংস্করণ হিসেবে একে দেখা যেতে পারে: "প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।" এটি ব্যক্তিকে তার কাজের দায়িত্ব নিতে শেখায়, যা একটি সুশৃঙ্খল সমাজের ভিত্তি। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার, যেমন সকালে স্নান করা বা নির্দিষ্ট সময়ে হাত ধোয়া, মূলত স্বাস্থ্যবিধি (Hygiene) বজায় রাখার প্রাচীন পদ্ধতি। উপবাস (Fasting) বর্তমানে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং নামে পরিচিত, যা শরীরের কোষীয় মেরামত (Cellular Repair) এবং হজম প্রক্রিয়াকে বিশ্রাম দিতে সহায়ক বলে প্রমাণিত।”

সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানসম্মত দিক কি জানো অরিন্দম, অরিন্দম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, রতনবাবু বলেন - সেটি হলো এর প্রশ্ন করার মানসিকতা এবং জ্ঞানের উন্মুক্ততা। সনাতন দর্শন কোনো একক ব্যক্তিকে চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করেনি। বরং এটি ষড়দর্শন (সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত) নামক বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের একটি সমন্বয়, যেখানে বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন পথে সত্যকে জানার চেষ্টা করেছেন। এই ধর্ম প্রশ্ন করতে, বিতর্ক করতে এবং যুক্তির মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করে। এই পদ্ধতিই আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি: পর্যবেক্ষণ, অনুমান, পরীক্ষা এবং

সংশোধনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা। সনাতন হিন্দু ধর্ম কেবল বিশ্বাস নির্ভর নয়, বরং এটি একটি সুসংহত জীবনব্যবস্থা যা মহাবিশ্বের প্রকৃতি, মানুষের শরীর ও মনের ক্রিয়া এবং সামাজিক আচরণের গভীরে প্রবেশ করে। ব্রহ্মাণ্ডের চক্রাকার গতি, শক্তির নিত্যতা, মনস্তাত্ত্বিক যোগাভ্যাস, এবং কারণ-ফলের নীতির মতো ধারণাগুলি প্রমাণ করে যে সনাতন ধর্ম একাধারে আধ্যাত্মিকতা, দর্শন এবং বিজ্ঞান–এর এক অনন্য মিশ্রণ। সময়ের সাথে সাথে এর কিছু ব্যবহারিক দিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে হলেও, এর মূল ভিত্তি সর্বদা যুক্তি ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং থাকবে। তাই বলা হয়, সনাতন ধর্ম এক অর্থে মানবজাতির জন্য একটি চিরন্তন বিজ্ঞান।”

অরিন্দমের কাছে রতনবাবুকে বলার মত কিছু ছিল না বরং নিজেদের দেশের বিষয় সম্পর্কে উদাসীনতা তাঁকে লজ্জিত করল। সে রতনবাবুর সামনে থেকে সরে গেল।

২৩

রতন বাবুর কণ্ঠস্বর যখন হলঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, তখন তা কেবল একটি মানুষের বক্তব্য ছিল না; তা ছিল জ্ঞানের এক হল্কা, যা হলঘরের কৃত্রিম শোকের আবহাওয়াকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। তিনি যখন সহজ, কিন্তু গভীর ভাষায় রামায়ণ থেকে আদর্শ জীবন ও কর্তব্যের কথা বলছিলেন, কিংবা উপনিষদ থেকে ব্রহ্ম ও আত্মার সরল ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন, সনাতন ও বিজ্ঞানের উপমা দিচ্ছিলেন—যে জ্ঞান বামপন্থীরা তথাকথিত 'মুক্তচিন্তার' নামে ভুলে গিয়েছিল—তখন সাধারণ মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। তাদের কাছে রতনবাবু যেন হারিয়ে যাওয়া প্রজ্ঞার পুনরুদ্ধারকারী।

তারা প্রথমবার অনুভব করল, ধর্ম কেবল পূজা-অর্চনা বা বাধ্যতামূলক আচার নয়, এর গভীরে রয়েছে হাজার বছরের দর্শন—অনুসন্ধানী বিজ্ঞান। যেখানে আত্মা, কর্তব্য এবং সমাজের বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। রতন বাবুর ব্যাখ্যায় কোনো জটিলতা ছিল না, ছিল কেবল স্বচ্ছ সত্য।

কিন্তু এই সত্য বামপন্থী নেতাদের জন্য ছিল তীব্র অস্বস্তির কারণ। তাঁদের নিজেদের আদর্শের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে পড়ল। তাঁদের রাজনৈতিক স্লোগানগুলো রতন বাবুর মতো এক ঋজু শিক্ষকের প্রজ্ঞার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। তারা দেখল, এতকাল তারা যে তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ দেখিয়ে এসেছে, তা এখন হাস্যকর মনে হচ্ছে।

এই অস্বস্তির মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে, আর এক যুবনেতা অরবিন্দ, যার কণ্ঠে কিছুক্ষণ আগেও ছিল বামপন্থী বাগাড়ম্বর, তিনি এবার প্রতিবাদ করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল কিছুটা ভেঙে পড়া এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট।

অরবিন্দ তীব্র স্বরে কিন্তু চাপা বিরক্তি নিয়ে বললেন, "স্যার, আপনি এই শোক সভাকে

ধর্মীয় প্রোপাগান্ডার মঞ্চ বানাচ্ছেন। আমাদের কমরেড তপন দেশের সেবায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিদেশী মতাদর্শ নয়, বরং শোষিত মানুষের মুক্তি চাইতেন। আপনি ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে গণ-মঞ্চে তুলে ধরছেন।"

রতনবাবু অরবিন্দের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে ছিল করুণা, উপহাসের নয়। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এই তরুণরা কেবল ভুল শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি হাসলেন, সেই হাসি ছিল যেন প্রজ্ঞার শান্ত দীপ্তি।

"দেশের সেবা! তোমরা কোন দেশের সেবার কথা বলছো? যে মতাদর্শ দেশের রীতিনীতিকে অবজ্ঞা করতে শেখায়, পরিবারকে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে, তাকে দেশের সেবা বলো? দেশ কেবল ভূখণ্ড নয়, দেশ হলো সংস্কৃতি, পরম্পরা, আর আত্মিক বন্ধন। তোমরা সেই বন্ধন ভাঙতে চাও। তোমাদের 'দেশপ্রেম' মূলত একটি রাজনৈতিক স্লোগান—একটি ফাঁকা বুলি—যার গভীরে নেই কোনো দায়বদ্ধতা। তোমরা সমাজকে কেবল বস্তু, টাকা ও ক্ষমতা দিয়ে মাপতে শিখেছো, কিন্তু আত্মা ও কর্তব্যকে ভুলে গেছো।"

রতন বাবুর এই জবাব ছিল চূড়ান্ত এবং অকাট্য। তিনি বোঝালেন, রাজনৈতিক আদর্শের নামে যা চলছে, তা হলো দায়িত্বহীনতা। যদি কেউ সত্যিই দেশকে ভালোবাসে, তবে সে দেশের সংস্কৃতি ও আত্মাকেও ভালোবাসবে—তাকে অস্বীকার করবে না। রতন বাবুর যুক্তি এতই শক্তিশালী ছিল যে, হলঘরের বাকি বামপন্থী অনুসারীরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। তারা বুঝলেন, তাদের নেতা কেবল তর্কের খাতিরে তর্ক করছেন, কিন্তু রতনবাবু সত্যের পক্ষে কথা বলছেন।

২৪

রতন বাবুর এই সরাসরি ও নির্মম আক্রমণ অনেকে সহ্য করতে পারল না। তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনো উচ্চতা ছিল না, ছিল কেবল দার্শনিক সত্যের তীক্ষ্ণতা, যা বামপন্থীদের বহুদিনের সাজানো দম্ভকে মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দিল। শ্যামল বাবু এবং যুবনেতা অরিন্দম, যারা নিজেদের এতকাল আদর্শের ধারক মনে করত, তারা দেখল—তাদের এই আদর্শের কোনো আত্মিক শক্তি নেই। তাদের যুক্তি ছিল ধার করা, যা বিদেশি বইয়ের পাতা থেকে নেওয়া; আর রতন বাবুর যুক্তি ছিল মাটি থেকে উঠে আসা, যা হাজার বছরের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত।

তাদের মনে হলো, রতনবাবু কেবল একজন ব্যক্তির সমালোচনা করছেন না, তিনি যেন তাদের জীবনের মূল ভিত্তিটাকেই প্রশ্ন করছেন। তাদের মুখগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আর তাদের চোখ একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল—সেখানে ছিল দ্বিধা, লজ্জা এবং পরাজয়ের স্পষ্ট ছাপ।

বামপন্থী মনোভাবাপন্নরা আর এক মুহূর্তও হলঘরে থাকতে পারল না। তারা অনুভব করল, তাদের রাজনৈতিক স্লোগান এখন কেবল ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তারা দেখল, রতন বাবুর যুক্তির সামনে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিপন্ন।

প্রথমে শুরু করলেন শ্যামল বাবু। তিনি কাঁপা গলায় রতন বাবুর দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত ঘোষণা করলেন, "জরুরী মিটিং আছে," এবং দ্রুত হল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এরপর একে একে অন্য কমরেডরা সেই একই অজুহাত দিতে শুরু করলেন। কেউ বলল, "কাজ আছে," কেউ বা বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।" এই 'কাজ আছে' বা 'জরুরী মিটিং আছে'-এর অজুহাতে হল ছেড়ে তাড়াতাড়ি পালাতে শুরু করলেন। তাদের এই পলায়ন ছিল আদর্শের পরাজয় ও যুক্তির কাছে আত্মসমর্পণের প্রতীক। তারা প্রবীণ শিক্ষকের শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও দৃঢ় যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারল না। যে আদর্শ কেবল জোর আর স্লোগানের ওপর নির্ভর করত, তা জ্ঞানের আলো সহ্য করতে পারল না।

সবিতা দেবী নীরব হয়ে এই দৃশ্য দেখলেন। তাঁর চোখে ছিল না কোনো বিদ্বেষ, ছিল কেবল নীরব সত্যের জয় দেখে এক গভীর স্বস্তি।

কমরেডদের এই পলায়ন সাধারণ মানুষের মধ্যে সমর্থন আরও বাড়াল। তারা এতকাল যে রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করেছিল, আজ তারা দেখল—সেই চাপ সৃষ্টিকারীরাই যুক্তির কাছে দুর্বল। তাদের পালানো ছিল গণ-স্বীকৃতি যে, রতন বাবুই সঠিক পথে আছেন।

হলঘর দ্রুত বামপন্থীদের থেকে মুক্ত হয়ে গেল। যারা এতদিন দ্বিধায় ছিল, তারা এবার রতন বাবুর দিকে এগিয়ে এলো। তারা তাঁকে ঘিরে ধরল, যেন তিনি অন্ধকারে পথ দেখানো এক আলোকবর্তিকা। মানুষজন রতন বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে লাগল। কেউ কেউ আবেগে তাঁর হাত ধরে বলতে লাগল, "স্যার, আপনি আজ আমাদের চোখের ঠুলি খুলে দিলেন।"

এই মুহূর্তটি ছিল আদর্শ আবাসনের ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী দৃশ্য। রাজনৈতিক স্লোগানের মঞ্চ রূপান্তরিত হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক পাঠশালায়। মানুষ বুঝতে পারল, তাদের জীবনের আত্মিক শূন্যতা পূরণ করতে পারে কেবল এই মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকা সনাতন জ্ঞান।

২৫

এতক্ষণ সবিতা দেবী মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখ দেখছিল না বাইরের দৃশ্য, দেখছিল ভেতরের দীর্ঘদিনের নীরব যন্ত্রণা। রতন বাবুর প্রতিটি কথা তাঁর দীর্ঘদিনের মানসিক দ্বন্দ্বের দেওয়াল ভেঙে দিচ্ছিল। এই দেওয়াল তৈরি হয়েছিল স্বামীর আদর্শিক কঠোরতা এবং নিজের গভীর বিশ্বাসের মধ্যে।

তিনি কাঁদছিলেন। এই অশ্রু কেবল স্বামীর মৃত্যুশোকের নয়, এই অশ্রু ছিল মুক্তির। তাঁর স্বামীর প্রতি ভালবাসা ছিল গভীর, কিন্তু তাঁর আদর্শের চাপিয়ে দেওয়া কঠোরতা তাঁকে সবসময় কষ্ট দিত। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে ভালবাসলেও, তাঁর আদর্শ তাঁকে কখনো মানুষ হিসেবে সম্মান দেয়নি, তাঁকে কেবল কমরেডের স্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়েছিল—এক রাজনৈতিক যন্ত্রের অংশ হিসেবে। তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর নিজস্ব আত্মিক চাহিদা—সবই ছিল সেই আদর্শের কাছে তুচ্ছ।

আজ রতন বাবুর কথা শুনে তাঁর দীর্ঘদিনের মানসিক দ্বন্দ্ব দূর হলো। তিনি বুঝলেন—স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অর্থ নিজের ধর্ম ও কর্তব্যকে অস্বীকার করা নয়। বরং, স্বামীর প্রতি আসল কর্তব্য হলো তাঁকে সেই আত্মিক মুক্তির পথ দেখানো, যা তিনি জীবদ্দশায় অস্বীকার করেছিলেন। সবিতা উপলব্ধি করলেন, শ্রাদ্ধ কেবল সমাজের নিয়ম নয়, এটি স্ত্রীরও শেষ কর্তব্য, যা স্বামীকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি দিতে পারে। স্বামীর আদর্শের চাপ তাঁকে ভুল পথে চালিত করছিল, কিন্তু সনাতন জ্ঞানের আলো তাঁকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনল।

বাইরে তখন কমরেডদের পলায়ন, আর সাধারণ মানুষের গুঞ্জন। শোকসভা শেষ হলো। হলঘরে এখন কেবল সবিতা দেবী, রীতা আর রতন মণ্ডল। রতনবাবু সবিতা ও রীতার দিকে ফিরলেন। তাঁর চোখে ছিল গভীর মানবিকতা।

"মা সবিতা" তিনি শান্ত, কিন্তু গম্ভীর গলায় বললেন, "তপনের আত্মা আজ শান্তি চাইছে। সে জীবদ্দশায় যা-ই ভাবুক না কেন, এই মাটির গভীরে, এই দেশের ঐতিহ্যে তার শেষ মুক্তি লুকিয়ে আছে। এই তথাকথিত 'মুক্তচিন্তা' তোমাদের কেবল ব্যক্তিগত শূন্যতা ছাড়া কিছু দেবে না। তারা ব্রহ্ম কী, আত্মা কী—এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। তুমি শ্রাদ্ধের মাধ্যমে তোমার কর্তব্য পালন করো। মনে রেখো, আত্মা এবং কর্মফল তোমাদের স্লোগান বা আদর্শের কাছে কোনো জবাবদিহি করবে না।"

রতন বাবুর কথায় যেন সবিতা দেবী তাঁর দীর্ঘদিনের পাপবোধ থেকে মুক্তি পেলেন। তিনি মাথা নিচু করে রইলেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে পবিত্র অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এ অশ্রু ছিল মুক্তির, এ অশ্রু ছিল সিদ্ধান্তের। দীর্ঘকাল পর তাঁর ভেতরের ধর্মীয় মানুষটি মাথা তুলে দাঁড়াল।

কন্যা রীতাও এই দৃশ্যের নীরব সাক্ষী। বাবার দলের সিদ্ধান্তের প্রতি তার অন্ধ বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছিল। সে দেখল, বাবার আদর্শের জন্য নয়, বরং মায়ের দীর্ঘদিনের অবদমিত বিশ্বাস আজ জয়ী হলো। সে প্রথমবারের মতো বুঝল, তার বাবার আদর্শিক কঠোরতা মাকে কতটা কষ্ট দিয়েছে। তার চোখও অশ্রুসিক্ত হলো। রীতা বুঝল, মানুষের

অনুভূতি ও আত্মার চাহিদাকে অস্বীকার করে কোনো আদর্শ টিকে থাকতে পারে না। সে নীরবভাবে মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল, যেন বাবার আদর্শের পথ ছেড়ে মায়ের বিশ্বাসের পথে সেও যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত।

২৬

রতন বাবুর শান্ত সান্ত্বনা ও দার্শনিক প্রজ্ঞা সবিতা দেবীকে এক নতুন শক্তি জোগাল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, চোখ মুছলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে শোকের বিষাদের চেয়ে বেশি ছিল কর্তব্য পালনের এক দৃঢ় সংকল্প। যে নারী এতদিন স্বামীর আদর্শের চাপে কুণ্ঠিত ছিলেন, আজ তিনি মুক্ত।

তিনি হলঘরের দরজার দিকে তাকালেন। বাইরে তখনো আবাসনের অন্য বাসিন্দারা অপেক্ষায় ছিলেন। তাদের চোখে ছিল আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা—তারা জানতে চাইছিলেন, এরপর কী হবে। সবিতা যেন তাদের মনের কথা বুঝতে পারলেন।

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ডাকলেন, "আপনারা ভেতরে আসুন, সবাই!"

বাইরের লোক ভেতরে প্রবেশ করলে হলঘর আবার ভরে উঠল। সবিতা তখন দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রতন বাবুর দিকে হাতজোড় করে তাকালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল শান্ত, কিন্তু মহৎ।

"শিক্ষক মহাশয়," তিনি বললেন, "আপনি আজ আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আমরা ভুলের পথে যাচ্ছিলাম। স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমরা নিজেদের সনাতন কর্তব্য ভুলে যাচ্ছিলাম। আমরা ভাবছিলাম, শ্রাদ্ধ কেবল অর্থহীন আচার; কিন্তু আপনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন, এটি হলো মুক্তি ও পরম্পরার পথ।"

এরপর তিনি সরাসরি জনতার দিকে ফিরলেন। তাঁর চোখে ছিল না কোনো ভয়, ছিল মুক্ত বিশ্বাসের দৃঢ়তা।

"আমি তপন বাবুর আত্মার শান্তির জন্য, এবং আমাদের নিজস্ব শান্তির জন্য শ্রাদ্ধের আয়োজন করব। আমার স্বামী যে আদর্শকে শেষ সত্য মনে করতেন, তা তাঁকে মুক্তি দিতে পারল না। আমি আপনাদের সবার সহযোগিতা চাই—যেন আমরা এই পবিত্র কর্তব্যটি যথাযথভাবে পালন করতে পারি।"

সবিতা দেবীর এই সাহসী ঘোষণা আবাসনের জনতাকে যেন এক নতুন প্রাণশক্তি দিল। হলঘরে সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট উল্লাসের ঢেউ আছড়ে পড়ল। তাদের এতদিনকার চাপা থাকা আবেগ যেন মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফোরিত হলো।

জনতা রতন বাবুর শাস্ত্র জ্ঞান ও অটল দৃঢ়তার প্রশংসা করতে লাগলেন। তারা দেখল, তাদের ভয় দেখিয়ে রাখা বামপন্থীদের 'ভণ্ডামি'র মুখোশ খুলে গেছে—তাদের আদর্শ যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারেনি। মানুষজন

করতালি দিয়ে রতনবাবু ও সবিতা দেবীকে সমর্থন জানালেন। তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস ছিল বস্তুবাদ ও রাজনৈতিক চাপের বিরুদ্ধে আত্মার স্বাধীনতার এক বিজয়োল্লাস।

এক প্রবীণ বাসিন্দা এগিয়ে এসে সবিতা দেবীকে আশীর্বাদ করলেন। তিনি বললেন, "মা, তুমি শুধু তপন বাবুর শ্রাদ্ধ করছো না, তুমি আমাদের সবার বিসর্জন দেওয়া সংস্কৃতিকে আবার ফিরিয়ে আনছো। তুমি আজ আমাদের গৌরব ফিরিয়ে দিলে।"

সবিতা দেবীর এই ঘোষণা কেবল একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না। এটি ছিল আদর্শ আবাসনের বুকে সনাতন পথের এক বিজয়ী প্রত্যয়। যে আবাসন এতদিন বামপন্থী আদর্শের আবর্তে আটকে ছিল, আজ তা সনাতন পথের এক নতুন আবর্তে প্রবেশ করল। সবিতা যেন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর আদর্শের কারাগারে বন্দি ছিলেন, আর আজ স্বামীর মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি নিজের আত্মাকে মুক্ত করলেন।

২৭

সবিতা দেবীর দৃঢ় ও সাহসী ঘোষণাটি আদর্শ আবাসনের পরিবেশে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল। হলঘরের বাতাস থেকে শোকের ভারী ভাব কেটে গিয়ে সেখানে এক নতুন শক্তির উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ল। সবিতা দেবীর সিদ্ধান্ত ছিল কেবল একজন বিধবার ব্যক্তিগত কর্তব্য পালন নয়, এটি ছিল বামপন্থী মতাদর্শের দীর্ঘদিনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ। তিনি যেন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর মঞ্চটিকে ব্যবহার করলেন রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মিক স্বাধীনতার মঞ্চ হিসেবে।

এই ঘোষণা বামপন্থী মহলে ক্রোধ ও হতাশার সঞ্চার করল। কমরেড নেতা শ্যামলবাবু ও অরিন্দম, যারা হল ছেড়ে দ্রুত পালিয়েছিলেন, তারা বাইরে অপেক্ষমাণ আরও কিছু কমরেডের কাছে খবরটা দিলেন। তাদের মুখগুলো ছিল পরাজিত সেনাপতির মতো। তারা বুঝতে পারল, তাদের রাজনৈতিক 'নিয়মের' কাছে হার মেনেছে সনাতন পথের প্রজ্ঞা। তাদের আদর্শের ভিত্তি ছিল বস্তুগত যুক্তি; আর রতনবাবু সেই ভিত্তিকে আত্মিক সত্য দিয়ে নড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের সমস্ত চেষ্টা ছিল ব্যর্থ—তপন বাবুর মৃত্যুও তাদের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল না।

কিন্তু সাধারণ মানুষ এই সিদ্ধান্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে সবিতা দেবীর পাশে দাঁড়ালেন। তাদের চাপা থাকা বিশ্বাস ও আবেগ যেন মুক্তির পথ পেল। এতদিন তপন বাবু ও তাঁর অনুসারীদের চাপে তারা যে দ্বিচারী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছিল, সেই গ্লানি থেকে তারা মুক্তি পেল।

আবাসনের একজন প্রবীণ বাসিন্দা, যিনি এতদিন তপন বাবুর সমালোচনার ভয়ে নিজের পূজা পর্যন্ত লুকিয়ে করতেন, তিনি

আবেগের সঙ্গে সবিতা দেবীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল শ্রদ্ধায় আর্দ্র। তিনি বললেন, "এই হল বামপন্থীদের স্বরূপ! আদর্শের নামে সবকিছুতে নাক গলানো! আজ সবিতা দি সঠিক কাজ করেছেন। এই শ্রাদ্ধ কেবল তপনবাবুর জন্য নয়, আমাদের সবার আত্মার শান্তির জন্য।"

তাঁর এই কথা যেন অনেকের মনের কথা। এই শ্রাদ্ধ ছিল কেবল আত্মার মুক্তি নয়, বরং ঐতিহ্যের পুনরুত্থান। মানুষ বুঝতে পারল, 'মুক্তচিন্তা'র নামে তারা নিজেদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক স্লোগান তাদের শূন্যতা পূরণ করতে পারেনি। এখন তারা দেখল, সনাতন ঐতিহ্য কেবল প্রাচীন রীতিনীতি নয়, তা হলো জ্ঞান, কর্তব্য এবং পারিবারিক বন্ধনকে ধরে রাখার এক শক্তিশালী আবর্ত। আবাসনজুড়ে তখন শ্রাদ্ধের আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে এক নতুন কর্মচাঞ্চল্য শুরু হলো, যা শোকের চেয়েও বেশি ছিল মুক্তির উৎসবের মতো।

২৮

শ্রাদ্ধের আয়োজন শুরু হলো। এই আয়োজনের দায়িত্ব এখন আর কেবল সবিতা দেবীর নয়, এটি যেন আদর্শ আবাসনের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এই নতুন সামাজিক সমর্থনের ফলে সবিতা দেবী যেন এক নতুন শক্তিতে বলীয়ান হলেন। তিনি জানতেন, এই পথে তাঁর নৈতিক ও শাস্ত্রীয় দিকনির্দেশনার প্রয়োজন। তাই তিনি সরাসরি প্রফেসর রতন বাবুর কাছে গেলেন।

রতনবাবু সবিতা দেবীকে দেখে বুঝলেন, তাঁর প্রয়োজন কেবল সাহায্য নয়, প্রজ্ঞার আশ্রয়। তিনি সবিতা দেবীকে নৈতিক সমর্থন এবং শাস্ত্রীয় দিকনির্দেশনা দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল স্নেহের, কিন্তু বক্তব্যে ছিল জ্ঞানের গভীরতা। তিনি সবিতা দেবীকে বোঝালেন:

"মা সবিতা, এটি কেবল একটি সামাজিক অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি পবিত্র যজ্ঞ। 'শ্রদ্ধয়া দীয়তে ইতি শ্রাদ্ধম্'—যা শ্রদ্ধা সহকারে দেওয়া হয়, তাই শ্রাদ্ধ। এটি কোনো জোর-জুলুমের প্রথা নয়, এটি হৃদয়ের নৈবেদ্য। শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে করলে এর ফল নিশ্চিত। আপনি কোনো কুসংস্কার করছেন না, বরং সনাতন পরম্পরার প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করছেন। আপনার স্বামীর আত্মা আজ মুক্তি চাইছে, এবং এই কাজটি সেই মুক্তির পথ দেখাবে।"

রতন বাবুর কথায় সবিতা দেবীর আত্মবিশ্বাস ফিরল। তিনি যেন প্রথমবারের মতো বুঝতে পারলেন—ধর্ম কেবল বিশ্বাস নয়, এটি কর্তব্য এবং বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। স্বামীর আদর্শ তাঁকে শেখাত—'বিশ্বাস করো না, প্রশ্ন করো'। আর রতনবাবু তাঁকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যা কেবল যুক্তি দিয়েই নয়, আত্মার গভীরের শান্তি দিয়েও প্রমাণিত।

রতনবাবু তাঁর নিজের পরিচিতি এবং গভীর জ্ঞান ব্যবহার করে সবিতা দেবীকে শাস্ত্রীয় কাজের জন্য সঠিক ব্রাহ্মণের সন্ধান দিলেন। তিনি এমন একজন ব্রাহ্মণকে আনলেন যিনি কেবল মন্ত্রপাঠের যান্ত্রিকতা মানতেন না, বরং মন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জানতেন।

রতনবাবু নিজে সবিতা দেবীকে এবং রীতাকে সমস্ত রীতিনীতির তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত কারণ বুঝিয়ে দিলেন। কেন এই তিথি, কেন এই সামগ্রী, কেন এই মন্ত্র—প্রতিটির পেছনে লুকিয়ে থাকা দার্শনিক ভিত্তি সবিতা মন দিয়ে শুনলেন। তিনি বুঝলেন, শ্রাদ্ধ হলো পঞ্চভূতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, এবং পিণ্ডদান হলো শরীরী জীবনের প্রতি আত্মার শেষ নিবেদন।

সবিতা দেবী যেন এক নতুন জীবন পেলেন। এতদিন স্বামীর আদর্শের চাপে তাঁর ধার্মিক মনটি শুষ্ক মরুভূমির মতো হয়ে গিয়েছিল, আজ তা যেন জ্ঞানের বারিধারায় সিক্ত হলো। তাঁর মুখমণ্ডলে এখন আর শোকের বিষাদ নেই, বরং কর্তব্য পালনের এক শান্ত দীপ্তি ফুটে উঠল—যা তাঁকে অভ্যন্তরীণ শান্তি এনে দিল।

কন্যা রীতাও এই পরিবর্তনের সাক্ষী ছিল। সে দেখল, বাবার আদর্শ মাকে কেবল শূন্যতা দিয়েছে, আর সনাতন জ্ঞান মাকে দিয়েছে স্থিতি ও শক্তি। সে দ্বিধা ঝেড়ে মায়ের পাশে দাঁড়াল। সে বুঝতে পারল, তথাকথিত 'প্রগতি'র চেয়ে পরম্পরার মূল্য অনেক বেশি—কারণ পরম্পরা কেবল পুরনো নয়, তা স্থিতিশীল এবং জীবনের গভীরতম সত্যের সঙ্গে যুক্ত। আদর্শ আবাসন এখন ধীরে ধীরে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিকে তার যাত্রা শুরু করল।

২৯

শ্রাদ্ধের তারিখ যত ঘনিয়ে আসছিল, আদর্শ আবাসনে আদর্শিক যুদ্ধ তত তীব্র হচ্ছিল। বামপন্থী মহল গোপনে বাধা দেওয়ার শেষ চেষ্টা শুরু করল। তারা জানত, সবিতা দেবীর এই শ্রাদ্ধের আয়োজন কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি তাদের আদর্শের প্রতি জনসাধারণের বিতৃষ্ণার প্রতীক। তাই তারা পর্দার আড়াল থেকে তাদের পুরনো রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করতে শুরু করল।

তাদের নেতারা—যারা রতন বাবুর যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারেনি—তারা এখন আবাসনের সাধারণ মানুষদের কাছে ফিসফিস করে খবর ছড়াতে থাকল। তারা বলতে থাকল, 'শ্রাদ্ধের নামে অর্থ আত্মসাৎ হচ্ছে,' 'এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের কাজ,' এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, 'কমরেড তপনের আদর্শকে অপমান করা হচ্ছে'। তারা তাদের রাজনৈতিক ভণ্ডামি ব্যবহার করে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইল, যাতে সাধারণ মানুষ সবিতা দেবীকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে। তারা চেয়েছিল,

সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে সবিতা দেবীর ইচ্ছাকে নস্যাৎ করতে।

কিন্তু এইবার তাদের সেই কৌশল ব্যর্থ হলো। কারণ, তাদের বিপক্ষের শক্তিটি ছিল রতন মণ্ডল। রতনবাবু কেবল শ্রাদ্ধের নির্দেশনাই দেননি, তিনি নিজে পুরো বিষয়টির তত্ত্বাবধান শুরু করলেন। রতন বাবুর অটল উপস্থিতি এবং তাঁর শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস বামপন্থীদের সমস্ত চক্রান্তকে নিষ্ক্রিয় করে দিল।

মানুষ জানত, রতন বাবুর মতো প্রজ্ঞাবান ও সৎ মানুষ কোনো অর্থ আত্মসাতের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না। রতনবাবু নিজেই বিভিন্ন ফ্ল্যাটে গিয়ে স্পষ্ট করে জানালেন, শ্রাদ্ধের পিছনে যে খরচ হচ্ছে, তা সবিতা দেবী স্বেচ্ছায় করছেন। তিনি আরও বোঝালেন, শ্রাদ্ধের অর্থ কেবল পুরোহিতের দক্ষিণা নয়, এটি সামাজিক দায়বদ্ধতা—গরিবদের অন্নদান, ব্রাহ্মণদের দান, এবং পারিবারিক ঐতিহ্যকে রক্ষার পবিত্র ব্যয়।

রতন বাবুর প্রতিটি ব্যাখ্যা ছিল যুক্তিনির্ভর। তিনি বামপন্থীদের এই আর্থিক সমালোচনার জবাবে বলেন, "তোমরা তোমাদের রাজনৈতিক সভার জন্য যে অর্থ ব্যয় করো, তা কি সমাজের কোনো কাজে লাগে? কিন্তু শ্রাদ্ধের অর্থ একটি বৃহৎ সামাজিক চক্র তৈরি করে, যা দাতব্য এবং আত্মিক শান্তির পথ দেখায়।"

বামপন্থীরা যখন যুক্তি দিতে পারল না, তখন তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে গেল। মানুষ বুঝল, তাদের আসল উদ্দেশ্য শ্রাদ্ধ থামানো নয়, বরং আবাসনে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করা। তাদের নেতা শ্যামল বাবু ও অরিন্দম বাবু বুঝলেন, এইবার তাদের জনসমক্ষে আসা বৃথা। তাদের পুরনো কৌশল আর কাজ করছে না। রতন বাবুর জ্ঞান ও নৈতিক দৃঢ়তা তাদের সমস্ত চক্রান্তের চেয়ে ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী।

বামপন্থীদের অন্তর্ঘাত ব্যর্থ হলো। শ্রাদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকল অদম্য উৎসাহে। আদর্শ আবাসন যেন প্রথমবার রাজনৈতিক ভয়ের বাঁধন ভেঙে ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের স্রোতে গা ভাসাল।

৩০

অবশেষে এলো সেই পবিত্র দিন—যে দিনটিকে বামপন্থীরা 'কুসংস্কার' বলে বাতিল করতে চেয়েছিল, কিন্তু আবাসনবাসী ফিরিয়ে এনেছিল ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে। শ্রাদ্ধের দিন আদর্শ আবাসন এক অন্য রূপে দেখা দিল। গোটা আবাসন জুড়ে ছিল এক শুভ্র ও নির্মল পরিবেশ। প্রবেশদ্বার থেকে হলঘর পর্যন্ত শ্বেতশুভ্র সাজ, ভক্তি ও পবিত্রতার আবহ যেন এক অলৌকিক শান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ফ্ল্যাটগুলির বিলাসবহুল দেওয়াল, যা এতদিন বস্তুবাদের দম্ভ বহন করত, তা যেন এই আচার-অনুষ্ঠানের মহিমায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

আবাসনের সাধারণ মানুষজন স্বেচ্ছায় এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের চোখে ছিল আবেগ ও আন্তরিকতা। এই দৃশ্য ছিল আদর্শের সংঘাতের চূড়ান্ত মীমাংসা। বামপন্থী গোষ্ঠী সেই দিন কার্যত হলঘরের ধারে কাছেও আসেনি। তাদের পরাজয় ছিল নীরব এবং নিশ্চিত। তারা বুঝতে পারল, তাদের আদর্শ আর এই আবাসনের মানুষের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাদের অনুপস্থিতি ছিল সবিতা দেবীর সিদ্ধান্তের সর্বজনীন স্বীকৃতির প্রতীক।

প্রফেসর রতনবাবু এবং সঠিক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রীয় রীতিনীতি মেনে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হলো। সবিতা নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত কর্তব্য পালন করলেন। তিনি প্রতিটি মন্ত্রের অর্থ, প্রতিটি আচারের তাৎপর্য বুঝতে পারছিলেন—যা রতনবাবু তাঁকে শিখিয়েছিলেন। এই কাজটি ছিল তাঁর কাছে কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং স্বামীর আত্মার প্রতি তাঁর শেষ নিবেদন।

শ্রাদ্ধ শেষে, যখন তিনি পিণ্ডদান করলেন এবং পিতৃপুরুষের শান্তি কামনা করলেন, তখন তাঁর ভেতরের সমস্ত বাঁধ ভেঙে গেল। তাঁর চোখ থেকে এবার আর দুঃখের জল নয়, ঝরছিল কর্তব্যের পবিত্রতা পালনের তৃপ্তির অশ্রু। এই অশ্রু ছিল ভারমুক্তির, ছিল আত্মিক শান্তির।

তিনি অনুভব করলেন, তপন বাবুর আত্মার মুক্তি হলো কি না তিনি জানেন না, তবে তাঁর নিজের আত্মা মুক্তি পেল—মুক্ত হলো দীর্ঘদিনের আদর্শিক দ্বন্দ্বের চাপ থেকে। তিনি আর স্বামীর রাজনৈতিক আদর্শের কাছে বন্দী নন। তিনি আবার তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস ও কর্তব্যের পথে ফিরে এসেছেন। সবিতা দেবী অনুভব করলেন এক অভূতপূর্ব মানসিক শান্তি—যে শান্তি কোনো স্লোগান বা রাজনৈতিক তর্কে পাওয়া যায় না, তা কেবল ধর্ম ও কর্তব্যের গভীরে নিহিত।

৩১

শ্রাদ্ধের সমাপ্তির পর হলঘরে এক অভূতপূর্ব নীরবতা নেমে এলো। এই নীরবতা শোকের নয়, বরং ছিল আত্মিক তৃপ্তির। তপন বাবুর আদর্শবাদী বন্ধুরা পালিয়ে যাওয়ার পর, হলঘরে এখন শুধু সেই সাধারণ মানুষজন, যারা এতদিন আদর্শগত চাপের শিকার ছিলেন।

শ্রাদ্ধের আচার-অনুষ্ঠান শেষে, সাধারণ মানুষ দল বেঁধে রতন বাবুর কাছে গেলেন। তাদের মুখে ছিল অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা এবং জানার এক তীব্র আগ্রহ। তারা বুঝতে পারল, তাদের জীবনের যে শূন্যতা ছিল—যা তথাকথিত 'আদর্শ আবাসন'-এর বিলাসী জীবন দিয়েও পূরণ হচ্ছিল না—তা কেবল ভালো চাকরি, ভালো ফ্ল্যাট বা রাজনৈতিক স্লোগানে পূরণ হবে না।

এই শূন্যতা পূরণের একমাত্র পথ হলো জ্ঞান।

এই উপলব্ধি থেকেই সবাই মিলে রতন বাবুর কাছে এক আন্তরিক আবেদন রাখলেন। একজন প্রবীণ বাসিন্দা, যিনি আবাসনের কোষাধ্যক্ষও ছিলেন, তিনি রতন বাবুর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, "স্যার, আপনি আজ আমাদের চক্ষু খুলে দিলেন। আমরা এতদিন ভেবেছি ধর্ম মানে কেবল ritual, কিন্তু আজ বুঝলাম এর গভীরে রয়েছে দর্শন। আমাদের ভুল ভাঙাতে, আমাদের আত্মিক জ্ঞান দিতে আপনি প্রতি সপ্তাহে একটি পাঠচক্র শুরু করুন।"

অন্য একজন আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, "হ্যাঁ স্যার! আমরা ঈশ্বর, ব্রহ্ম, ভুমা, আত্মা, মুনি-ঋষি, আমাদের ধর্মগ্রন্থ—এসব সম্পর্কে জানতে চাই। আমাদের জীবনের শূন্যতা শুধু রাজনীতির স্লোগানে পূরণ হবে না, তা পূরণ হবে জ্ঞানের আলোয়। আমাদের প্রজন্ম তাদের শিকড় ভুলতে বসেছে। আপনি আমাদের পথ দেখান।"

তাদের এই আবেদন ছিল আদর্শ আবাসনের আত্মার সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। তারা এখন আর শোষক বা শোষিতের তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়, তারা সত্য ও জ্ঞানের সন্ধানে ব্রতী।

রতনবাবু তাঁদের এই আগ্রহ দেখে সানন্দে রাজি হলেন। তিনি জানতেন, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তিনি কোনো রাজনৈতিক দল তৈরি করেননি, কেবল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো জ্বালিয়েছেন।

তিনি হাসিমুখে বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে এই জিজ্ঞাসা দেখতে পেয়ে আনন্দিত। এই জ্ঞান আমাদের শিকড়ের শক্তি। হ্যাঁ, আমি প্রতি সপ্তাহে পাঠচক্র শুরু করব। তবে এটি কেবল আমার বক্তৃতা হবে না, এটি হবে জিজ্ঞাসা ও মননের আড্ডা।"

রতনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তপন বাবুর সামান্য শোক সভা একটি বৃহৎ আদর্শগত পরিবর্তনের বীজ বপন করে গেল। কমরেডদের রাজনৈতিক ফতোয়া পরিণত হলো সনাতন দর্শনের পাঠশালায়। আদর্শ আবাসন তার 'সনাতন পথের দিশা' খুঁজে পেল। এখন থেকে এই আবাসনে রাজনৈতিক সংঘাত নয়, শুরু হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক নতুন আবর্ত, যেখানে মানুষ নিজেদের আত্মাকে চিনতে শিখবে। এই আবর্ত কেবল সবিতা দেবীর এবং রীতার জীবনকেই নয়, পুরো সমাজকেই এক নতুন পথে চালিত করার প্রতিশ্রুতি দিল।

৩২

শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের পরের রবিবার। আদর্শ আবাসনে রাজনৈতিক স্লোগানের মঞ্চকে বিদায় জানিয়ে জ্ঞানের আসর বসার দিন। আবাসনের 'শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি'-তে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হলো। এই কক্ষটি, যা এতদিন বেশিরভাগ সময়ই নীরব থাকত, আজ এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠেছে।

পাঠচক্রের প্রথম দিন—এবং উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি। লাইব্রেরির ছোট হলঘরে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ উপস্থিত। চেয়ার না পেয়ে অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অনেকে মেঝেতে আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই ভিড় ছিল রাজনৈতিক সমাবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা বামপন্থী নেতাদের ভয়ে এতদিন নিজেদের আবেগ ও জিজ্ঞাসা লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাদের চোখে ছিল কেবল কৌতূহল নয়, ছিল জানার এক তীব্র আগ্রহ—যেন বহুদিনের তৃষ্ণার্ত মানুষ জলের সন্ধান পেয়েছে। তারা বুঝতে পারছিল, তাদের জীবনের গভীরে লুকিয়ে থাকা শূন্যতা আজ হয়তো পূরণের পথ পাবে।

সবিতা দেবী এবং রীতা প্রথম সারিতে বসে। সবিতা দেবীর মুখমণ্ডলে এখন আর স্বামীর আদর্শের চাপ নেই, আছে মুক্তি এবং নতুন করে শেখার এক বিনয়ী ভাব। তাঁর চোখ শান্ত, আত্মবিশ্বাসী। তিনি যেন তাঁর দীর্ঘদিনের আত্মিক বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এই পাঠচক্র তাঁর কাছে কেবল একটি ক্লাস নয়, বরং আত্ম-অনুসন্ধানের এক পবিত্র যাত্রা।

কন্যা রীতাও এই নীরব বিপ্লবের সাক্ষী। বাবার ফেলে যাওয়া আদর্শের শূন্যতা এখন তার কাছে স্পষ্ট। সে দেখল, যুক্তি দিয়ে মানুষকে জয় করা যায়, কিন্তু শান্তি ও মুক্তি মেলে না। সে এখন মাটির মানুষের পাশে বসে, মায়ের পাশে বসে সেই শূন্যতা পূরণের পথ খুঁজছে। রীতার উপস্থিতি ছিল পুরনো আদর্শের প্রতি নতুন প্রজন্মের বিদ্রোহের প্রতীক।

ঠিক যখন সবাই নিজেদের আসনে স্থির, তখন প্রফেসর রতনবাবু সবার মাঝে এসে বসলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল প্রশান্ত, সহজ এবং আন্তরিক। তাঁর চোখে কোনো অধিকারবোধ ছিল না, ছিল কেবল স্নেহ ও প্রজ্ঞা। তিনি যেন সেই ঋষি, যিনি কোনো রাজনৈতিক ফতোয়া দিতে আসেননি, এসেছেন কেবল আলো জ্বালাতে।

তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তাঁর প্রথম কথাগুলোই শ্রোতাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করল।

"আপনারা সবাই জানতে চেয়েছেন, ব্রহ্ম কী, আত্মা কী—আর কেন এই জ্ঞান আমাদের বর্তমান জীবনে প্রয়োজন। আপনারা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনারা বামপন্থীদের কাছ থেকে যা শুনেছেন, তা হলো তত্ত্বের জটিলতা এবং বিতর্কের বাগাড়ম্বর। আমি সেই পথে যাব না।"

"আমি কোনো কঠিন সংস্কৃত মন্ত্র বা দুরূহ দর্শন দিয়ে শুরু করব না। আমি আপনাদের জীবনের সহজ সত্য দিয়ে বোঝাব। কারণ, সনাতন জ্ঞান কোনো দূরের আকাশে নেই, তা আপনাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে লুকিয়ে আছে। এই জ্ঞান হলো আত্ম-পরিচয়। আসুন,

আজ আমরা আমাদের অস্তিত্বের মূল শিকড় নিয়ে আলোচনা শুরু করি।"

তাঁর এই ভূমিকা শ্রোতাদের মন থেকে সংকোচ ও ভয় দূর করে দিল। তারা প্রস্তুত হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক নতুন আবর্তে প্রবেশ করার জন্য।

৩৩

প্রফেসর রতনবাবু এবার দার্শনিক আলোচনার মূল কেন্দ্রে প্রবেশ করলেন। তিনি কোনো জটিল শ্লোক উচ্চারণ করলেন না, বরং তাঁর টেবিলে রাখা একটি জলভর্তি স্বচ্ছ গ্লাস হাতে নিলেন। হলঘরের আলোয় গ্লাসের জল চিকচিক করছিল। এই সরল দৃশ্যটি যেন ছিল সনাতন জ্ঞানের এক নীরব প্রতীক। সবার কৌতূহলী চোখ এখন সেই গ্লাসের দিকে।

"আপনারা এই জলভর্তি স্বচ্ছ গ্লাসটি দেখছেন। আমরা সবাই এই গ্লাসের মতোই। এই গ্লাসের জলকে আপনারা আমাদের জীবনের প্রবাহ মনে করুন, আমাদের নিত্যদিনের জাগতিক অস্তিত্ব। আর এর ভেতরে যে শূন্য স্থানটি আছে, যা জলকে ধারণ করে আছে—তা হলো আপনার ভেতরের 'আত্মা'।"

তিনি ব্যাখ্যা করলেন, উপনিষদ আমাদের কী শিক্ষা দেয়। "উপনিষদ বলে—'তত্ত্বমসি' (তৎ ত্বম্ অসি), অর্থাৎ 'তুমি সেই'। এই আত্মা আর ব্রহ্ম এক। ব্রহ্ম হলেন সেই অসীম সাগর, আর আপনার ভেতরের আত্মা হলো সেই সাগরের এক বিন্দু জল—যা ক্ষণিকের জন্য এই গ্লাসরূপী শরীর দ্বারা আবৃত।"

তাঁর এই সরল উপমা সাধারণ মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলল। তারা এতদিন ব্রহ্ম, আত্মা বলতে যা বুঝত, তা ছিল দুর্বোধ্য মন্ত্র ও দূরবর্তী ধারণা। আজ তারা দেখল, এই সত্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি সাধারণ বস্তুর মধ্যেই নিহিত।

রতনবাবু এবার গ্লাসের জলটুকু ধীরে ধীরে মঞ্চের বড় পাত্রে ঢেলে দিলেন। জলটুকু পাত্রের জলের সঙ্গে নিঃশব্দে মিশে গেল।

"দেখুন! এই গ্লাসের জল যখন সমুদ্রে বা এই বড় পাত্রে মিশে যায়, তখন সে আর আলাদা থাকে না। সে তার ক্ষুদ্র পরিচয় হারিয়ে অনন্তের অংশ হয়ে যায়। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো এই গ্লাসরূপী শরীর থেকে আত্মাকে মুক্ত করে সমুদ্ররূপী ব্রহ্মের সাথে মিশে যাওয়া—এই মুক্তিই হলো মোক্ষ।"

তিনি সরাসরি সাধারণ মানুষের জাগতিক দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। "আমরা যখন শরীরকে চরম সত্য মনে করি, এই 'গ্লাস'-কে চিরস্থায়ী মনে করি, তখনই আমাদের দুঃখ শুরু হয়। আমরা ভুলে যাই যে এই গ্লাস ক্ষণস্থায়ী। সনাতন ধর্ম আমাদের শেখায়—তুমি শরীর নও, তুমি মন নও, তোমার আবেগও তুমি নও—তুমি আত্মা, যা ব্রহ্মেরই অংশ।"

রতন বাবুর এই ব্যাখ্যা ছিল আদর্শিক চাপ থেকে মুক্তির মন্ত্রের মতো।

তাঁর এই সরল উপমা সাধারণ মানুষের মনে এক গভীর ছাপ ফেলল। তারা বুঝতে পারল, শ্রাদ্ধ বা অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান কেবল সমাজের নিয়ম নয়, তা হলো এই মুক্তির প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

সবিতা দেবী যেন এতদিন নিজের মনের মধ্যে যে অজানা ভয় পুষে রেখেছিলেন, তা দূর হলো। স্বামীর আদর্শ তাঁকে শেখাত, মৃত্যুর পর সব শেষ। কিন্তু রতনবাবু তাঁকে বোঝালেন, মৃত্যু হলো কেবল গ্লাস ভেঙে যাওয়া, যেখানে জল অনন্তের সঙ্গে মিশে যায়। আত্মা যে কেবল 'কুসংস্কার' নয়, তা এক দার্শনিক সত্য—এই বোধ তাঁকে এক অভূতপূর্ব শান্তি দিল। তাঁর মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না। তিনি এখন শুধু তাঁর স্বামীর আত্মার নয়, নিজের আত্মার মুক্তির পথেও যাত্রা শুরু করলেন।

৩৪

ব্রহ্ম ও আত্মার ব্যাখ্যা দেওয়ার পর প্রফেসর রতনবাবু এবার সরাসরি বামপন্থীদের বস্তুবাদী যুক্তির দুর্বলতা তুলে ধরলেন। তাঁর কণ্ঠে কোনো আক্রমণাত্মক ভঙ্গি ছিল না, ছিল কেবল শিক্ষকের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এবং দার্শনিক সত্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল সনাতন জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা নয়, বরং বস্তুবাদের ফাঁপা ভিত্তি উন্মোচন করা।

তিনি বললেন, "যারা ধর্ম মানে না, তারা বলে—'যা দেখি তাই সত্য'। অর্থাৎ, তাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। তাদের দাবি, যে জিনিস দেখা বা স্পর্শ করা যায় না, তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আপনারা একটু ভাবুন—বিজ্ঞান কেবল এই 'দেখা' বা 'স্পর্শ করা'-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।"

রতনবাবু এবার এক অকাট্য উপমা ব্যবহার করলেন।

"আপনারা কি বাতাস দেখতে পান? কেউ কি পারে বাতাসকে গ্লাসে ভরে প্রমাণ করতে? অথচ, বাতাস ছাড়া কি আপনারা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারেন? বাতাস দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু তার উপস্থিতি প্রতিটি নিঃশ্বাসে অত্যাবশ্যক।"

হলঘরে সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মাথা নেড়ে 'না' বললেন। এই সরল যুক্তি সাধারণ মানুষের মনকে সরাসরি স্পর্শ করল। তাদের দীর্ঘদিনের দ্বিধা যেন কেটে গেল।

রতনবাবু এবার সিদ্ধান্তে এলেন: "ব্রহ্ম বা আত্মা হলো সেই বাতাসের মতো—যা দেখা যায় না, কিন্তু যার অভাবে জীবন অচল। বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত বাতাসের চেয়েও সূক্ষ্ম কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে, কিন্তু বামপন্থীরা তাদের অন্ধ বস্তুবাদিতা দিয়ে আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এই জ্ঞানকে তারা অস্বীকার করে, কারণ তাদের বিদেশি মতাদর্শ কেবল বস্তু এবং অর্থনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে।"

তিনি বামপন্থীদের আদর্শের দার্শনিক ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করলেন। "বামপন্থীরা আত্মা মানে না, তাই তাদের আদর্শ কেবল শরীর ও বস্তু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারা কেবল মানুষের ক্ষুধা ও বস্তুগত চাহিদা দেখে—কিন্তু আত্মার ক্ষুধা দেখে না। আত্মাহীন সমাজ তাই কেবল ভোগ ও হিংসার জন্ম দেয়।"

তিনি বোঝালেন, তাদের 'ভাগ করে নেওয়ার কথা' কেন ব্যর্থ হয়। "তারা কেবল বস্তুগত সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার কথা বলে, কিন্তু আত্মিক বন্ধন, স্নেহ, দায়িত্ববোধ—যা সমাজকে ধরে রাখে—সেই কথা বলে না। আত্মাহীন আদর্শ মানুষকে কেবল ক্ষমতা দখলের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, মানুষ হিসেবে নয়। আর সেই কারণেই তাদের আদর্শ এত দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়—কারণ, তা জীবনের মূল সত্য থেকে বহু দূরে সরে আসে।"

তাঁর এই যুক্তি ছিল অকাট্য ও নির্মম সত্য।

পাঠচক্রে উপস্থিত থাকা দু'জন বামপন্থী অনুসারী, যারা গোপনে এসেছিল, তারা আর মাথা তুলে তাকাতে পারল না। তারা মাথা নিচু করে রইল। তারা বুঝতে পারল—তাদের নেতার আদর্শ কেবল একটি রাজনৈতিক স্লোগান ছিল, যা জীবনের মূল সত্য থেকে বহু দূরে। রতনবাবু তাদের রাজনৈতিক স্লোগানকে নয়, তাদের চিন্তার ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিলেন। তারা যেন দেখল—তাদের আদর্শের প্রাসাদ কাঁচের মতো ভেঙে পড়ছে। তাদের এই নীরবতা ছিল আদর্শগত পরাজয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ব্রহ্ম ও আত্মার ব্যাখ্যা দেওয়ার পর প্রফেসর রতনবাবু এবার সনাতন দর্শনের এক চূড়ান্ত সত্য—ভুমা (Bhuma)-এর ধারণাও ব্যাখ্যা করলেন। এই তত্ত্বটি ছিল সীমিত বস্তুবাদী জীবনের বিরুদ্ধে অনন্ত আধ্যাত্মিকতার এক মহৎ ঘোষণা। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ধীর, কিন্তু তার গভীরে ছিল অসীম প্রজ্ঞার আশ্বাস।

"ছান্দোগ্য উপনিষদ আমাদের ভুমা তত্ত্ব দেয়। ভুমা মানে হলো অসীম বা অনন্ত। আপনারা যে জীবন যাপন করছেন, তা হলো সীমিত—আমাদের আয়ু সীমিত, আমাদের সম্পদ সীমিত, আমাদের ক্ষমতা সীমিত। আর আমরা সেই সীমিত জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে শিখি, তাই দুঃখ পাই।"

তিনি ব্যাখ্যা করলেন, দুঃখের মূল কারণ। "যখন আমরা কেবল 'সীমিত'-কে ধরে রাখতে চাই, তখন আমাদের ভয় হয়, চিন্তা হয়। বামপন্থীরা এই সীমিত বস্তুকে আরও সীমিতভাবে ভাগ করে দেওয়ার কথা বলে, তাই তাদের আদর্শ কেবল অর্থনৈতিক উদ্বেগ বাড়ায়, শান্তি দেয় না। তাদের জগৎ কেবল 'গ্লাস' নিয়ে ব্যস্ত থাকে, 'সমুদ্র' নিয়ে নয়।

রতনবাবু এবার ভূমার জ্ঞান আমাদের কী শেখায়, তা তুলে ধরলেন।

"ভূমার জ্ঞান আমাদের শেখায়, আমরা সেই অনন্তেরই অংশ। আমাদের আসল সত্তা

সীমাহীন, বিনাশহীন। যখন আমরা সীমিত বস্তু নিয়ে তৃপ্ত না হয়ে, অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম খুঁজতে শুরু করি, তখনই আমরা দুঃখকে অতিক্রম করি। এই অনন্তের অনুসন্ধানই হলো ধর্মের পথ। আর এই পথে চলতে গেলেই শ্রাদ্ধ, পূজা, দান—এগুলো আসে, যা আমাদের অসীমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।"

তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন, "বামপন্থীরা যা কিছু সীমিত, তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে—সীমিত সম্পদ, সীমিত ক্ষমতা। কিন্তু তারা একবারও সেই অনন্তের জ্ঞান দেয় না, যা আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনের যন্ত্রণা দূর করতে পারে।"

এই চূড়ান্ত ব্যাখ্যাটি সবিতা দেবীর দীর্ঘদিনের আত্মিক যাত্রার সমাপ্তি টানল। তিনি যেন প্রথমবার নিজেকে আবিষ্কার করলেন। এতকাল তিনি কেবল নিয়ম পালন করেছেন, স্বামীর চাপানো আদর্শের সঙ্গে লড়েছেন, কিন্তু আজ তার ভেতরের শূন্যতা জ্ঞানের আলোয় ভরে উঠল।

তিনি বুঝলেন, তাঁর স্বামীর আদর্শ তাঁকে যে সীমিত কারাগারে—যেখানে কেবল অর্থনৈতিক সমীকরণ ও রাজনৈতিক ক্রোধ ছিল—আটকে রেখেছিল, সনাতন দর্শন তাঁকে সেই অনন্তের পথে মুক্তির দিশা দেখাচ্ছে। তাঁর জীবন এখন আর 'কমরেডের বিধবা' বা 'ভয়ে গুটিয়ে থাকা গৃহিণী' নয়, তিনি এখন অনন্তের অংশ।

সবিতা দেবীর চোখে নেমে এলো এক শান্ত, নির্মল দীপ্তি। এই দীপ্তি ছিল নিশ্চয়তা ও স্বস্তির। তিনি আর একা নন, তিনি অনন্তের সঙ্গে যুক্ত। আদর্শ আবাসনের আবর্ত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথটি যেন অবশেষে তিনি দেখতে পেলেন। এই পথ কেবল ব্যক্তিগত শান্তিই দেবে না, তা সমাজকেও এক নতুন আলোকে পথ দেখাবে।

৩৫

কয়েকটি রবিবার পার হয়ে গেল। আবাসনের লাইব্রেরিতে প্রতি রবিবার বসা রতন বাবুর পাঠচক্র এখন আর কেবল একটি ছোট আলোচনা সভা নয়, তা যেন আদর্শ আবাসনের অলিখিত জ্ঞানতীর্থ। প্রথম দিকের দ্বিধা কেটে গিয়ে এখন লোকসমাগম আরও বেড়েছে। লাইব্রেরির অভ্যন্তর ছাড়িয়ে করিডোর পর্যন্ত মানুষ জড়ো হয়। রতন বাবুর বক্তব্য শোনার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

এই পাঠচক্রে কেবল প্রবীণরাই নয়, ভিড় করছে মধ্যবয়সী পেশাজীবী—যারা কর্পোরেট জীবনের বস্তুগত চাপ থেকে মুক্তি খুঁজছেন—এবং বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়া তরুণ-তরুণীও। এই তরুণ প্রজন্মটিই ছিল এতদিন বামপন্থী আদর্শের প্রধান অনুসারী। কিন্তু তারা দেখল, রাজনৈতিক স্লোগানে যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা পূরণ করতে পারে কেবল এই মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকা সনাতন প্রজ্ঞা।

আবাসনের বামপন্থী মহল নীরব ও বিচ্ছিন্ন। তাদের রাজনৈতিক স্লোগান আর মিটিংয়ে এখন আর লোক হয় না। তাদের

পোস্টারগুলো ফ্ল্যাটের দেয়ালে লাগানো থাকলেও, সেগুলোর প্রতি কারও কোনো আগ্রহ নেই। জনমত যে ধীরে ধীরে সনাতন পথের প্রজ্ঞা এবং রতন বাবুর যুক্তির দিকে ঝুঁকছে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। বামপন্থী নেতারা প্রথমবারের মতো অনুভব করলেন, তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জনসমর্থনের অভাবে দুর্বল হচ্ছে।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, তপন বাবুর পুরনো কিছু কমরেড অনুসারীও—যারা প্রকাশ্যে রতন বাবুর প্রতিবাদের সমালোচনা করেছিল—তারা এখন লোকচক্ষুর আড়ালে, একেবারে পেছনের সারিতে, নীরবে এই সভায় যোগ দিতে শুরু করেছে। তাদের চোখে ছিল কৌতূহল এবং নিজেদের বহুদিনের লালিত আদর্শের প্রতি এক গভীর সন্দেহ। তারা শুনতে এসেছিল, রতনবাবু তাদের আদর্শের ভিত্তিকে কীভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছেন। এই গোপন উপস্থিতি ছিল রাজনৈতিক আদর্শের উপর প্রজ্ঞার নীরব বিজয়ের প্রতীক।

সবিতা এখন আর পেছনের সারিতে বসেন না; তিনি আর রীতা বসেন একেবারে সামনে, যেন আলোর উৎসের কাছাকাছি। সবিতা দেবীর মুখে এখন এক নতুন আত্মবিশ্বাস, তাঁর চোখে এখন জ্ঞানের এক স্নিগ্ধ দীপ্তি। তিনি যেন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর এক মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর উপস্থিতি সেখানে প্রমাণ করত, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অর্থ নিজের আত্মার শান্তিকে অস্বীকার করা নয়।

অন্যদিকে, রীতাও এখন তার বাবার ফেলে যাওয়া আদর্শের শূন্যতা পূরণ করতে ব্যস্ত। বাবার দেওয়া বিদেশি মতাদর্শ তাকে যে দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা দিয়েছিল, মায়ের দেখানো পথে সে এখন স্থিতি ও সত্যের সন্ধান পাচ্ছে। সে বুঝতে পারল, প্রগতিশীলতা মানে নিজের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা নয়, বরং তার গভীরে থাকা জ্ঞানকে আবিষ্কার করা। এই পাঠচক্র ছিল তাদের কাছে কেবল শিক্ষা নয়, নতুন জীবনের ভিত্তি রচনা।

৩৬

পাঠচক্রের এই পর্বটি ছিল জীবনের মূল সমস্যার সমাধান খোঁজার পর্ব। প্রফেসর রতনবাবু এবার আলোচনা শুরু করলেন কর্ম এবং ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে। তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু তার গভীরে ছিল হাজার বছরের প্রজ্ঞার শক্তি। তিনি শুরুতেই 'ধর্ম' শব্দের ভুল ব্যাখ্যাগুলো খণ্ডন করলেন।

"আপনারা এতদিন শুনে এসেছেন, ধর্ম মানে কেবল পূজা-অর্চনা, উপবাস বা মন্ত্রপাঠ। বামপন্থীরা এই ভুল ব্যাখ্যাগুলোকেই আরও প্রচার করে, যাতে তারা সহজেই ধর্মকে 'কুসংস্কার' বলে বাতিল করতে পারে। কিন্তু না। 'ধর্ম' শব্দটি এসেছে 'ধারণা' শব্দ থেকে।"

রতনবাবু ব্যাখ্যা করলেন 'ধর্ম'-এর আসল অর্থ। "যা আমাদের সমাজ ধারণ করে রাখে, আমাদের সঠিক পথে চালিত করে, মানবতার সঙ্গে যুক্ত রাখে, কর্তব্যপরায়ণ করে—সেটাই ধর্ম। এটা কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয়, এটা হলো জীবনযাপনের এক নৈতিক এবং আত্মিক পদ্ধতি।"

তিনি বোঝালেন যে, ধর্ম না মানা মানে কেবল ঈশ্বরকে অস্বীকার করা নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের নৈতিক বন্ধনকে অস্বীকার করা। "ধর্মে বিশ্বাস না রাখা মানে হলো সেই বন্ধনকে অস্বীকার করা, যা আমাদের একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ করে। এই নৈতিকতার ওপর সমাজের তিনটি মৌলিক স্তম্ভ আছে, যা ছাড়া সমাজ দাঁড়াতে পারে না: সত্য (Truth), দয়া (Compassion) আর পবিত্রতা (Purity of Mind)। যে আদর্শ এই তিনটি স্তম্ভকে অস্বীকার করে, তা কখনোই মানুষের মঙ্গল করতে পারে না।"

এরপর রতনবাবু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূলমন্ত্র, কর্মযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করলেন। এই ব্যাখ্যা সবিতা দেবীর মনের ওপর এক বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলল—ঠিক যেন তাঁর স্বামীর জীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার কারণ উন্মোচন হলো।

"গীতা আমাদের শেখায়—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' (কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়)। এই শ্লোকটি আমাদের মতো গৃহস্থ বা কর্মজীবীদের জন্য সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা। আপনারা দেখুন, তপন বাবুর মতো মানুষ হয়তো সমাজের ভালোর জন্য কাজ করতে চেয়েছিলেন—তাঁর উদ্দেশ্য হয়তো খারাপ ছিল না। কিন্তু ফল নিয়ে তিনি এত বেশি চিন্তা করতেন যে, তাঁর পথ হিংসা, ক্রোধ, বিতৃষ্ণা এবং বিতর্কের জ্বালায় ভরে যেত।"

রতনবাবু থামলেন। হলঘরে পিনপতন নীরবতা। সবাই যেন তপন বাবুর জীবনের তিক্ততার সঙ্গে নিজেদের জীবনের হতাশাকে মেলাতে পারছিলেন।

"যখন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী ফল আসত না, তিনি হতাশ হতেন এবং সমাজের ওপর আরও বেশি ক্ষুব্ধ হতেন। তিনি কেবল 'ভালো ফল' পাওয়ার জন্য কাজ করতেন, তাই ফল না পেলে তাঁর সমস্ত কাজ ব্যর্থ মনে হতো।"

"কিন্তু সনাতন পথ কী শেখায়? এটি শেখায়, তুমি কর্তব্য করো, কিন্তু ফলের আশা করো না। তুমি তোমার সেরাটা দাও, কারণ কর্ম করাই তোমার ধর্ম। ফল যদি তোমার ইচ্ছামতো নাও আসে, বা ফল যদি খারাপ হয়—তবে তোমার দুঃখ থাকবে না, কারণ তুমি কর্তব্য পালন করেছো। এটাই কর্মযোগ। কাজ হবে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ততা ও আত্মশুদ্ধির জন্য। এই জ্ঞান আমাদের ক্রোধ থেকে, অহংকার থেকে এবং ব্যর্থতার গ্লানি

থেকে মুক্তি দেয়। আপনারা কি এই মুক্ত সমাজ চান না?"

সবিতা দেবী তাঁর স্বামীর সারা জীবনের ক্রোধ, হতাশা এবং তিক্ততার কারণটা যেন এই প্রথম স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। তপনবাবু কেবল ফলের দাসত্ব করতেন, তাই তিনি কখনো শান্তি পাননি। তাঁর তথাকথিত 'প্রগতিশীল' আদর্শ তাঁকে অন্ধভাবে ফলাফল পূজারী করেছিল, যেখানে ব্যর্থতা ছিল ক্রোধের জন্মদাতা।

এই জ্ঞান সবিতা দেবীকে তাঁর স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলল, কারণ তিনি বুঝলেন—তপনবাবু আদর্শের নামে নিজে নিজেই এক মানসিক আবর্তে আটকে ছিলেন। সেই আবর্তে কোনো মুক্তি ছিল না, ছিল কেবল জ্বালা। সবিতা এখন তাঁর স্বামীর ভ্রান্ত আদর্শকে বাতিল করে, নিজের জীবনের নতুন কর্তব্যকে মেনে নিতে পারলেন—তাঁর চোখে এখন কর্ম ও ধর্মের এক শান্ত দীপ্তি।

৩৭

কর্মযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করার পর, প্রফেসর রতনবাবু এবার এই দার্শনিক ভিত্তিকে দেশাত্মবোধের সঙ্গে যুক্ত করলেন। তাঁর কথায় এক নতুন ধরনের 'প্রকৃত দেশপ্রেমের' সংজ্ঞা ফুটে উঠল—যা কেবল রাজনৈতিক নয়, আত্মিক ও সাংস্কৃতিক।

তিনি সরাসরি বামপন্থীদের বিদেশি আদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের মূল কারণটি ধরলেন। তাঁর কণ্ঠে কোনো রাগ ছিল না, ছিল গভীর পর্যবেক্ষণ।

"আপনারা কেন বিদেশিদের মতবাদে বিশ্বাস রাখেন? কারণ তারা আপনাদের দেশের সংস্কৃতিকে ছোট করে দেখিয়েছে। তারা আপনাদের ব্রেনে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, তোমাদের ধর্ম হলো কুসংস্কার, তোমাদের সংস্কৃতি হলো পশ্চাৎপদ। তারা আপনাদের আত্মবিশ্বাসকে ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু এই সংস্কৃতি তোমাদেরকে প্রকৃত দেশপ্রেম শেখায়নি?"

রতনবাবু এবার প্রকৃত দেশপ্রেমের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, দেশপ্রেমের অর্থ কেবল রাজনৈতিক প্রতীক নয়, তা হলো আত্মিক বন্ধন।

তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন: "দেশপ্রেম কী? কেবল স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন বা জাতীয় স্লোগান দেওয়া? না। দেশপ্রেম হলো সেই মাটির প্রতি শ্রদ্ধা—যে মাটি তোমাদের জন্ম দিয়েছে, যে মাটি তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণ করেছে। দেশপ্রেম হলো সেই পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধা—যা হাজার বছর ধরে তোমাদের জীবন দিয়েছে, ভাষা দিয়েছে, নৈতিকতা দিয়েছে।"

তাঁর মতে, এটাই আমাদের প্রকৃত 'ধর্ম' বা 'সনাতন পথ'—যেখানে দেশ কেবল একটি ভূখণ্ড নয়, দেশ হলো এক জীবন্ত সংস্কৃতি। "এই সংস্কৃতি তোমাদের কর্তব্যপরায়ণ হতে শেখায়, পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধ হতে

শেখায়। যখন তোমরা নিজেদের সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করবে, তখন আপনা থেকেই এই মাটির প্রতি তোমাদের গভীর ভালোবাসা জন্মাবে।"

তিনি সরাসরি বামপন্থীদের ভণ্ডামির দিকে ইঙ্গিত করলেন। "যারা এই দেশের মাটি ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে, তারা আসলে দেশপ্রেমের নামে রাজনীতি করে। তারা কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক মডেল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, যা অন্য দেশ থেকে ধার করা। তাদের আদর্শে কোনো দায়বদ্ধতা নেই, আছে কেবল রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা।"

রতনবাবু উপসংহারে বললেন, জ্ঞানীর পথ এবং রাজনীতিবিদের পথের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। "যখন তোমরা তোমাদের ঘরের জ্ঞানভাণ্ডার—বেদান্ত—ছেড়ে ইউরোপের বা চীনের মতবাদ আঁকড়ে ধরো, তখন তোমরা তোমাদের দেশের আত্মাকেই অস্বীকার করো। তোমরা নিজেদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হও। আর এই বিচ্ছিন্নতাই আত্মিক শূন্যতা সৃষ্টি করে, যা তোমাদের মধ্যে ক্রোধ ও অস্থিরতা বাড়ায়।"

এই বক্তব্য আবাসনের মানুষের মনে গভীর চিন্তার জন্ম দিল। তারা বুঝল, এতদিন তাদের আদর্শিক চাপ ছিল কেবল বিদেশি মতাদর্শের একটি দাসত্ব, যা তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। রতনবাবু তাদের দেশপ্রেমকে একটি নতুন, আত্মিক ও দার্শনিক ভিত্তি দিলেন।

৩৮

রতন বাবুর কর্ম, ধর্ম এবং দেশাত্মবোধের এই দার্শনিক ব্যাখ্যা ছিল চূড়ান্ত সত্যের উন্মোচন। তাঁর কথাগুলি কেবল তত্ত্ব ছিল না, ছিল এক নির্মম আত্মসমালোচনা, যা সরাসরি বামপন্থীদের 'দেশ-বিরোধী' মতলব ও বিদেশী আদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের দিকে ইঙ্গিত করল। রতনবাবু যেন দেখালেন, যে আদর্শ নিজের সংস্কৃতি, মাটি ও আত্মাকে অস্বীকার করে, তা কখনোই মানুষের মঙ্গল করতে পারে না।

হলঘরে উপস্থিত সাধারণ মানুষ এবং এমনকি কমরেড অনুসারীরাও বুঝতে পারলেন—তথাকথিত 'মুক্তচিন্তার' নামে তারা আসলে নিজেদের দেশের মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করছিলেন। তারা কেবল বিদেশী আদর্শের 'আবর্তে' ঘুরছিলেন, যা তাদের কোনো সনাতন পথের দিশা দিতে পারেনি। তাদের আদর্শ ছিল ফাঁপা বেলুনের মতো, যা আলোর সামান্য উষ্ণতাতেই চুপসে যায়। বামপন্থীদের চোখে তখন লজ্জা, অনুতাপ এবং গভীর চিন্তার ছাপ—তারা আজ দেখল, রাজনৈতিক স্লোগান নয়, প্রজ্ঞাই হলো আসল শক্তি।

সবিতা দেবীর হৃদয়ে এই জ্ঞান যেন মুক্তি এনে দিল। এতদিন তিনি স্বামীর আদর্শ ও নিজের বিশ্বাসের মধ্যে যে দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন,

আজ তার চিরতরে অবসান হলো। এই অনুভূতি ছিল দীর্ঘদিনের কারাবাস থেকে স্বাধীনতার মতো।

তিনি তাঁর স্বামীর জীবনের সমস্ত তিক্ততা ও ক্রোধের মূল কারণ বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝলেন, তাঁর স্বামীর কঠোর আদর্শ কেবল রাজনৈতিক হতাশা ও ফলের প্রতি আসক্তির ফল ছিল। তপন বাবু 'কর্তব্য' করতেন, কিন্তু 'ধর্ম' করতেন না—তিনি ফলের দাসত্ব করতেন, তাই তাঁর জীবনে শান্তি ছিল না, ছিল কেবল অশান্তি। এই উপলব্ধি সবিতা দেবীর পুরোনো আক্ষেপকে দূর করে দিল। তিনি এখন কেবল শ্রাদ্ধের মাধ্যমে স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করেননি, বরং জ্ঞানের মাধ্যমে স্বামীর শূন্যতাকে বোঝার চেষ্টা করছেন এবং তাকে করুণা করছেন।

সবিতা দেবী অনুভব করলেন, তিনি যেন নতুন করে বাঁচতে শুরু করলেন। তাঁর আর কোনো আক্ষেপ রইল না। তাঁর মন এখন শান্ত ও স্থিতধী। তিনি তাঁর পুরোনো অভ্যাস ও বিশ্বাসকে এখন নতুন দার্শনিক ভিত্তি দিতে পারলেন। সনাতন পথের দিশা তাঁর জীবনকে নতুন অর্থে ভরে দিল—যেখানে কর্ম, ধর্ম এবং দেশাত্মবোধ আর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং এক সুতোয় গাঁথা—এক অখণ্ড সত্য।

পাঠচক্র শেষ হলে সবিতা দেবী এবং রীতা নীরবে রতন বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। তাদের চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত, তবে সেই অশ্রু শোকের নয়, ছিল কৃতজ্ঞতা ও মুক্তির।

আদর্শ আবাসন, যা এতদিন বামপন্থী রাজনৈতিক চাপের কেন্দ্র ছিল, তা এখন প্রজ্ঞার শান্ত স্রোতে গা ভাসাল। সবিতা দেবীর সিদ্ধান্ত ও রতন বাবুর পাঠচক্র প্রমাণ করল, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে কেবল বিচ্ছিন্নতা ও ক্রোধ দিতে পারে, কিন্তু সত্য, শান্তি ও মুক্তি দেয় কেবল জ্ঞান—যা এই মাটির গভীরে, সনাতন ঐতিহ্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আদর্শ আবাসন তার ভ্রান্ত আদর্শের আবর্ত ছেড়ে, এখন সনাতন পথের এক নতুন আবর্তে প্রবেশ করল। এটি ছিল একটি যুগের সমাপ্তি ও একটি নতুন যুগের সূচনা।

৩৯

কয়েক মাস পেরিয়ে গেল। তপন বাবুর শ্রাদ্ধ এবং রতন বাবুর পাঠচক্রের সূচনার পর আদর্শ আবাসন এখন যেন এক নতুন আলোয় স্নাত। যে আবাসনে এতদিন আদর্শিক সংঘাতের চাপা উত্তেজনা বিরাজ করত, যেখানে প্রতিবেশীরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পেত, সেখানে এখন এক শান্ত, নির্মল পরিবেশ। এই পরিবর্তন এসেছিল কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবে নয়, এসেছিল জ্ঞানের নীরব স্ফুলিঙ্গে।

লাইব্রেরিতে এখন নিয়মিত পাঠচক্র বসে। এই পাঠচক্র কেবল জ্ঞান অর্জন নয়, এটি যেন আবাসনবাসীর সম্মিলিত আত্মিক

পরিশুদ্ধি। আবাসনের করিডোরে এখন আর 'কমরেড' শব্দের জোরালো চিৎকার বা রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরের শব্দ শোনা যায় না; শোনা যায় সংস্কৃত মন্ত্রের শান্ত ধ্বনি এবং আত্মিক আলোচনার মৃদু গুঞ্জন। বামপন্থীদের জোর করে চাপানো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে।

আবাসনের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো নিজেদের আদি রীতিনীতি আবার ফিরে পেয়েছে। এই ফিরে আসা ছিল সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক। ফ্ল্যাটের দরজায় এখন আলপনা শোভা পায়, যা এতদিন কেবল উৎসবের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সন্ধ্যায় প্রতিটি ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসে শাঁখের ধ্বনি, যা এতদিন বামপন্থী সমালোচনার ভয়ে মৃদু ছিল, এখন তা মুক্তভাবে উচ্চারিত। বারান্দায় তুলসীতলার পরিচর্যা এবং সেখানে প্রদীপ জ্বালানো—যা এতদিন ছিল লজ্জা ও ভয়ের বিষয়—এখন তা আত্মমর্যাদা ও ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এই পরিবর্তনগুলি ছিল ছোট, কিন্তু তাদের দার্শনিক তাৎপর্য ছিল বিশাল। মানুষ বুঝল, নিজের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা কোনো প্রগতিশীলতা নয়। তারা এখন গর্বের সঙ্গে নিজেদের শিকড়কে আঁকড়ে ধরেছে। আদর্শ আবাসন এখন রাজনৈতিক আদর্শের আবর্ত ছেড়ে, সনাতন ঐতিহ্যের এক নতুন, শক্তিশালী আবর্তে প্রবেশ করেছে।

আবাসনের বাতাবরণ বদলানোর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল বামপন্থী মহলের নীরব আত্মসমর্পণ। তপন বাবুর যে বন্ধুরা আগে পূজার প্যান্ডেল তৈরির সময় 'সাংস্কৃতিক মাতব্বরি' করতে আসতেন, যারা ধর্মীয় রীতিনীতিকে প্রকাশ্যে উপহাস করতেন, তারা এখন পাঠচক্রে বিনীতভাবে এসে বসেন। তাদের পুরনো আদর্শের জীর্ণ দেওয়াল ভেঙে পড়েছে রতন বাবুর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কাছে। তারা বুঝতে পেরেছে, রাজনৈতিক স্লোগান আর অর্থনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটানো যায় না।

এই পরিবর্তন এসেছিল ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে। একদিন সন্ধ্যায়, যখন পাঠচক্র শেষ, হলঘর প্রায় ফাঁকা—তখন শ্যামল বাবু, যিনি একদিন সবিতা দেবীকে শ্রাদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং রতন বাবুর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, তিনি ভয়ে ভয়ে রতন বাবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁর মুখে ছিল অপরাধবোধ এবং বিনীত স্বীকারোক্তি।

তিনি মাথা নিচু করে বললেন, "স্যার, আমাদের আদর্শের মধ্যে মানবতা ছিল, কিন্তু মানবাত্মার জ্ঞান ছিল না। আমরা মানুষকে কেবল অর্থনৈতিক কাঠামো দিয়ে মাপতাম, তাই আমাদের আন্দোলন কেবল হিংসা ও বিতৃষ্ণায় পর্যবসিত হয়েছে। আমরা মানুষকে ভোগের জন্য লড়তে শিখিয়েছি, কিন্তু শান্তির জন্য বাঁচতে শেখাইনি।"

শ্যামল বাবুর কণ্ঠে ছিল গভীর অনুশোচনা। "স্যার, আমাদের আত্মিক শূন্যতা পূরণ করতে লেনিন বা মাও পারতেন না, তার জন্য দরকার ছিল বেদান্ত। আমরা আমাদের দেশের মূল জ্ঞানকে বিদেশি তত্ত্বে চাপা দিতে চেয়েছি—এর চেয়ে বড় ভুল আর হয় না।"

তাঁর এই স্বীকারোক্তি ছিল বামপন্থী আদর্শের দেউলিয়াপনার চূড়ান্ত দলিল। তাদের পুরনো আদর্শের প্রতি মোহ ভেঙে যাওয়ায়, তারা এখন জীবনের নতুন অর্থ খুঁজছিলেন—যা রাজনৈতিক ক্ষমতায় নয়, বরং আত্মিক শান্তির গভীরে নিহিত। রতনবাবু হাসলেন, বিদ্রুপের হাসি নয়, করুণার হাসি। তিনি বুঝলেন, সত্যের আলো অবশেষে অন্ধকারের দেওয়াল ভেদ করতে পেরেছে।

৪০

আদর্শ আবাসনের এই নবজাগরণের কেন্দ্রে ছিলেন সবিতা দেবী এবং রীতা। সবিতা এখন আর সেই ভীত, স্বামীর আদর্শের চাপে কুণ্ঠিত নারী নন। তিনি এখন আবাসনের একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি কেবল তপন বাবুর বিধবা নন, তিনি এখন সনাতন পথের ধারক ও বাহক। তাঁর ব্যক্তিত্বে এসেছে এক অটল শান্তি ও দৃঢ়তা। তাঁর এই পরিবর্তন কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুকরণ নয়, বরং আত্মিক মুক্তির ফল। তিনি নিয়মিত পাঠচক্রে উপস্থিত হন এবং তাঁর নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি এবং শান্ত, আত্মবিশ্বাসী মুখ অন্যদের অনুপ্রাণিত করে। তিনি যেন প্রমাণ করেন, প্রজ্ঞা ও কর্তব্য মানুষকে কতখানি স্থিতধী করতে পারে।

কন্যা রীতাও এই পরিবর্তনের এক জীবন্ত প্রতীক। যে একসময় বাবার আদর্শিক কঠোরতার অনুরাগী ছিল, যার কাছে বিদেশি তত্ত্বই ছিল চূড়ান্ত সত্য, সে এখন বেদান্তের গভীরতায় মগ্ন। সে এখন বুঝতে পারে, বাবার আদর্শ তাকে কেবল অন্যকে ঘৃণা করতে, সমাজকে বিভক্ত করতে শিখিয়েছিল, আর মায়ের দেখানো পথ ও রতন বাবুর জ্ঞান তাকে নিজেকে ভালোবাসতে এবং সবার সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে যুক্ত হতে শিখিয়েছে।

রীতা এখন তার বন্ধুদের কাছে গীতার সারমর্ম ব্যাখ্যা করে, যা আগে ছিল তার কাছে হাস্যকর কুসংস্কার। সে বোঝে, কর্মযোগের ধারণা কীভাবে একজন তরুণকে ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং জীবনে উদ্দেশ্য ও কর্তব্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। রীতা এখন তার বয়সী অন্যদের কাছে প্রগতিশীলতার এক নতুন সংজ্ঞা—যা শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং শিকড়ের গভীরে প্রোথিত।

সবিতা দেবী ও রীতার ফ্ল্যাট 'মুক্তধারা', যা একসময় তপন বাবুর কঠোর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীক ছিল—যেখানে চে গুয়েভারার ছবি দেওয়ালে টানানো থাকত—তা এখন আত্মিক মুক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফ্ল্যাটের ভেতরে এখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

সেখানে কোনো জোরালো রাজনৈতিক আলোচনা নেই, আছে শান্ত আধ্যাত্মিক গুঞ্জন। এই ফ্ল্যাট এখন আর রাজনৈতিক বিতর্ক ও বিভাজনের উৎস নয়, বরং আলো, শান্তি ও ঐক্যের প্রতীক।

সবিতা দেবী ও রীতার জীবন প্রমাণ করে যে, প্রকৃত স্বাধীনতা কোনো রাজনৈতিক শৃঙ্খলে নয়, তা কেবল সনাতন জ্ঞানের গভীরে নিহিত। তাদের জীবন আদর্শ আবাসনের অন্যদের কাছে 'মুক্তির পথ' হয়ে উঠল।

৪১

আদর্শ আবাসনের কাছে প্রফেসর রতনবাবু আর কেবল একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নন; তিনি যেন এক আধুনিক ঋষি। তাঁর প্রভাব ছিল গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। তিনি কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ চাপিয়ে দেননি—যা বামপন্থীরা করেছিল—কেবল জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি কেবল 'প্রশ্ন করতে' শিখিয়েছেন, আর উত্তর খুঁজে নিতে বলেছেন শাস্ত্রের গভীরে। তিনি আবাসনের মানুষকে শিখিয়েছেন, আদর্শ হলো চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস নয়, এটি হলো আত্ম-অনুসন্ধানের ফল।

মানুষ তাদের দীর্ঘদিনের মূর্খতার জন্য লজ্জিত, কারণ তারা অন্ধভাবে বিদেশি স্লোগান অনুসরণ করেছিল। কিন্তু রতন বাবুর সান্নিধ্যে তারা নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। তারা বুঝেছে, বিদেশি স্লোগানে নয়, স্বদেশী প্রজ্ঞাতেই রয়েছে তাদের প্রকৃত মুক্তি। এই জ্ঞান তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও সাংস্কৃতিক গর্বের জন্ম দিয়েছে।

আবাসনের বামপন্থী নেতা ও কমরেডরা এখন কার্যত একঘরে। তাদের পুরনো স্লোগান কেউ শোনে না। তাদের রাজনৈতিক ব্যানারগুলো বিবর্ণ হয়ে আসছে, ঠিক যেন তাদের আদর্শের মতো। তারা আর সাধারণের সামনে আসে না; তারা 'কাজ আছে' বা 'জরুরি মিটিং আছে' বলে পালিয়ে যেতে ব্যস্ত, কারণ তারা জানে—তাদের তথাকথিত 'যুক্তি' রতন বাবুর শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য নয়। তাদের যুক্তি ছিল ফাঁপা, বস্তুবাদী এবং আত্মাহীন।

তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল, কারণ তাদের কর্মী ও অনুসারীরা এখন বস্তুবাদের কারাগার থেকে আত্মার মুক্তির পথে যাত্রা শুরু করেছিল। তপন বাবুর মৃত্যু, যা বামপন্থীরা তাদের আদর্শ প্রচারের শেষ সুযোগ হিসেবে দেখেছিল, তা-ই পরিণত হলো তাদের আদর্শের চূড়ান্ত বিপর্যয়ে।

রতনবাবু প্রমাণ করলেন, প্রকৃত জ্ঞান সর্বদা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়ে শক্তিশালী। আদর্শ আবাসনের এই নীরব আদর্শিক বিপ্লব যেন এই মাটির চিরন্তন সত্যটিকেই তুলে ধরল: সনাতন পথের দিশা কখনো মুছে যায় না, তা কেবল সময় ও প্রজ্ঞার আলোকের জন্য অপেক্ষা করে।

৪২

আদর্শ আবাসনে সেদিন থেকে নতুন এক আবর্ত শুরু হলো—এক পবিত্র ও আত্মিক আবর্ত। তপন বাবুর মৃত্যু, তাঁর শোকসভা এবং রতন বাবুর নীরব প্রতিবাদ—এইসব ঘটনা ছিল সেই আবর্তের সূচনাবিন্দু। এটি ছিল রাজনৈতিক আদর্শের নামে শূন্যগর্ভ মতবাদ নয়, বরং প্রজ্ঞার আলোকে সনাতন পথের দিশা। এই আলো শুধু তপন বাবুর পরিবারকেই নয়, পুরো সমাজকেই এক নতুন পথে চালিত করল, যেখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা একে অপরের পরিপূরক।

সনাতন জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করার পর আবাসনের মানুষ বুঝতে পারল, আধুনিকতা মানে অতীতকে বর্জন করা নয়, বরং অতীতের প্রজ্ঞাকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করা। রতনবাবু তাদের শিখিয়েছিলেন, বিজ্ঞান এবং বেদান্ত কখনোই একে অপরের বিরোধী নয়; বরং একই সত্যের দুটি ভিন্ন দিক। বিজ্ঞান বস্তুজগৎ নিয়ে কাজ করে, আর বেদান্ত আত্মিক জগতের গভীরতা নিয়ে আলোচনা করে। এই জ্ঞান তাদের কর্পোরেট জীবনের বস্তুগত চাপ এবং রাজনৈতিক আদর্শের মানসিক দাসত্ব—উভয় থেকেই মুক্তি দিল।

আবাসনবাসী একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উপলব্ধি করল: সনাতন পথ হলো চিরন্তন। রাজনৈতিক আদর্শের উত্থান-পতন হতে পারে, কারণ সেই আদর্শগুলো মানুষের সীমিত বুদ্ধি এবং বস্তুগত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু যে জ্ঞান জীবন ও মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করে, যে জ্ঞান ভুমা বা অনন্তের পথ দেখায়, তার কোনো বিনাশ নেই।

তারা দেখল, যে বামপন্থী আদর্শ এতদিন শক্তিশালী স্লোগান দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চেয়েছিল, তা সামান্য প্রজ্ঞার কাছেই নতজানু হলো। কারণ, বস্তুবাদী আদর্শ মানুষের আত্মাকে কোনো মুক্তি দিতে পারেনি।

আদর্শ আবাসন এখন আর কেবল ইট-পাথরের কাঠামো নয়, তা হয়ে উঠল জ্ঞানের এক কেন্দ্রবিন্দু। আবাসনের নামকরণ 'আদর্শ আবাসন' হয়তো ছিল কেবল এক রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু রতন বাবুর পাঠচক্রের মাধ্যমে তা আজ প্রকৃত আদর্শের আশ্রয় হয়ে উঠল। মানুষ এখানে তাদের জীবনের আসল শান্তি খুঁজে পেল, যে শান্তি কোনো রাজনীতি বা অর্থনীতি দিতে পারেনি।

প্রতি রবিবার লাইব্রেরির সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে শোনা যায় রতন বাবুর শান্ত, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর—যেখানে তিনি গীতার কর্মযোগ বা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। এই নতুন আবর্ত আবাসনের প্রতিটি পরিবারকে একত্রিত করল, কর্তব্যপরায়ণ করল এবং আত্মিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করল। তপন বাবুর জীবনের শেষ ঘটনাটি যেন ছিল সেই অন্ধকারের শেষ বিন্দু, যার পর সনাতন জ্ঞানের সূর্য উদিত হলো। ***

সাংগঠনিক খবর - ২০২৫

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন

২০২৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ থানার হেমনগর গ্রামে **'কল্পগঙ্গা কপিলমেলা'** প্রাঙ্গণে **'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র** দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক **শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়।** মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রীভবেশ হাউলী, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার, শ্রীঅসীম মণ্ডল, শ্রীকার্ত্তিক মণ্ডল এবং মেলা কমিটির সভাপতি শ্রীমুরারীমোহন মণ্ডল ও সম্পাদক শ্রীসরোজকান্তি মিস্ত্রী মহাশয়। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য মোট ৪৫ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নাম নথিভুক্ত করেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রামে এবং মেলা প্রাঙ্গণে হওয়ায় বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জেলা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে **সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ' নামে পত্রিকা** প্রকাশ করা হয়। আগত প্রতিনিধিদের রাত্রে থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এস পি টুরিস্ট লজে।

বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও মা গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধা সঙ্গীত নিবেদনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীসরোজকান্তি মিস্ত্রী মহাশয়। এরপর সম্মেলনে উদ্যোক্তা, অতিথি ও আগত প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। স্বাগত ভাষণে হেমনগর হাই স্কুলের মাননীয় প্রধানশিক্ষক শ্রীঅসীম মণ্ডল মহাশয় 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ' সংগঠনের সম্মেলন কপিল মেলা প্রাঙ্গণে করার জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি কপিল মুনি ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন নিয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। টাকি থেকে আগত শ্রীকার্ত্তিক মণ্ডল, হাসনাবাদ থেকে আগত **শ্রীখগেন্দ্রনাথ মণ্ডল,** নদীয়ার হরিণঘাটা থেকে আগত **শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার** প্রমুখ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। **সংগঠনের ও সম্মেলনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল** মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই মেলা কমিটির সকল সদস্যকে অত্যন্ত আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি মহর্ষি কপিল মুনির সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সম্পর্কের বিষয়ে তথ্যসূত্রসহ আলোকপাত করেন এবং মহর্ষি কপিল মুনি যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ তা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন। তিনি বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের ভালো ও খারাপ দিকগুলো জোরের সঙ্গে তুলে ধরেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের স্বার্থে কাজের কথা ব্যক্ত করেন এবং সকলকে এই কাজে যুক্ত হতে উদবুদ্ধ করেন। তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনাও করেন। সমবেতভাবে কল্যাণ মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

ঘোষণা করেন **সংগঠনের ও সম্মেলনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়।** মেলা প্রাঙ্গণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের উপর একটি **প্রদর্শনীর** আয়োজন করা হয় এবং এটি বহু লোকের প্রশংসা অর্জন করে। একটি বইয়ের স্টলও দেওয়া হয়। শ্রীচিরঞ্জিত পাল ও শ্রীশুভ বালা বইয়ের স্টল ও প্রদর্শনীর বিষয়ে প্রভূত সহযোগিতা করেন। রাত্রে লজে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সদস্যদের এলাকা ভিত্তিক কিছু কাজ দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিদের রাত্রে লজে থাকার ও খাওয়ার কথা থাকলেও তারা ফিরে যান এবং এর ফলে বহু খাবার নষ্ট হয়। হোটেলের অনেক ঘর বুক করা সত্ত্বেও ফাঁকা পড়ে থাকে। যা ছিল অর্থের অপচয়।

১৪/০১/২০২৫, হেমনগরে, "সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ" আয়োজিত দ্বিতীয় সম্মেলনে নাম নথিভুক্তকারীদের নামের তালিকাঃ

১। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মণ্ডল - হাসনাবাদ
২। শ্রীভবেশচন্দ্র হাউলি - টাকি
৩। শ্রীকার্ত্তিক মণ্ডল - টাকী
৪। শ্রীসত্যপদ মণ্ডল - বাগদা
৫। শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার - নদীয়া
৬। শ্রী মুকেশ মণ্ডল - বাগদা
৭। শ্রীমতি কাকলী মণ্ডল - বাগদা
৮। শ্রীজনক মণ্ডল - বাগদা
৯। শ্রীশঙ্কর মণ্ডল - বাগদা
১০। শ্রীমহেশ্বর বিশ্বাস - বাগদা
১১। শ্রীমধুসূদন মণ্ডল - বাগদা
১২। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সরকার - বাগদা
১৩। শ্রীবিনয় রায় - নদীয়া
১৪। শ্রীরমাতোষ মণ্ডল - নদীয়া
১৫। শ্রীবাঞ্ছারাম তারফদার - নদীয়া
১৬। ড. মনোরঞ্জন জোয়ারদার - সোনারপুর
১৭। শ্রীসুদর্শন নস্কর - যাদবপুর
১৮। শ্রীদেবাশীষ গায়েন - বারুইপুর পূর্ব
১৯। শ্রীসঞ্জিত নস্কর - বারুইপুর পশ্চিম
২০। শ্রীদেবপ্রসাদ মণ্ডল - কুলতলি
২১। শ্রীপলাশ গায়েন - কুলতলি
২২। শ্রীতপন কুমার মণ্ডল - জয়নগর
২৩। শ্রীনিবাস নস্কর - ক্যানিং
২৪। শ্রীমানিক মণ্ডল - মগরাহাট
২৫। শ্রীগপাল নস্কর - মগরাহাট
২৬। শ্রীহিমাদ্রি হালদার - কুলপি
২৭। শ্রীসচিদানন্দ হালদার - কুলপি
২৮। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সফি - রায়দীঘি
২৯। শ্রীশিবশঙ্কর হালদার - রায়দীঘি
৩০। শ্রীসমর মণ্ডল - মগরাহাট পশ্চিম
৩১। শ্রীমতী মল্লিকা পাইক - মন্দিরবাজার
৩২। শ্রীমতী মল্লিকা নস্কর - মন্দিরবাজার
৩৩। শ্রীপ্রশান্ত মণ্ডল - গোসাবা
৩৪। শ্রীগোপাল মণ্ডল - গোসাবা
৩৫। শ্রীপ্রেমতোষ মৃধা - সোনারপুর
৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ নস্কর - বারুইপুর পূর্ব
৩৭। শ্রীদুলাল সরকার - চাঁদপাড়া
৩৮। শ্রীস্বপন সরকার - চাঁদপাড়া
৩৯। শ্রীকুমারচন্দ্র পর্বত - গোসাবা
৪০। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় - বনগাঁ
৪১। শ্রীচিরঞ্জিত পাল - গোপালনগর, বনগাঁ
৪২। শ্রীশুভ বালা - বনগাঁ
৪৩। **শ্রীপরিমল দে (সাংবাদিক) - বসিরহাট, আমন্ত্রিত**

আয়োজকঃ

শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

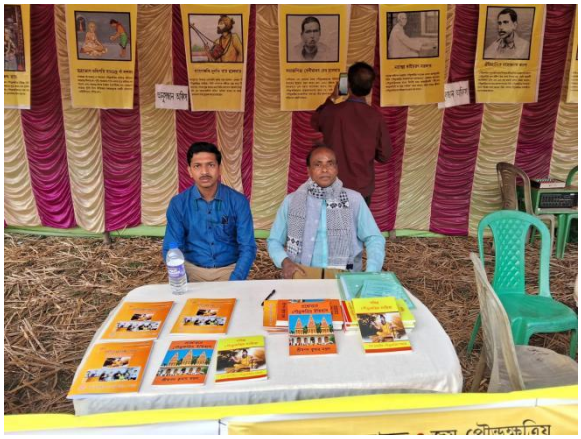

প্রধান শিক্ষক শ্রীঅসীম মণ্ডল ও শ্রীচিরঞ্জিত পাল বই স্টলের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায়। একজন আগ্রহী প্রদর্শনীর ভিডিও করছেন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিজস্ব পত্রিকা 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ' প্রকাশের ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বাম দিক থেকে শ্রীসরোজকান্তি মিস্ত্রী (মেলা কমিটির সম্পাদক), শ্রীকার্ত্তিক মণ্ডল(শিক্ষক), শ্রীভবেশ হাউলি (সদস্য), অধ্যাপক শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল (সংগঠনের সভাপতি), শ্রীখগেন্দ্রনাথ মণ্ডল(সদস্য), প্রধান শিক্ষক শ্রীঅসীম মণ্ডল(সদস্য), শিক্ষক শ্রীনরেশ চন্দ্র শিক্ষক(নদীয়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত), এবং শ্রীমুরারীমোহন মণ্ডল(মেলা কমিটির সভাপতি)।

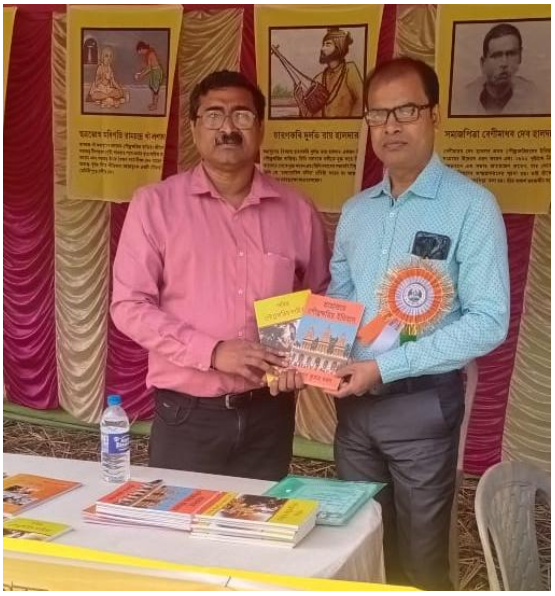

যোগেশগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীসুমল মণ্ডল মহাশয়কে পুস্তক ও পত্রিকা প্রদান।

১৩/০১/২০২৫ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলনে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

সরজ বাবু

মুরারি বাবু

প্রদীপ মণ্ডল

সমাজ কল্যাণ মণ্ডল

শ্রীহরিপদ মণ্ডলের সহিত সংগঠনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল।

সাংগঠনিক খবর

সভাপতির কর্মপ্রচেষ্টা

১৫/০১/২০২৫ - হিঙ্গলগঞ্জ থানার শ্যামশের নগর গ্রামের মাননীয় শ্রীহরিপদ মণ্ডল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক আলোচনা। শ্রীমণ্ডলের সূত্র ধরে ঐ গ্রামের মাননীয় শ্রীবিশ্বরূপ মণ্ডল মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ। উভয়কেই সংগঠনের পুস্তক ও পত্রিকা প্রদান করা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ে দুজনের উৎসাহ ও আগ্রহ অত্যন্ত ইতিবাচক। শ্রীহরিপদ মণ্ডল মহাশয় পূর্বেই সভাপতির সাথে একবার ফোনালাপ করেন। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় ড. হরেকৃষ্ণ মণ্ডল এনার ভাইপো।

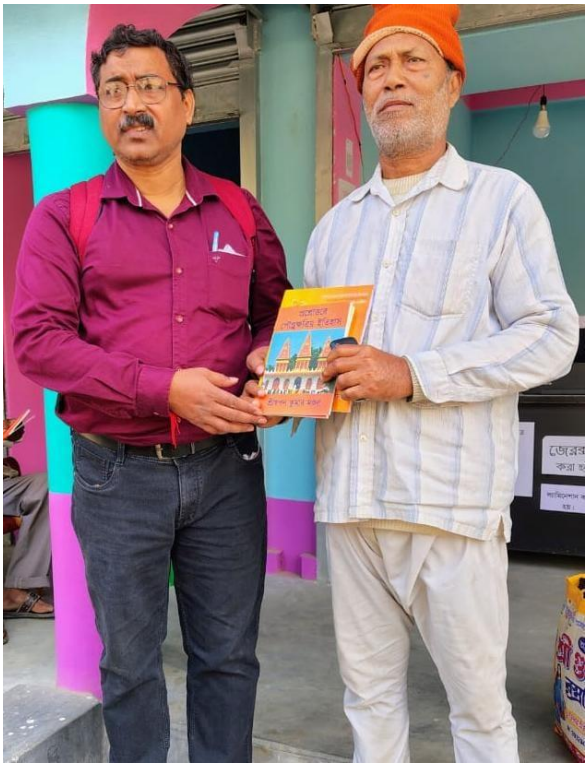

শ্রীবিশ্বরূপ মণ্ডলের সহিত সংগঠনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল।

১৬/০১/২০২৫ - হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত হেমনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক **মাননীয় শ্রীঅসীম মণ্ডল মহাশয়ের** সঙ্গে ফোনে বার্ষিক সম্মেলনের ফলাফল পর্যালোচনা এবং সাংগঠনিক আলোচনা।

১৮/০১/২০২৫ - **শ্রীঅনুভব মণ্ডল মহাশয়ের** সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ে ও সংগঠন বিষয়ে ফোনে আলোচনা। শ্রীমণ্ডল কর্পোরেট সেক্টরে কর্মরত এবং কলিকাতাতে থাকেন। তাঁকে www.poundrakshatriya.com ওয়েবসাইটের লিঙ্ক প্রদান করা হয়।

১৯/০১/২০২৫ - **শ্রীঅনুভব মণ্ডল মহাশয়ের** সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ে ও সংগঠন বিষয়ে ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ফোনে আলোচনা। অনুভব মণ্ডলকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান।

২১/০১/২০২৫ - শ্রীবিশ্বনাথ নস্কর মহাশয়ের সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক আলোচনা। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণার সদস্য। তাঁর সাথে ৩৪ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড কথা হয়।

২৭/০১/২০২৫ - **শ্রীতুহিন সরকার মহাশয়ের** সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ে ও সংগঠন বিষয়ে আলোচনা। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একজন শুল্ক অফিসার। বর্তমানে বর্ধমানে কর্মরত। বনগাঁতে সাক্ষাৎ এবং তাঁকে সংগঠনের পুস্তক ও পত্রিকার pdf file প্রদান এবং www.poundrakshatriya.com ওয়েবসাইটের লিঙ্ক প্রদান।

০১/০২/২০২৫ - সাগর দ্বীপের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য জয়নগরের মাননীয় শ্রীতপন মণ্ডল মহাশয়ের মাধ্যমে সাগরদ্বীপের মাননীয় শ্রীবিকাশ জানা মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ।

২৫/০২/২০২৫ - সাগর দ্বীপে যাত্রা এবং ২৭/০২/২০২৫-এ ইস্কনের রবীন প্রভু মহাশয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনের পক্ষ থেকে বই ও পত্রিকা তুলে দেওয়া হয়। তিনি সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন এবং এলাকার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সাথে আলোচনা করবেন বলে জানান। কয়েকদিন পরে তাকে ফোন করা হলে তিনি জানান স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রমুখ ব্যক্তিদের হাতে তিনি বই তুলে দিয়েছেন।

১০/০৩/২০২৫ - হিঙ্গলগঞ্জ থানার শ্যামশের নগর গ্রামের মাননীয় শ্রীহরিপদ মণ্ডল মহাশয়ের সহিত ফোনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক আলোচনা।

২৩/০৩/২০২৫ - **মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী উৎসব** উৎযাপন অনুষ্ঠান ২০২৫-এ মাননীয় সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় শ্রীদেবাংশু পুরকাইত কর্তৃক আমন্ত্রিত হন এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার

মগরাহাট থানার বনসুন্দরিয়া গ্রামে, মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের জন্মস্থানে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন। মাননীয় সভাপতি, মহাত্মা রাইচরণ সরদারের আবক্ষ মূর্তির উদ্বোধনের সাক্ষী হন এবং আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মাননীয় সভাপতি, শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলনে মহাত্মা রাইচরণ সরদারের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলচনায় অংশ নেন। মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের জন্মস্থান বনসুন্দরিয়া গ্রামে মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে একটি মেলা যাতে প্রতিবছর হয় এবং সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ঐ দিন যাতে অংশ নিতে পারে তার জন্য কমিটির কর্মকর্তাদের কাছে প্রস্তাব রাখেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মাননীয় সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল, অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীদেবাংশু পুরকাইতের অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

১৫/০৮/২০২৫ - দক্ষিণ ২৪ পরগণার গড়িয়াতে অবস্থিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পর্ষদের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদান করেন সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মাননীয় সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়। বক্তৃতার লিখিতরূপ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পর্ষদের সম্পাদক শ্রীঅশোক নস্কর মহাশয়ের নিকট জমা দেওয়া হয়। লেখক সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে দলের অধীন না হয়ে প্রকৃত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হতে বলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনে শুধুমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক আলোচনা হওয়া উচিত বলে মত ব্যক্ত করেন। অনেককে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কথা বলা হয়, অনেকে কথা দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ যান নি। শুধুমাত্র সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় একাই অংশগ্রহণ করেন।

সাংগঠনিক সভাঃ

২৯/০১/২০২৫ তারিখে গুগুল মিটে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল - বিগত সম্মেলনের পর্যালোচনা, হিসাব প্রদান, কমিটি পুনর্গঠন, পরবর্তী সম্মেলন ও কার্যক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন, বিবিধ। সংগঠন মন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। **টাকি থেকে মাননীয় শ্রীভবেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়** সম্মেলনের বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। **জয়নগর থেকে মাননীয় শ্রীতপন মণ্ডল মহাশয়** সম্মেলনের প্রশংসা করেন এবং নিজ এলাকায় সংগঠন বৃদ্ধির বিষয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা জানান। **মুম্বাই থেকে মাননীয় শ্রীনির্মল বিশ্বাস মহাশয়** সম্মেলনে যোগ দিতে না পারলেও গ্রুপের থেকে যাবতীয় খবর রেখেছেন বলে জানান। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে তিনি আক্ষেপ করেন এবং সকলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান। **বসিরহাট থেকে এডভোকেট মাননীয় শ্রীহাজারীলাল সরকার মহাশয়** পরবর্তী সম্মেলনে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। **হৃদয়পুর থেকে মাননীয়**

শ্রীদেবাশীষ জোয়ারদার মহাশয় পারিবারিক ও বয়সজনিত কারণে সময় দিতে না পারার জন্য আপসোস করেন এবং তিনি কয়েকজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণী মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানান এবং তিনি আরও অনেকের সাথে সংগঠন বিষয়ে কথা বলবেন বলে জানান। **বারাসাত থেকে মাননীয় শ্রীনিত্যানন্দ মণ্ডল মহাশয়** নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার উল্লেখ করেন এবং সংগঠনকে সময় না দিতে পারার জন্য আপসোস করেন। তাঁকে সংগঠনের পরিচালনগত কোনও ত্রুটি আছে কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন না কোনও ত্রুটি নেই, বরং আমরাই সময় দিই না, যাই না, আপনারা তো চেষ্টা করে যাচ্ছেন। **মিনাখা থেকে মাননীয় শ্রীমহাদেব পাত্র মহাশয়** নিজের হার্ট অপারেশনের কথা জানান এবং সুস্থ হলে পরবর্তী সম্মেলনে যুক্ত হবেন বলে জানান। তিনি কবিতা লেখেন। তাঁকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক কবিতা লেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। **মেদিনীপুরের হলদিয়া থেকে মাননীয় শ্রীশুভেন্দু গায়েন মহাশয়** সম্মেলনে না আসতে পারার কারণ জানান এবং বই ও পত্রিকার হার্ড কপি সংগ্রহের কথা বলেন। তাঁকে প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। মিটিঙয়ে অল্প লোক অংশ নেওয়ায় অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং আলোচ্য সুচি অনুযায়ী সভা চালানো সম্ভব হয়নি। বক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন সংগঠনের সভাপতি মাননীয় শ্রীস্বপনকুমার মণ্ডল মহাশয়। তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক সংবাদ

মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী উৎসব উৎযাপন অনুষ্ঠান - ২০২৫

২৩শে মার্চ, ২০২৫ রবিবার, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট থানার বনসুন্দরিয়া গ্রামে, মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের জন্মস্থানে "মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী উৎসব উৎযাপন অনুষ্ঠান ২০২৫" অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় পুণ্ড্র সোসাইটি, রাইচরণ সরদার একাডেমী এবং মহাত্মা রাইচরণ সরদার স্মৃতিরক্ষা সমিতি যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আয়োজক

কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রীদেবাংশু পুরকাইত মহাশয় এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র নস্কর মহাশয়।

সকালে মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের প্রতিকৃতিসহ পদযাত্রা হয়। সঙ্গে ছিল বাজনাসহ ব্রতচারী নৃত্য। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সম্মানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিগণ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, গ্রামবাসী ও স্বজনবন্ধুগণ।

বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন হয়। উন্মোচন করেন পুণ্ড্রজাতি ও তার ইতিহাস গ্রন্থের লেখক, গবেষক, সমাজচিন্তক শ্রীশ্যামল কুমার প্রামাণিক। উপস্থিত ছিলেন সমাজের সকল স্তরের জ্ঞানীগুণি বুদ্ধিজীবী সম্মানীয় অতিথিগণ। এরপর একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। বিষয় ছিল - মহাত্মা রাইচরণ সরদারের প্রতিকৃতি। তারপর অতিথি বরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের মঞ্চে আহ্বান করা হয় ও তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে ও গোলাপ দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সভার উদ্বোধন করেন উদ্বোধক ও সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ। মণীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীরামচন্দ্র নস্কর মহাশয়, সম্পাদক, মহাত্মা রাইচরণ সরদার স্মৃতি রক্ষা সমিতি। মহাত্মা রাইচরণ সরদারের সার্ধশততম বর্ষের স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। সভার প্রথম পর্বের আলোচনার বিষয় ছিল সার্ধশততম বর্ষে মহাত্মা রাইচরণ সরদারের শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা। সভাপতিত্ব করেন- শ্রীশ্যামল কুমার প্রামাণিক, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন -অধ্যাপক সুধাংশু সরকার, প্রতিনিধি- হাওড়া জেলা, অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল (বনগাঁ, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. শেখর রায়, প্রতিনিধি-উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা, অধ্যাপক ড. কৃষ্ণকুমার সরকার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, অধ্যাপক ড. চন্ডীচরণ মুরা, প্রতিনিধি-পুরুলিয়া জেলা। বক্তারা তাদের বক্তৃতায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নানাদিক তুলে ধরেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রীদেবাংশু পুরকাইত। স্বরচিত গল্প, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। স্বজাতির আত্মজাগরণ আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারে মহাত্মা রাইচরণ সরদারের ভূমিকা বিষয়ে শ্রীদেবাংশু পুরকাইত মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকরা স্বল্পাহার ও মধ্যাহ্ন ভোজনের ভালো ব্যবস্থা করেন।

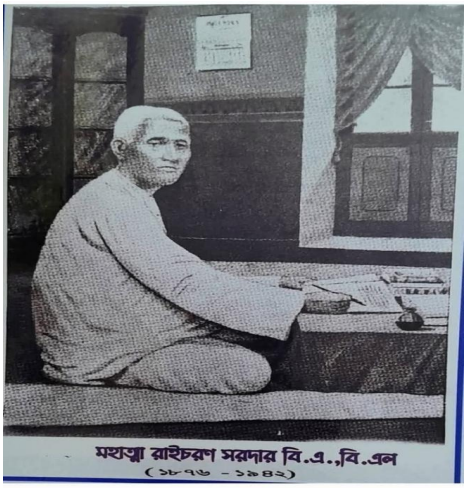

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পর্ষদের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎযাপন

১৫ই আগস্ট ২০২৫ শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার গড়িয়াতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পর্ষদের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং সংগঠনের মুখপত্র 'সমাজ দর্শন পত্রিকা' প্রকাশ করা হয়। **"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ও বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের অভিমুখ"** বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয় এবং বহু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধূর্জটি নস্কর মহাশয়।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ও বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের অভিমুখ

- শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল
সভাপতি, সর্বভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

(১৫ই আগস্ট, ২০২৫ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ, গড়িয়াতে প্রদত্ত বক্তৃতা।)

ভূমিকাঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণের আন্দোলনের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে জাগরণ ঘটে এবং সমাজের উপর তলায় একটি সচেতন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গোষ্ঠী তৈরি হয়। সমাজের এই সচেতন গোষ্ঠীই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নানাদিক উন্মোচিত হতে শুরু করে। মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের স্বর্গলাভের পর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলন অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে জাগরিত করার জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনকে পূণর্জাগরিত করেন এবং 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পর্ষদ' নামে গড়িয়াতে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। স্তিমিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলন এই সংগঠনের মাধ্যমে কিছুটা এগোলেও নানা কারণে তা সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে আকর্ষণ করতে পারেনি বা সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। তাই এরপর আরও কয়েকটি পৌণ্ড্র সংঘটন গড়ে উঠে এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নানাদিক উন্মোচিত করে। কিন্তু নানা কারণে এইসব পৌণ্ড্র সংগঠনগুলি সফলতা পায়নি। তাই বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলন অনেকটাই অসংগঠিত ও পথভ্রষ্ট। এর থেকে বেরনোর পথ খুঁজে বের করা বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতৃত্বের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের পটভূমিকাঃ ১৮৭১ সালে জনগণনা রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর

বাংলায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। বাংলার প্রত্যেক মানুষকে কোনও না কোনও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে এক একটি নামে চিহ্নিত করা হয়। এটি ছিল জনগণনার মোড়কে ভারতবাসীকে ভাগ করো ও শাসন করো নীতি প্রয়োগের একটি বলিষ্ঠ ক্ষেত্র। এই রিপোর্টে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অত্যন্ত অসম্মানজনক নামে অভিহিত করা হয় এবং বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বেণীমাধব হালদার মহাশয় প্রথম এটি লক্ষ্য করেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সম্মান ফেরানোর চেষ্টা করেন। তাঁরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপর প্রথম পুস্তক রচনা করেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। বেণীমাধব হালদার মহাশয়ের সঙ্গে একে একে শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ করণ প্রমুখ যুক্ত হন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ আন্দোলনকে একটি অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রমুখ পুরুষরা নিজেদের উচ্চ বর্ণের মনে করতেন এবং এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা নানা প্রকার গবেষণা, সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও প্রচার শুরু করেন। তারা অনেক গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সরকারী আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি ও পত্র প্রদান চলতে থাকে। এই পর্বে পৌণ্ড্র নেতাদের সামনে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তারা সেগুলি সমাধানের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতৃবৃন্দ তপশীলী প্রশ্নে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তপশীলী তালিকাভুক্ত হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ আন্দোলন নেতৃত্বের দ্বিধাবিভক্তির কারণে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন; কিন্তু তাঁর স্বর্গগমনের সাথে সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে জাগরিত করার জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনকে পূণর্জাগরিত করেন এবং ‘পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পর্ষদ’ নামে গড়িয়াতে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ আন্দোলনকে আবার জাগরিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাতের দশকের নানা রাজনৈতিক টানাপড়েন এবং ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ আন্দোলনকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এইসময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটা কোন ঠাসা হয়ে পড়ে এবং ক্ষত্রিয় পরিচিতি শাসক কর্তৃক সমালোচিত হতে থাকে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত অংশ নানা দল ও সংগঠনের তলায় সমবেত হতে থাকে। যার থেকে তৈরি হয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের নতুন নতুন ধারা।

বর্তমান অবস্থাঃ বর্তমানে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের মাধ্যমে ধামাকা অফার চলছে এবং সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এতে সামিল হয়ে চলেছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চেতনা সার্বিকভাবে জাগ্রত না হওয়ায় যখনিই রাজ্যে শাসক দল পরিবর্তিত হয়েছে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সেই দলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা দেখি যখন শাসক কংগ্রেস, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কংগ্রেস সমর্থক; যখন শাসক কমিউনিস্ট, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কমিউনিস্ট সমর্থক; যখন শাসক তৃণমূল কংগ্রেস, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক। কংগ্রেসের গরীবী হটাও, কমিউনিস্টদের কেড়ে খাও (ভূমি সংস্কারের নামে সমাজের অগ্রগণ্যদের জমি কেড়ে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে) আজ তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে ভাতা নাও ভোট দাও-তে এসে ঠেকেছে।

যারা ক্ষমতা পায়নি তারাও পিছিয়ে নেই। **কেউ বলছেন আমরা হিন্দু আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত**, না হলে মুসলিমরা আমাদের জমি, বাড়ি, নারী দখল করে নেবে; আবার দেশভাগ করবে এবং তাদের প্রথম টার্গেট বাংলা। বেশিরভাগ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এর মধ্যে সারবত্তা খুঁজে পেয়ে এতে সামিল। এখন এক হতে হবে বুঝলাম কিন্তু কেন ভাগ করা হয়েছিল তা-র উত্তর অধরা বা কোনও কোনও সময় বিদেশীদের ভাগ করো ও শাসন করো নীতিকে দায়ী করে খালাস। মূল সমস্যার সমাধানে তেমন তৎপরতা দেখা যায় না।

আবার একদল বলছে আমরা হিন্দু নই আমরা বৌদ্ধ, ভারত এক সময় বৌদ্ধ ছিল তাই আমাদের বৌদ্ধ ধর্মে ফিরলেই মুক্তি। ভাবুন একবার, যারা বিদেশী আক্রমণে কোনও প্রতিরোধ না করেই বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিল, যার জন্য তাদের নেড়ে বলা হত, সেই নেড়ে হবার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। বৌদ্ধ ধর্ম শেষ অবস্থায় একটা তন্ত্র ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। বৌদ্ধবাদীরা হিন্দু মন্ত্রে বিশ্বাস রাখেন না, অথচ বৌদ্ধ তন্ত্রে বিশ্বাস রাখতে বলছেন - এটা অযৌক্তিক ও

অনৈতিক। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বৌদ্ধ হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের আর প্রাসঙ্গিকতা থাকে কি? যিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তিনি বৌদ্ধ নন, আর যিনি বৌদ্ধ তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নন। ফলে বৌদ্ধ হওয়ার চিন্তাটি বেশ গোলমেলে।

আবার কেউ কেউ বলছেন আমরা মূলনিবাসী। ব্রাহ্মণরা বহিরাগত; অতএব ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে অন্য সকলকে একত্রিত করতে হবে এবং মূলনিবাসী সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ব্রাহ্মণ এদের কাছে অচ্ছ্যুত ও বহিরাগত হলেও মুসলমান ও খ্রিস্টানরা এদের আপনজন। এরা ব্রাহ্মণ বোধন, শ্রীচৈতন্যদেব এদের ভূমিকা বেমালুম চেপে যায়। যে মুসলমানরা দেশভাগ করেছিল, তারা কেন এই দেশে - তা নিয়ে তাদের কিছু বলতে শোনা যায় না বা লিখতে দেখা যায় না। একবার দেশভাগ করেছে যারা, তারা আবার দেশভাগ করবে না তার গ্যারান্টি কোথায় ? যারা শিয়া-সুন্নি-আহমদিয়া-দ্রুজ ভাই ভাই হতে পারেনি সেখানে তাদের ভাই ভাবা মূর্খতা বা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি ? সব ব্রাহ্মণ খারাপ - এইরকম ধারণা একটি ভ্রান্ত ধারণা। সব ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো খারাপ আছে। শুধু ব্রাহ্মণকে দোষারোপ করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই না। ব্রাহ্মণদের যেমন কিছু দোষ আছে তেমনি তাদের অনেক অবদানও আছে। তাই ব্রাহ্মণদের অবদানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে শুধুমাত্র তাদের খারাপ দিক তুলে ধরে নিন্দা করা অসততার পরিচায়ক। ইসলাম ও খৃষ্টানরা বিদেশ থেকে এসে ভারতীয় হয়ে গেল অথচ ব্রাহ্মণ বিদেশী থেকে গেল, কোন যুক্তিতে এটি সমর্থনযোগ্য ? ব্রাহ্মণকে না ডাকলে ব্রাহ্মণ নিজে থেকে কার বাড়ীতে পূজা করতে যান ? তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে এইসব ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং যারা এই ধরণের অযৌক্তিক প্রচার করছে তারা যে দেশের ক্ষতি করছে সেটা মাথায় রাখতে হবে।

আবার একদল নিজেদের আম্বেদকরবাদী ভাবে এবং তপশীলী বা দলিত ও মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাস করে। মুসলিমদের প্রতি এদের দরদ অত্যন্ত বেশি। ড. আম্বেদকরের আদর্শকে এরা সামনে রেখে চলে এবং এরা প্রচণ্ডভাবে ব্রাহ্মণ ও হিন্দু বিরোধী। এরা হিন্দু পাড়ায় থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। কিন্তু মুসলিম মৌলবাদ সম্পর্কে একেবারে নীরব। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতা, কেউ কেউ নাস্তিকতার কথা বললেও এরা ড. আম্বেদকরকে প্রায় ভগবান বানিয়ে ফেলেছেন।

বৌদ্ধবাদী, মূলনিবাসী ও আম্বেদকরবাদীরা কমিউনিস্ট ও মুসলিমদের রাজনৈতিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট ও মুসলিমরা হল একই মুদ্রার দুই পীঠ। এদের লক্ষ্য ভাগ করো ও শাসন করো। বৌদ্ধবাদী, মূলনিবাসী ও আম্বেদকরবাদীরা এই ভাগ করো ও শাসন করো নীতিতে সামিল হয়ে পড়েছে। কমিউনিস্টরা তাদের সমর্থকদের তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে সংশয় তৈরি করে এবং তারপরে ঘৃণা করতে শেখায়। তারা হিন্দু হয়েও গুরুর মাংস খেয়ে প্রমাণ দেয় তারা ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু মুসলিমদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ চাওয়ার তাদের সাহস নেই। তাই কমিউনিস্ট মুসলিমরাও অমুসলিমদের ধর্মান্তরিত করে এবং ধর্মান্তরিতদের তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করে তোলে। ধর্মান্তরিতদের ইসলামের প্রসারের কাজে লাগায় এবং তাদের জাতীয়তার বদল ঘটিয়ে আরব অভিমুখী করে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের দিকে তাকালেই এটি ভালোভাবে বোঝা যায়। যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল, বর্তমানে ধর্মান্তরিত মুসলিম, তারাই হিন্দুদের উপর আক্রমণ করেছে - এই একই রকম আক্রমণের মাধ্যমে তারা বা তাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

কমিউনিস্ট ও মুসলিমদের একজন করে প্রবক্তা আছে। ইসলাম মানুষকে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীতে ভাগ করে, কমিউনিস্টরা মানুষকে বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েতে ভাগ করে। উভয়ের একটি স্বর্গীয় গ্রন্থস্বত্ব আছে। উভয়ের উপাসনাগার আছে, যেখানে অবিশ্বাসীদের প্রতি কি আচরণ করা হবে তা নির্ধারিত হয়। উভয়েই স্বর্গের অলীক কল্পনাকে সামনে রেখে মানুষকে সম্মোহিত করে। উভয়েই অত্যাচারী ও ক্ষমতা দখলের সংকীর্ণ নীতিতে বিশ্বাস করে। উভয়ই হত্যার নীতিতে বিশ্বাসী। উভয়ই মৌলবাদী, যুক্তিবাদ পছন্দ করে না। এক দলীয় শাসনে বিশ্বাস করে। উভয়ই বিস্তারবাদে বিশ্বাস করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের আবর্তে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা আজ দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না এবং তারা বেশিরভাগ বিভ্রান্ত। তাই তাঁরা পৌণ্ড্র সংগঠনগুলিতে সামিল হচ্ছেন না বা তাদের উপর ভরসা করতে পারছেন না। প্রত্যেক দল বা গোষ্ঠী তাদের সত্তা নির্মাণে ব্যস্ত। বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনগুলির খুব বেশি করে দায়িত্ব নিতে হবে যাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সঠিক দিশা পায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সঠিক দিশা কি ?

সঠিক দিশার অন্বেষণঃ সঠিক দিশা খুঁজতে আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।

কারণ ইতিহাস পথ নির্দেশ করে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে - **ইতিহাস ভুলে গেলে ইতিহাস বারবার ফিরে আসে। অর্থাৎ ইতিহাসের কোনও ঘটনা যদি আমরা মনে না রাখি বা তার থেকে যদি আমরা কোনও শিক্ষা না গ্রহণ করি তাহলে ঐ ঘটনা আবার ফিরে আসে।** যেমন - দেশভাগের কথা যদি আমরা মনে না রাখি তাহলে আবার দেশভাগ হতে বাধ্য। **অতীত বর্তমানকে চালিত করে এবং বর্তমান ভবিষ্যৎকে চালিত করে।** তাই আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই গ্রহণ করতে হবে যাতে সিদ্ধান্তে কোনও ভুল না থাকে এবং আমাদের ভবিষ্যতে কোনও বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে না হয়।

শিকড় ত্যাগ চলবে নাঃ আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। এই নামটি আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক বিচার বিবেচনার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। এখনও যেকোনোও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে তাঁর Sub-Caste জিজ্ঞাসা করলে সে নিজেকে **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়** বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। সে শুধু পৌণ্ড্র বলে না। কারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শব্দটির মধ্যে একটি জাতিগত উচ্চতাবোধক ধারণা আছে এবং এটি একটি আত্মমর্যাদার দ্যোতক। তাই এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নাম বাদ দিয়ে অন্য কোনও নাম গ্রহণ অনুচিত কাজ হবে।

দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই হিন্দু সনাতন ধর্মের বিশেষ কয়েকটি গুণ আছে যা তাকে বর্তমানেও বিদ্যমান রেখেছে। বহু রূপান্তর, সংযোজন ও সংশোধনের মাধ্যমে হিন্দু সনাতন ধর্ম আজ পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। অথচ পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম এত বিদেশী আক্রমণের মুখোমুখি হয়নি। ইসলামী আক্রমণে যেখানে মাত্র ৬ বছরে ইরাক, ৮ বছরে সিরিয়া, ১০ বছরে মিশর, ১৯ বছরে পারস্য মুসলিমদের দ্বারা অধিকৃত হয় সেখানে ভারত তার ধর্ম ও সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। তাই সনাতন হিন্দু ধর্ম ত্যাগ বা বর্জনের কথা বলা মূর্খতা বা অজ্ঞতার পরিচায়ক। কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের এই মূর্খতার পরিচয় দেওয়া উচিত নয়। কারণ এর আগে সনাতন হিন্দু ধর্মের অনেক বিরোধিতা হয়েছে, পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্ম সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় সারা ভারতে এমনকি বিদেশও প্রভাব বিস্তার করেছিল, সনাতন হিন্দু ধর্ম সংকুচিত হয়ে পড়ে ছিল। কিন্তু তা আবার সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্জীবন লাভ করে। চার্বাকদের চেষ্টাও সফল হয়নি। বিদেশী ইসলামিক আগ্রাসনও হিন্দু সনাতন ধর্মের বিরাট ক্ষতি করলেও নির্মূল করতে পারেনি। খৃষ্টান মিশনারি ও খৃষ্টান

রাজনৈতিক নেতাদের উদ্যোগও সফল হয়নি। আধুনিক যুগে ব্রাহ্ম সমাজের চেষ্টাও ফলবতী হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। তাই হিন্দু সনাতন ধর্মের বাইরে বেরিয়ে কোনও প্রচেষ্টা সফল করা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পক্ষে অসম্ভব। ইতিহাসের এত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন অলীক স্বপ্নে বিভোর ? সব ধর্মেই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে, আবার কিছু ভালো দিকও আছে। তাই সনাতন হিন্দু ধর্মের নিন্দা করা ও ত্যাগের ভাবনা অযৌক্তিক। সমালোচনা করা যেতে পারে কিন্তু নিন্দা কোনও মতেই নয়। সনাতন হিন্দু ধর্মের ভিতরে থেকেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সনাতন হিন্দু ধর্মের খারাপ দিকগুলির সংস্কার করতে হবে। আঙ্গুর হবার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ ঝরা আঙ্গুরের কোনও মূল্য নেই।

তৃতীয়তঃ ধর্ম ও Religion এক নয় এটা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মাথায় রাখতে হবে। অনেকেই Religion গুলিকে ধর্ম বলে মনে করেন এবং বলে থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত "The I: Dharma versus Religion" (Author - RS, notion press, 2020) গ্রন্থে এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং ধর্ম ও Religion-এর পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরা হয়েছে। অমলেশ মিশ্র তাঁর **"সর্ব ধর্ম এক নয়ঃ গোলাকার বর্গক্ষেত্র হয় না - ধর্ম বনাম রিলিজিয়ান"** (তুহিনা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থে এবিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন এবং ধর্ম ও রিলিজিয়ান এক নয় সেটা ব্যাখ্যা করেছেন। Religion বলতে প্রবর্তিত মত বোঝায়, যেখানে একজন প্রবর্তক থাকেন, একটি ধর্মগ্রন্থ থাকে এবং সেই গ্রন্থ ও প্রবর্তকের প্রতি বিশ্বাস থাকে। এতে সর্বজনীনতার কোনও স্থান নেই। যুদ্ধ, মূর্তি ভাঙা, আশান্তি, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা, অত্যাচার, হিংসা, বিভাজন, মন্দির ধংস, গ্রন্থাগার ধংস, বিশ্ববিদ্যালয় ধংস, গণহত্যা ইত্যাদি রিলিজিয়নের সাথে যুক্ত। **Religion-এ বিশ্বাসীরা নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করে এবং এজন্য তারা বলপ্রয়োগ ও নানা কৌশল অবলম্বন করে।**

অন্যদিকে ধর্ম প্রবর্তিত নয়, আবর্তিত। 'ধর্ম' একটি সংস্কৃত শব্দ। ইংরেজিতে ধর্মের কোন সঠিক শব্দ নেই। ধর্ম কি? **ধ্রিয়তে ধর্ম ইত্যহু- একটি সত্তার যে গুণাবলী থাকতে হবে তা হল ধর্ম।** বিজ্ঞানে সঠিক শব্দটি চরিত্রগত বা সম্পত্তি। একটি বস্তু তার বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বীকৃত হয়. আগুনের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য হল কিছু পোড়ানো। আগুন যদি তার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য হারায় তবে আমরা তাকে আগুন বলব না বরং অন্য কিছু বলব। মানুষের ধর্ম কি? সবচেয়ে উন্নত প্রজাতি হিসেবে আমরা সৃষ্টির শীর্ষে আছি। আমাদের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য জীবিত বা অ-জীবন্ত জিনিস এর অধিকারী নয়। এটা কি? যাকে বলে বিবেক বা

যুক্তিবাদী চিন্তার শক্তি। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের বিবেককে ব্যবহার করা উচিত এবং আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য কি? আমাদের লক্ষ্য হল সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা অর্জন করা, সচ্চিদানন্দ-পরম সুখ লাভ করা। যে পথ এই অবস্থা লাভের দিকে নিয়ে যায় তা হল প্রকৃত ধর্ম। এবং এই পথ সার্বজনীন। ধর্ম প্রতিটি মানুষের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম বলতে যে ব্যাপকতা বোঝায় Religion বলতে সেই ব্যাপকতা ও দ্যোতনা বোঝায় না। সনাতন শাস্ত্রে ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা বলা আছে

"ধৃতি ক্ষমা দমোস্তেয় শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহ
ধীর্বিদ্যা সত্যম্ অক্রোধ ধর্মস্য দশলক্ষণম্।"

(ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ)

তাই পৃথিবীতে ধর্ম একটিই তা হল সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম।

অন্যদিকে Religion হল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর গোঁড়া, কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস। পৃথিবীর কোন Religion-ই মুক্ত নয়। ত্রুটিগুলি মূল মানবিক মূল্যবোধ বা সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে নয়। কোনো Religion-ই বিদ্বেষ ও রাগ থেকে মুক্ত নয়। পৃথিবীর তথাকথিত সব যুদ্ধই Religion-এর গোঁড়ামির পরিণতি। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নেতারা বা শাসকেরা নিজেদের Religion-এর প্রচার করে যখন সমাজের অন্যান্য অংশ বঞ্চিত হয়। কমিউনিজমও সমাজের বিশেষ অংশের একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস। একে Religionও বলা যেতে পারে। পুঁজিবাদও বিশ্বের গুটিকয়েক মানুষের পক্ষ নেয়। এটাও একটি Religion । **তাই ধর্ম ও Religion এক নয়। Religion হল একটি ক্ষুদ্র অংশের মানুষের জন্য, কিন্তু ধর্ম সকলের জন্য। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের এবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে এবং ধর্মকে বাদ দিয়ে Religion-কে আঁকড়ে ধরা কোনও বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা।**

চতুর্থতঃ হিন্দু সনাতন ধর্মে জাতিভেদ ও অন্যান্য যে সমস্ত কুসংস্কার আছে সেগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং ধর্মের ভিতরে থেকেই তার সংস্কার করতে হবে। মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও অন্যান্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা ব্রাহ্মণদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েও কখনও সনাতন হিন্দু ধর্মকে ছাড়ার কথা ভাবেন নি। বরং তিনি সনাতন হিন্দু ধর্মের একজন সৈনিক ও সংস্কারক হিসাবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং এবিষয়ে তিনি অনেক ব্রাহ্মণের সাহায্যও পান। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সনাতন হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকেই সংস্কার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পঞ্চমতঃ ভারতে প্রায় ৩০০০ (মতান্তরে ৬০০০) হাজার জাতি আছে। ধর্ম, কর্ম এবং অবস্থান ভেদে এদের উৎপত্তি। একটি গ্রামে যেমন একাধিক পাড়া থাকে কতকটা তেমনভাবে ভারত এই জাতিতে বিভক্ত যা ভারতকে অনন্য বৈচিত্র্য প্রদান করেছে, চিন্তা ও সংস্কৃতিকে করেছে সর্বজনীন। ভারতের প্রত্যেকটা জাতি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক একটি স্তম্ভস্বরূপ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সাধ্যানুসারে তাদের নিজ স্তম্ভের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের দেশ, ভারতমাতাকে মজবুত করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে কোনও দ্বিধা, সংকোচ না রেখে এই কাজে সামিল হতে হবে। দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সবার উপরে। নিজেদের দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি নিজেরা রক্ষা না করলে বিদেশীরা রক্ষা করতে আসবে না। আমরা আমাদের দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে না শিখলে বিদেশীরা কেন শ্রদ্ধা করবে ? প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে এবিষয়ে সচেতন হতে হবে।

ষষ্ঠতঃ সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে মাথায় রাখতে হবে যে - সে সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বলেই সে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। অন্য কোনও ধর্মে গিয়ে সে নিজেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দাবী করতে পারে না। যদি কেউ দাবী করে তাহলে তিনি একজন ভুল ব্যাখ্যাকারী। সুবিধা পাওয়ার জন্য সে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দাবী করছে কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখছে না। বরং ঐ ভুল ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তি ঔপনিবেশিক বিভাজন ও শাসন নীতির শিকার হয়েছে ধরে নিতে হবে, যারা ভারতের ক্ষতি চাইছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দাবী করা ভুল ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তিরা সনাতন হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করে সনাতন হিন্দু ধর্মকে দুর্বল করতে ব্যস্ত থাকে এবং বিদেশী সংস্কৃতিকে তারা আপন মনে করে। কিন্তু বিদেশী সংস্কৃতির দ্বারা জাতীয়তার পরিবর্তনে এরা একেবারেরই চিন্তিত নয়। এদের ভুল অবস্থানের কারণে হিন্দুরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই স্থান বিদেশী সংস্কৃতির দখলে চলে যায়। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এইসব ভুল ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এইসব ভুল ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তিরা কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্মের সুরক্ষিত এলাকায় থেকে সনাতন হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করে। সনাতন হিন্দু ধর্মের সহিষ্ণুতা এরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ। এরা যে বক্তব্য রাখে তা ইসলাম ধর্মে হলে এদের কিন্তু মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য হত, অথচ হিন্দু সনাতন ধর্মে এরা কিন্তু বহাল তবিয়তে বিচরণ করে।

অর্থাৎ এইসব ভুল ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তিরা ডালে বসে গাছকে কাটার চেষ্টা করে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এদের বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

সপ্তমতঃ সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে মনে রাখতে হবে সনাতন হিন্দু ধর্মে সে যেমন ভাবে ধর্ম পালন করতে চায় তেমন ভাবে ধর্ম পালন করতে পারে। কেউ জাতপাত বিশ্বাস না করলে সে বৈষ্ণব হিসাবে ধর্ম পালন করতে পারে, কারণ বৈষ্ণবরা জাতপাতে বিশ্বাস করে না। কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেও সে সনাতন হিন্দু ধর্মে থাকতে পারে। ইসলাম ধর্মে যার অনুমোদন নেই। আবার বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না - এখানে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের জায়গা নেই। সনাতন হিন্দু ধর্মই একমাত্র ধর্ম্, যে ধর্ম মানুষ নিজের ইচ্ছামত বিশ্বাস অনুসারে পালন করতে পারে এবং তাতে কেউ বাঁধা প্রদান করে না। এমনকি সনাতন হিন্দু ধর্মের নিন্দা ও সমালোচনাকারীরাও এখানে নির্ভয়ে থাকতে পারে। অন্য অনেক ধর্মে যা কল্পনা করা যায় না। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সচেতন থাকতে হবে - যারা সনাতন হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করছে তারা ধর্মের বাইরে অন্য কোনও উদ্দেশ্য সাধন করতে চাইছে।

তাহলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের করনীয় কি ?
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শিকড় ত্যাগ করা চলবে না অর্থাৎ সনাতন হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে। সনাতন হিন্দু ধর্ম হল একটি মহাসাগর, যেখানে নদীরূপ সকল ধারা মিসেছে। তাই এর থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামক নদী না মিশলেও সনাতন হিন্দু ধর্মের কোনও লাভ বা ক্ষতি নেই কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সার্বিক ক্ষতি। ভারতে শকরা ৫০০ বছর রাজত্ব করেছিল। আজ ভারতে তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। কুশানরা ২০০ বছর রাজত্ব করেছিল। আজ তাদেরও কোনও আস্তিত্ব নেই। সনাতন হিন্দু ধর্মের গ্রহণ করার ক্ষমতা অপরিসীম। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের সাথেই থাকতে হবে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিচয়টা সনাতন হিন্দু ধর্মে থাকার জন্যই।

দ্বিতীয়তঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় থাকতে হবে। কোনও একটি রাজনৈতিক দলে নাম লেখালে চলবে না। সমর্থন হবে ইস্যু ভিত্তিক।

তৃতীয়তঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনগুলিকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে এবং সংগঠনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয় ছাড়া অন্য কোনও বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া চলবে না। কোনও

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন যেন কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মকেন্দ্র না হয়।

চতুর্থতঃ নিবিড় প্রচার যে কোনও আন্দোলনকে সচল রাখে ও তার গণভিত্তি তৈরি করে। তাই এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পঞ্চমতঃ সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক দায়িত্ব প্রদান করতে হবে এবং নতুন নেতৃত্ব তুলে আনতে হবে।

ষষ্ঠতঃ গবেষণা ও প্রকাশনাতে জোর দিতে হবে। যুক্তি দিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের কথা বলতে হবে। জনমত তৈরি করতে হবে এবং পথ দেখাতে হবে।

আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলি এখানে এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে নিম্নলিখিত দাবীসমূহকে সামনে রেখে আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনকে আবার সক্রিয় করে তুলতে পারি -

1. সকল সরকারী নথিতে ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতি শংসাপত্রে 'পৌণ্ড্র' শব্দের সঙ্গে **'ক্ষত্রিয়'** যোগ করে **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'** করতে হবে।
2. **মকর সংক্রান্তির দিন জাতীয় ছুটি** ঘোষণা করতে হবে।
3. **সুন্দরবনে মহাত্মা কপিল মুনির নামে 'কপিল মুনি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**
4. ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে **"মহাত্মা রাইচরণ সরদার বিশ্ববিদ্যালয়"** করতে হবে।
5. **সরকারকে "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ"** গঠন করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উন্নতির তদারকি করতে হবে এবং তাতে শুধুমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনরাই থাকবেন।
6. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভায় অন্তত একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে **পূর্ণমন্ত্রী** হিসেবে রাখতে হবে।
7. পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্তত একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে **রাজ্য সভার সাংসদ** করতে হবে।
8. সুন্দরবনের **পানীয় জল সমস্যার সমাধানের জন্য পাইলট প্রোজেক্ট** গ্রহণ করতে হবে।
9. সুন্দরবনের নদীগুলির উপর **সেতু নির্মাণ** করতে হবে যাতে কোনও দ্বীপ বিচ্ছিন্ন না থাকে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনদের নামে নামকরণ করতে হবে।
10. সুন্দরবনের সঙ্গে কলকাতার ও জেলার অন্য অংশের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য নতুন রোড পারমিট প্রদান ও বাস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
11. সুন্দরবনে রেলপথের সম্প্রসারণ করতে হবে।
12. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে তাদের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করতে হবে।
13. সুন্দরবন ও মেদিনীপুর জেলার নদীবাঁধগুলি কংক্রিটের দ্বারা স্থায়িত্ব বিধান করতে হবে।
14. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্মৃতি বিজড়িত পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করতে হবে এবং মিউজিয়াম নির্মাণ করতে হবে।

15. হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে **"ব্রহ্মচারী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়"** করতে হবে।
16. পূর্ব মেদিনিপুরে ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ রইল - তারা যেন আমার বক্তব্য ও প্রস্তাব সহমর্মিতার সাথে গ্রহণ করেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সকলের মঙ্গল কামনা করি।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

* 15ই আগস্ট, ২০২৫ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ, গড়িয়াতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

পুস্তক পর্যালোচনা

পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা: আত্মমর্যাদার দলিল ও জাগরণের বার্তা

১. ভূমিকা: এক ঐতিহাসিক প্রয়াসের প্রতিধ্বনি

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদার দীর্ঘ আন্দোলনকে একটি প্রামাণ্য দলিলে লিপিবদ্ধ করার এক মহৎ প্রয়াস হলো "পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা" (Pabitra Poundra Kshatriya Samhita)। এই গ্রন্থটি কেবল একটি বই নয়, এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করা একটি জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর। সংহিতাটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ সৃষ্টি করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই পর্যালোচনায় আমরা গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সমাজের ওপর এর সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাবগুলি বিশ্লেষণ করব।

২. আত্ম-আবিষ্কারের মূলমন্ত্র ও সংহিতার উদ্দেশ্য

গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য হলো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের চেতনা জাগানো। ঔপনিবেশিক এবং পরবর্তী সময়ে

সামাজিক ভেদাভেদের কারণে যখন এই জনগোষ্ঠীর প্রকৃত পরিচয় চাপা পড়ে যাচ্ছিল, তখন এই সংহিতা তাদের ঐতিহাসিক শিকড়, পৌরাণিক সংযোগ এবং প্রাচীন পুণ্ড্র-বর্দ্ধন রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের প্রামাণ্য তথ্য তুলে ধরেছে। এটি কেবল ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয় ও মর্যাদা রক্ষায় যে আন্দোলন হয়েছিল, তার তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেছে। সংক্ষেপে, সংহিতাটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মমর্যাদার সনদ হিসেবে কাজ করেছে।

৩. ঐতিহাসিক তথ্যের প্রামাণ্যতা ও নির্ভুলতা

"পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা"-র সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো এর গভীর গবেষণাধর্মী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। গ্রন্থটির রচয়িতারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়, প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত নেতাদের অবদান (যেমন রায়চরণ সর্দার, বেণীমাধব হালদার প্রমুখ) এবং সরকারি নথিপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন। বিভিন্ন পুরাণ, প্রাচীন শিলালিপি, এবং ব্রিটিশ আমলের জনগণনার তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এটি সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয় মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানকে যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ঐতিহাসিক তথ্যের এই সুসংবদ্ধ উপস্থাপনাই গ্রন্থটিকে এক বিশেষ প্রামাণ্য মূল্য দিয়েছে।

৪. সামাজিক সংস্কার ও আদর্শের রূপরেখা

ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি এই সংহিতাটি সমাজের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। সামাজিক কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, এবং শিক্ষাহীনতার মতো সমস্যাগুলি দূর করতে এটি এক আদর্শ জীবনধারার রূপরেখা তৈরি করেছে। এই গ্রন্থ প্রথাগত আচার-আচরণ, ধর্মীয় কৃত্য এবং সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের নিজস্বতা ও উচ্চ আদর্শকে প্রতিফলিত করে। এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন, নৈতিকতা এবং প্রগতিশীলতাকে উৎসাহিত করার একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।

৫. ঐক্য ও সংহতির আহ্বান: সাংগঠনিক দলিল হিসেবে গুরুত্ব

সংহিতাটি শুধু ইতিহাস বা আদর্শের কথা বলে না, এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে বৃহত্তর ঐক্য ও সাংগঠনিক সংহতির আহ্বান জানায়। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা এই সম্প্রদায়কে এক ছাতার তলায় আনার জন্য এটি এক সাধারণ মঞ্চ ও অভিন্ন আদর্শের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। গ্রন্থটির কাঠামো এমনভাবে তৈরি হয়েছে, যাতে তা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং সম্মিলিতভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। এটি এক সামাজিক-রাজনৈতিক দলিল হিসেবে সমাজের সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

৬. শিক্ষার গুরুত্ব ও নবীন প্রজন্মের দিশা

গ্রন্থটিতে শিক্ষাকে উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে বারবার জোর দেওয়া হয়েছে। এটি সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নত করতে অনুপ্রাণিত করে। সংহিতাটি তরুণদের শেখায় যে, কিভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা শুধুমাত্র শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সামাজিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতামূলক সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে গ্রন্থটি নবীন প্রজন্মকে নিজেদের শিকড় ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের প্রতি সচেতন করে তোলে।

৭. নারী জাগরণ ও ক্ষমতায়নের বার্তা

"পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা" সমাজে মহিলাদের স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে একটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এটি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেয়। এই ধরনের একটি ইতিবাচক বার্তা সমাজে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে সহায়ক হবে। এটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রগতির পথ প্রশস্ত করে।

৮. আত্মবিশ্বাস ও অহংকারের প্রতীক

এই সংহিতা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে এক নতুন আত্মবিশ্বাস ও অহংকারের জন্ম দিয়েছে। শতবর্ষের সামাজিক বঞ্চনা এবং অপপ্রচারের ফলে যে মানসিক অবসাদ তৈরি হয়েছিল, তা দূর করতে বইটি এক শক্তিশালী প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। এটি প্রমাণ করে যে, এই সম্প্রদায়কে ইতিহাসের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হলেও, তাদের ঐতিহ্য ও রক্তে থাকা শৌর্য কখনো ম্লান হয়নি। এই আত্মবিশ্বাসই ভবিষ্যতে আরও বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করবে।

৯. বৃহত্তর সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব

"পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা" শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বৃহত্তর বাঙালি সমাজে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। এটি দেখায় যে, কিভাবে একটি দলিত বা তপশিলি সম্প্রদায় নিজেদের ইতিহাসকে পুনঃলিখন এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে সম্মানিত স্থান অর্জন করতে পারে। এটি অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আত্ম-উত্থানের আন্দোলনেও অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে এবং সমাজের সকল স্তরে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমানাধিকারের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে।

১০. উপসংহার: ভবিষ্যতের পথনির্দেশক

"পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা" হলো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের জাগরণের এক অপরিহার্য গ্রন্থ। এটি অতীত, বর্তমান ও

ভবিষ্যতের এক সেতুবন্ধন। প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য, সামাজিক সংস্কারের আহ্বান, এবং ঐক্য ও শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকার — সব মিলিয়ে এই সংহিতাটি এক ইতিবাচক শক্তির উৎস। যারা নিজেদের পরিচয় জানতে চান, নিজেদের ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে চান এবং সমাজের উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি মূল্যবান ও অবশ্যপাঠ্য দলিল। এই গ্রন্থ ভবিষ্যতেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের গৌরবময় যাত্রার পথনির্দেশক হয়ে থাকবে।***

বই-এর নাম - পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা

লেখক - শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

প্রকাশ কাল - নভেম্বর, ২০২৩

প্রকাশক - রোহিণী নন্দন, কলকাতা

ISBN NO. 978-81-19574-39-1

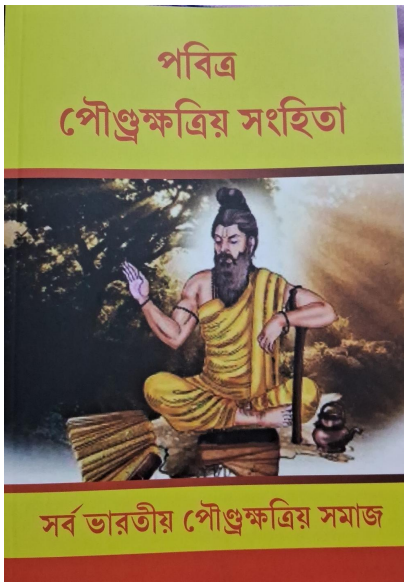

ভারতবর্ষে প্রায় ৩ হাজারের বেশি খ্রিষ্টীয় সংস্থা এবং প্রায় ২৭০০-এর বেশি ইসলামী সংস্থা ধর্মান্তরকরণ করে চলেছে (অবক্ষয়িত তপশিলী সমাজ- শ্রী প্রশান্ত প্রামানিক) অথচ আমরা সব ধর্ম সমান বা যত পথ তত মত জপ করে চলেছি। যদি সব ধর্ম সমান হয় বা সব পথে ইশ্বরকে পাওয়া যায় তবে ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজন কোথায় ? তাহলে কেন ধর্মান্তরকরণ করা হয় ? এ বিষয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে এবং নিজ দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে।

-পত্রিকা সম্পাদক।।

"আমি একা গিয়ে কি করবো বা আমার একার দ্বারা কি হবে এরূপ নেতিবাচক ভাবনা অনেক ভালো কাজের অন্তরায়। বরং এটাই ভাবুন আমি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য যতটুকু পারবো তত টুকু করব, কারুর মুখাপেক্ষী না হয়ে করব। মনে রাখতে হবে, আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মজাগরণ ঘটে। তাই আত্মজাগরণ হল স্বজাতি জাগরণের প্রাধান উপায়। নিজের পকেটে পয়সা না থাকলে যেমন অপরকে পয়সা দেওয়া যায় না, তেমনি নিজেকে আত্মজাগরিত করতে না পারলে অপরকে জাগরিত করা সম্ভব নয়। তাই নিজেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য কাজ করা শুরু করুন। তারপর দেখবেন অনেকেই আপনাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসছে।"

-পত্রিকা সম্পাদক।।

"বর্বরদের কোনও ইতিহাস থাকেনা"

- মহাত্মা রাইচরণ সরদার

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ

1. সকল সরকারী নথিতে ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতি শংসাপত্রে পৌণ্ড্র শব্দের সঙ্গে **'ক্ষত্রিয়'** যোগ করে **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'** করতে হবে।
2. মকর সংক্রান্তির দিন জাতীয় ছুটি ঘোষণা করতে হবে।
3. **মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**
4. **সুন্দরবনে মহাত্মা কপিল মুনির নামে 'কপিল মুনি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**
5. **সরকারকে "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ"** গঠন করতে হবে এবং তাতে শুধুমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনরাই থাকবেন।
6. **পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভায় অন্তত একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে রাখতে হবে।**
7. সুন্দরবন ও মেদিনীপুর জেলার নদীবাঁধগুলি কংক্রিটের দ্বারা স্থায়িত্ব বিধান করতে হবে।
8. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্মৃতি বিজড়িত পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করতে হবে এবং মিউজিয়াম নির্মাণ করতে হবে।
9. **সুন্দরবনের পানীয় জল সমস্যার সমাধানের জন্য পাইলট প্রোজেক্ট গ্রহণ করতে হবে।**
10. **হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হেমনগরের 'কল্পগঙ্গা ও কপিল মুনি মেলা'র পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।**
11. হাসনাবাদ থেকে হেমনগর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করতে হবে।
12. রাজনৈতিক নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ে, সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
13. হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে **"ব্রহ্মচারী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়"** করতে হবে।
14. সুন্দরবনের নদীগুলির উপর সেতু নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনদের নামে নামকরণ করতে হবে।
15. সুন্দরবনের সঙ্গে কলকাতার ও জেলার অন্য অংশের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য নতুন রোড পারমিট প্রদান ও বাস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
16. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে তাদের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করতে হবে।
17. পূর্ব মেদিনিপুরে ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের

নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

18. দক্ষিণ রায়, বেণী মাধব দেব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার, ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ, ঈশানচন্দ্র কামার, পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি কাব্যসাগর, স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বদেশী গৌরহরি বিশ্বাস, জনসেবক অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর, স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের নামে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
19. শহীদ গঙ্গাহরি দাসের নামে সাগরদ্বীপে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
20. ইতিহাস পথিক নরোত্তম হালদার মহাশয়ের নামে একটি ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
21. স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পুঁথি বিশেষজ্ঞ অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
22. সমাজদরদী শক্তিকুমার সরকারের নামে সুন্দরবনে একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও একটি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
23. সঙ্গীতসাধক ভীমচন্দ্র সরদারের নামে সঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
24. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দরদী হেমচন্দ্র নস্করের নামে একটি উপনগরীর নাম রাখতে হবে।
25. সমাজসেবী ডাক্তার রাধানাথ সরকারের নামে একটি নার্সিং কলেজ মুর্শিদাবাদ জেলাতে গড়ে তুলতে হবে।
26. মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে সুন্দরবনে একটি ট্যুরিজম কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
27. বসন্তকুমার মণ্ডল মহাশয়ের নামে টালিগঞ্জের একটি সরকারী স্টুডিওর নামকরণ করতে হবে।
28. শিক্ষাব্রতী ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের নামে একটি ছাত্রাবাসের নাম করণ করতে হবে।
29. স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা একটি দূর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।
30. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিপ্লবী মনীন্দ্রনাথ মণ্ডলের নামে মেদিনীপুরের একটি স্কুলের নামকরণ বা নতুন স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
31. মথুরাপুর লোকসভার একটি কিষানমান্ডির নাম কংসারী হালদারের নামে রাখতে হবে।
32. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে একটি করে স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার গড়ে তুলতে হবে।
33. প্রতিটি ব্লকের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অন্তত ১০০ শিক্ষার্থীকে ইংলিশ মিডিয়ামে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।
34. প্রতিটি ব্লকে কিছু প্রাইমারী স্কুলকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে উন্নীত করতে হবে।

35. হিঙ্গলগঞ্জ, ন্যাজাট, দৌলতপুর, বিষ্ণুপুর, আমতলা, কৃপারামপুর, বলরামপুর, রায়পুর, রামেস্বরপুর, রামচন্দ্রপুর, চম্পাহাটি, কালিকাপুর বারাসাত, নিমপীঠ ও তুলসীঘাটা, বিদ্যাধরপুর, বাসন্তি, তালদি, দীঘিরপাড়, মাখালতলা, ঢোলা, অযোধ্যানগর, চাঁদপুর, বংশীধরপুর, কৃষ্ণচন্দ্র পুর, মথুরাপুর ইত্যাদি জনগণনা শহরকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করতে হবে।
36. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে ফায়ার ব্রিগেড অফিস বানাতে হবে ও টীম রাখতে রাখতে হবে।
37. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে কোল্ডস্টোরেজ বানাতে হবে।
38. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত দুটি করে রাইস মিল বানাতে হবে।
39. মৎস্যজীবীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আধুনিক সরঞ্জাম প্রদান করতে হবে এবং উপযুক্ত বিমার ব্যবস্থা করতে হবে।
40. পরিবেশের ক্ষতি না করে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন করতে হবে। এই শিল্পে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ করতে হবে।
41. বিনোদন পার্ক নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে তার নামকরণ করতে হবে।
42. সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে এবং প্রতিটি ব্লককে রেল নেটওয়ার্কে জুড়তে হবে।
43. রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এলাকায় বিশেষ নজর দিতে হবে।
44. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের পরিবেশের মান বজায় রাখার জন্য নদীর তীরগুলিতে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।
45. লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়াতে হবে ও ডিজিটালাইজড করতে হবে।
46. প্রতি ব্লকে একটি হাসপাতাল এবং প্রতি গ্রামে একটি করে হেলথ সেন্টার নির্মাণ করতে হবে।
47. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের নদী তীরস্থ প্রতিটি গ্রামে স্থায়ী শ্মশাণ ঘাট ও শ্মশাণ যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুম বানাতে হবে।
48. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের প্রতিটি ব্লকে DISASTER MANAGEMENT-এর শাখা গড়ে তুলতে হবে এবং স্থানীয় যুবদের সেখানে যুক্ত করতে হবে।
49. প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে চাকরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
50. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী স্বর্ণময়ী মণ্ডল, অষ্টমী ঢালী, মোক্ষদা নস্কর প্রমুখের নামে মহিলা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।
51. গ্রাম, পৌরসভার নাম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে রাখতে হবে।

***

SARBA BHARATIYA POUNDRAKSHATRIYA SAMAJ

1ST CONFERENCE ON 23/01/2024 AT RASBIHARI INSTITUTION FOR GIRLS, BARASAT

INCOME AND EXPENDITURE REPORT

INCOME

INCOME BY DONATION			
SL NO	NAME	AMOUNT (RS/-)	TOTAL
1	SRI PARIMAL KUMAR BISWAS	10000/-	
2	SRI PANKAJ KUMAR MANDAL	10000/-	
3	SRI SWAPAN KUMAR MANDAL	10000/-	
4	SRI UTTAM MANDAL	5000/-	
6	SRI DILIP KUMAR MANDAL	5000/-	
7	SRI CHIRANTAN MANDAL	500/-	
TOTAL			40500/-

INCOME

INCOME BY REGISTRATION & DELEGATE FEE			
SL NO	NAME	AMOUNT (RS/-)	TOTAL
	BY SRI SWAPAN KUMAR MANDAL	5200/-	
	BY SRI PANKAJ KUMAR MANDAL	2800/-	
	BY UTTAM MANDAL	2000/-	
	SRI DILIP KR MANDAL	600/-	
	EXTRA	400/-	
TOTAL			11000/-
GRAND TOTAL			51500/-

EXPENDITURE

INCOME BY REGISTRATION & MEMBERSHIP FEE			
SL NO	NAME	AMOUNT (RS/-)	TOTAL
1	2 BOOKS PUBLICATION AND CONVEYANCE	19500/-	
2	LUNCH PACKETS	13300/-	
3	PRESS AND PRINTINGS	4720/-	
4	FOLDER AND PEN	1100/-	
5	HALL AND ROOM RENT	700/-	
6	CORDLESS	200/-	

	MICROPHONE		
7	**FEEDBACK FORM XEROX**	**250/-**	
8	**PROGRAM SCHEDULE XEROX AND NETAJI PHOTO**	**230/-**	
9	**REGISTER BOOK, PAPER AND TAPE**	**110/-**	
10	**FLOWERS (SKM+ DILIP+SOURABH)**	**510/-**	
11	**FRUITS 2 PACKETS AND WATER**	**270/-**	
12	**CANDLE**	**70/-**	
13	**PHOTO, PRINT AND SWEETS FOR GUEST**	**510/-**	
14	**TIFFIN**	**200/-**	
15	**FLEX**	**600/-**	
16	**WATER, TEA AND CLEANLINESS**	**1000/-**	
TOTAL			**43,270/-**
INCOME			**51500/-**
BALANCE			**8230/-**
Website Making			**8230/-**
BALANCE			**00**

Income & Expenditure Report of 2nd Conference on 14th Janauary 2025 at Hemnagar

SL NO	ITEMS	AMOUNT	REMARKS
1	Lodging & fooding	14300.00	48 person
2	PKD Print	5600.00	100 copy
3	Flex Print	2180.00	16 pieces
4	Decorators (sound, light, stage, chair, book stall and exhibition)	2001.00	For Temple construction
Total		24081.00	535.13 / Per Head
	Income (200 x 42)	8400.00	
	Deficit	**15681.00**	Paid by Swapan Kumar Mandal

সাবধানতা* পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন অনুপ্রবেশকারীদের কাছে জমি, দোকান, বাড়ি বিক্রি না করেন। এমনকি ভাড়াও দেবেন না।

হেমনগরের ‘কল্পগঙ্গা ও কপিল মেলা’: পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নবতীর্থক্ষেত্র

হেমনগরের **কল্পগঙ্গা ও কপিল মেলা** হলো পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন অংশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এক **গৌরবোজ্জ্বল, পর্যটন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দু**। এই মেলা আজ আর কেবল একটি স্থানীয় উৎসব নয়; এটি **পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের আত্মমর্যাদা, সংহতি এবং ঐতিহ্যের পুনরুত্থানের** এক উজ্জ্বল প্রতীক, যা এই সমাজকে এক নতুন ও ইতিবাচক পথে পরিচালিত করছে। মেলাটি এই সমাজের কাছে এক **নতুন তীর্থক্ষেত্র** হিসেবে স্বীকৃত, যা তাদের সম্মিলিত শক্তি ও ভবিষ্যতের আশাকে মূর্ত করে তুলবে আশা করা যায়।

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা দুর্গম ও ব্যয়সাধ্য হওয়ায়, হেমনগরের নদীকে **‘কল্পিত গঙ্গা’** রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত এই সমাজের জন্য এক **বরদান** স্বরূপ। এটি তাদের দীর্ঘদিনের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ করে দিয়েছে। মকর সংক্রান্তির পবিত্র তিথিতে এখানে পুণ্যস্নান করার মাধ্যমে তারা মন ও আত্মাকে শুদ্ধ করার এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে।

কপিল মুনি এবং গঙ্গা দেবীর প্রতি ভক্তি প্রকাশের এই মঞ্চটি স্থানীয় সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সাথে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। ফলে, সমাজের মানুষজন এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি **অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও নিষ্ঠার** সঙ্গে পালন করতে পারে, যা তাদের আত্মিক শান্তি এনে দেয়।

হেমনগর কল্পগঙ্গা ও কপিল মেলা কপিল মুনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রাচীন হিন্দু পুরাণের সঙ্গে সম্পর্কিত। কপিল মুনিকে ঘিরে থাকা সবচেয়ে বিখ্যাত উপাখ্যানটি হলো রাজা সগরের ষাট হাজার পুত্রের মুক্তির কাহিনী। রাজা সাগরের ষাট হাজার পুত্র ভুলবশত কপিল মুনিকে অপমান করলে, মুনির ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে তারা ভস্মীভূত হয়ে ছাই হয়ে যান । এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে এবং পুত্রদের আত্মার শান্তির জন্য পবিত্র গঙ্গা নদীকে পৃথিবীতে নিয়ে এসে সেই ছাইয়ে স্নান করানো আবশ্যক ছিল । রাজা ভগীরথ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মুক্তির জন্য গঙ্গাকে হিমালয় থেকে নিয়ে আসেন এবং মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গার প্রবাহধারার সংস্পর্শে রাজা সগরের ষাট হাজার পুত্রের মুক্তি ঘটে, গঙ্গা ঐ দিন সাগরে মিলিত হন। এই উপাখ্যানের প্রভাবে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা ও সাগরের মিলনস্থল (গঙ্গাসাগর) পুণ্যস্নানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যার

আঞ্চলিক ধারা হিসেবে হেমনগর মেলা এই মহৎ ঐতিহ্য বহন করে।

সুন্দরবনের মানুষের জীবনে হেমনগর কল্পগঙ্গা মেলার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, যা স্থানীয় জনগণের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে তুলে ধরে। 'কল্পগঙ্গা' শব্দটি গভীরভাবে প্রতীকী, যা কল্পনা বা বিকল্প গঙ্গাকে বোঝায়। যেহেতু সুন্দরবনের নদীপথের বিচ্ছিন্নতা এবং লবণাক্ততা সাগরদ্বীপের মূল তীর্থযাত্রা (গঙ্গাসাগর) কঠিন করে তোলে, তাই হেমনগরের স্থানীয় নদী বা খাঁড়িকে কপিল মুনির আশীর্বাদে পবিত্র গঙ্গাসাগরের সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়। স্থানীয় মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের এক সার্থক কৌশল।

এছাড়া মনে করা হয় যে, সুন্দরবনের হেমনগরের নদীগুলি **(পঞ্চ নদী - রায় মঙ্গল, গোমতী, কালিন্দী, ঝিলা ও বাঘনা)** ও তার লোকালয়গুলি পবিত্র গঙ্গার জলে পুষ্ট। সাগর ও নদীতে জোয়ার ভাঁটা হয়। মনে করা হয় গঙ্গা সাগরে মিলিত হবার পর জোয়ারে সেই জল সুন্দরবনের নদীগুলিকে প্লাবিত করে। তাই হেমনগর গঙ্গাসাগর সমতুল্য তীর্থক্ষেত্র। সাগরে স্নানে যে তীর্থফল হেমনগরের পঞ্চনদীর মিলনতীর্থে স্নান সেই একইরকম ফলপ্রদ। এটা কল্পনা করেই এই তীর্থক্ষেত্রের নাম দেওয়া হয়েছে কল্পগঙ্গা। আর এই স্থানে স্নানকে কেন্দ্র করে মেলা বসে যাকে বলা হয় কপিল মেলা। দুটিকে একসাথে করে নামকরণ **"কল্পগঙ্গা ও কপিল মেলা"** যা অত্যন্ত বিবেচনা প্রসূত।

মহর্ষি কপিল মুনিকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তাদের পূর্বপুরুষ মনে করেন। তাই মেলাটি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের সামাজিক জীবনে এক শক্তিশালী **সংহতি ও ইতিবাচক উদ্দীপনা** সৃষ্টি করেছে। প্রতি বছর এই মেলা সমাজের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা হাজার হাজার মানুষকে একত্রিত করে এক বৃহত্তর **পারিবারিক বন্ধন** সৃষ্টি করে।

মেলা আয়োজন ও পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের অভ্যন্তরে এক **শক্তিশালী, সংগঠিত এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্ব** গড়ে উঠেছে। এই নেতৃত্ব স্থানীয় প্রশাসন ও বৃহত্তর সমাজের সাথে সফলভাবে সহযোগিতা করে মেলার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে, যা সমাজের সাংগঠনিক দক্ষতার এক চমৎকার উদাহরণ। মেলায় সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সুশৃঙ্খল আয়োজন, বৃহত্তর জনসমক্ষে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের **সম্মানজনক উপস্থিতি এবং ইতিবাচক পরিচিতি** প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এটি সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে।

মেলা প্রাঙ্গণে লোক-নৃত্য, লোক-সংগীত, এবং ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টির প্রদর্শনী হয়। এটি সমাজের **সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ** এবং নতুন প্রজন্মের কাছে **গৌরবের সঙ্গে** তুলে ধরার একটি

মঞ্চ। যুব সমাজ নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত ও অনুপ্রাণিত হয়। মেলা উপলক্ষে স্থানীয় **কুটির শিল্প, হস্তশিল্প এবং কৃষি পণ্যের** বিশাল বাজার বসে। এটি সমাজের বহু কারিগর, শিল্পী ও ছোট ব্যবসায়ীকে তাদের পণ্য সরাসরি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে **আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী** হওয়ার এক চমৎকার সুযোগ করে দেয়। এটি স্থানীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে অত্যন্ত কার্যকর।

হেমনগরের কল্পগঙ্গা ও কপিল মেলা আজ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের কাছে এক **ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতীক**। এটি কেবল পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি প্রথা নয়, বরং **ঐক্য, সংহতি এবং আত্ম-উন্নয়নের** পথপ্রদর্শক। এই মেলা প্রতিটি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়কে তাদের **ঐতিহ্য, শক্তি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের** কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি এই সমাজের পুনরুত্থানের এক জীবন্ত উদাহরণ—যেখানে বিশ্বাসের স্রোতধারা তাদের সামগ্রিক উন্নতি ও সামাজিক গৌরবের দিকে চালিত করছে। মেলাটি এই সমাজের কাছে এক **নতুন তীর্থক্ষেত্র** হিসেবে স্বীকৃত, যা তাদের সম্মিলিত শক্তি ও ভবিষ্যতের আশাকে মূর্ত করে তোলে।

হেমনগরের কল্পগঙ্গা ও কপিল মেলা ২০০২ সালে মকর সংক্রান্তির দিন শুরু হয়। মেলার প্রধান উদ্যোক্তা হলেন **শ্রী অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনিই প্রথম স্থানীয় কয়েকজন গুণী মানুষদের নিয়ে এই মেলার সূচনা করেন।** প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুরু হয়। মেলার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমান মেলা কমিটির সভাপতি হলেন শ্রীমুরারী মোহন মণ্ডল মহাশয় এবং সম্পাদক হলেন শ্রী সরোজ কান্তি মিস্ত্রী মহাশয়। দুজনেই অত্যন্ত ভালো মানুষ। সরোজবাবু দক্ষ সংগঠক, সুবক্তা এবং সঙ্গীত বিশারদ। তাঁর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীত মনোমুগ্ধকর। অত্যন্ত শৃঙ্খলা পরায়ণ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের গর্ব। মেলা ব্যবস্থাপনায় শ্রীসমাজ কল্যাণ মণ্ডল, শ্রীশেখর মণ্ডল, শ্রীপ্রদীপ মণ্ডল, শ্রীপ্রভাস মণ্ডল, শ্রীমলয় কুমার মণ্ডল প্রমুখের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘোষক হিসেবে শ্রীসমীর মজুমদার অতুলনীয় ও ক্লান্তিহীন।

মেলা কমিটি ইতিমধ্যে **'মা গঙ্গা ও কপিল মুনি মন্দির'**-এর জন্য ভূমির ব্যবস্থা করেছেন এবং সেখানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ কার্য চলছে। পরিকল্পনা বেশ নিখুঁত।

মেলায় স্নানের জন্য জেটিঘাট, মল-মূত্র ত্যাগের বিশেষ ব্যবস্থা, পর্যটকদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা কর্মীদের আন্তরিকতা, মন্দিরে পূজা দেওয়ার সুযোগ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি এই মেলার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলেছে। জেটিঘাট থেকে জাহাজ ও সুন্দরবন দর্শন এই মেলায় অংশগ্রহণকারীদের বাড়তি আকর্ষণ হিসাবে কাজ করে।

এই মেলা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রামের মেলা। মেলার আয়োজকরাও বেশিরভাগ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, এমনকি মেলাতে যোগদানকারী মানুষরাও বেশিরভাগ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। মা গঙ্গা ও কপিল মুনিও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অত্যন্ত পূজিত। মহর্ষি কপিল মুনি আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ। তাই এই মেলাকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের তীর্থস্থান হিসেবে দেখা হয়। প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের উচিত মকর সংক্রান্তির দিন এই তীর্থক্ষেত্রে স্নান করা ও মেলায় অংশগ্রহণ করা। **হেমনগরের 'কল্পগঙ্গা ও কপিল মেলা'র** শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।***

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন

ইছামতি সংবাদ, ২৫ জানুয়ারি : বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ এর হেমনগর কল্প গঙ্গা সাগর মেলার মঞ্চে হয়ে গেল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন। গত ১৪ জানুয়ারি সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ এর উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল এই সম্মেলন।

কল্প গঙ্গা স্নান উপলক্ষ্যে হেমনগর মাঠে অনুষ্ঠিত হয় কপিল মুনির মেলা। কল্প গঙ্গা সাগর কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কপিল মেলার মঞ্চ থেকেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ এর বার্ষিক সভার ডাক দেন সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক শ্রী সৃপন কুমার মণ্ডল মহাশয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার বেশ কিছু জেলার কর্মকর্তারা। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন এর মঞ্চ থেকে সংস্থার আগামী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত বক্তারা। কপিল মুনি মেলার মাঠে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ এর একটি স্টলও এর মাধ্যমে এই সমাজের বহু গুনী মানুষের জীবনী তুলে ধরা হয় নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের জন্যে। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ' নামে সংস্থার একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয় যার সম্পাদনা করেন সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক শ্রী সৃপন কুমার মণ্ডল।

ইছামতি সংবাদ, ২৫শে জানুয়ারি, ২০২৫

গঙ্গাসাগরের বিকল্প হেমনগরের কল্প-গঙ্গাস্নান ও কপিল মেলা

পরিমল দে
বসিরহাট। ১৪ জানুয়ারি

মকর সংক্রান্তির পুণ্য স্নানের লক্ষ্যে বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের হেমনগর ঘাটে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ছিল সাধারণ মানুষের ঢল। বসেছে কল্প গঙ্গাসাগর মেলা।

গঙ্গাসাগর মেলার ধাঁচে বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হেমনগরে গত ২৪ বছর ধরে চলছে এই কল্প গঙ্গাসাগর মেলা। হেমনগর ঘাটে মকর সংক্রান্তির স্নান উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ছিল সাধারণ মানুষের ভিড়। মকর সংক্রান্তির পুণ্য স্নানের মধ্য দিয়ে পুণ্য অর্জনের জন্য বাঘনা, ঝিলা, কালিন্দী, গোমতী ও রায়মঙ্গল এই পাঁচ নদীর মোহনায় হেমনগর ঘাটে স্নানযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন আগত দর্শনার্থীরা। কল্প গঙ্গাস্নানযাত্রা উপলক্ষে হেমনগর ঘাটে ছিল প্রশাসনের কড়া নজরদারি। স্নানযাত্রায় যাতে কোনও রকম দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য যেমন ভাবে দেখা যায় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যদের, তেমনই হেমনগর কোস্টাল পুলিশ ও প্রশাসনের কড়া নজরদারির মধ্যে দিয়ে হেমনগর ঘাটে চলে স্নানপর্ব। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক ছাড়াও বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ, সন্দেশখালি সহ কলকাতা থেকেও প্রচুর মানুষের সমাগম হয় কল্প গঙ্গাসাগরে। মকরসংক্রান্তি মেলা উপলক্ষে নির্মীয়মাণ গঙ্গা দেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে বসেছে বিশাল মেলা। আঞ্চলিক মেলা হিসাবে মাটির হাঁড়ি ও মাদুর-গামছার পাশাপাশি রেডিমেড পোশাক সহ শীতবস্ত্র ও ঘর সাজানোর সামগ্রী নিয়েও মেলায় হাজির হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। রয়েছে নাগরদোলা ও খাবারের স্টল। কপিল মুনির বংশধর হিসাবে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সংগঠনের স্টলও রয়েছে কল্প গঙ্গামেলার মাঠে।

স্বর্গীয় মিহির চন্দ্র গায়েন

স্বর্গীয় মিহির চন্দ্র গায়েন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। 1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুর উত্তাল হয়ে ওঠে। যে মিছিলে মাতঙ্গিনী হাজরা গুলিবিদ্ধ হন সেই মিছিলে মাতঙ্গিণী হাজরার সঙ্গে ছিলেন মিহির বাবু। 1993 সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত সরকার দিল্লীতে একটি অনুষ্ঠান করে, সেখানে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মাত্র 3000 জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মিহির বাবু ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। ইনি পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

উপরের ছবিতে যা কে দেখছেন তিনি হলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম স্নাতক (গ্র্যাজুয়েট) মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের ভাইয়ের ছেলের ছেলে। পৈতা গলায় দেওয়া। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ যে আর্য এবং ক্ষত্রিয় তা এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। কালের নিয়মে অনেকেই এই আর্য এবং ক্ষত্রিয় রীতি অর্থাৎ পৈতা পরিধান করেন না। ‘পৌণ্ড্র’ শব্দের অর্থ ‘তিলক’, তবুও তিলক চিহ্ন কপালে ধারণ করেন না। তাই তো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অধঃপতিত হয়েছে। প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের উচিত পৈতা পরিধান করা ও তিলক ধারণ করা, যাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করা যায়। আচার ভুলে গেলে জাতি যে অধঃপতিত হয় তার বড় প্রমাণ আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ। একজনের

দামী, পরিস্কার বস্ত্র বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও যদি সে লজ্জাবসত তা না পরিধান করে অথচ মলিন ও পুরাতন বস্ত্র পরে বাহির হয় তাহলে অপরে তাকে সেরূপ সম্মান করে না এবং তার সামাজিক মর্যাদা নিম্ন মানের ভাবে। তেমনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ রীতিনীতি থাকা সত্ত্বেও তারা তা পালন না করাতে অনেকেই তাদের অধঃপতিত মনে করে। এমনকি তাদের অসম্মানজনক নামে অভিহিত করে। অথচ একজন ব্রাহ্মণকে দেখুন সে গরীব হলেও সে ব্রাহ্মণ। কারণ সে বৈদিক আর্য রীতিনীতি কোনও সময় পরিত্যাগ করেনি। রীতি পালনই সংস্কৃতি। আমাদের সংস্কৃতিবান হতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে আর দেরি নয়। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে বৈদিক ক্ষত্রিয় রীতি অনুসরণ ও পালন করতে হবে। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পৈতা ধারণ করুন ও তিলক ধারণ করুন। পৈতা ও মস্তকে শিখা যেমন ব্রাহ্মণের প্রতীক, তেমনি পৈতা ও কপালে তিলক হোক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের প্রতীক - যা এক সময় আমাদের ছিল। মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয় তার সমাজের মানুষের কাছে এমন আশা করতেন। তাঁর সার্ধশত জন্ম বর্ষে এটাই হোক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা।***

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের তৃতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান সূচি

দিনাংকঃ ২৫শে জানুয়ারী, ২০২৬

স্থানঃ নপাড়া রাসবিহারী স্কুল ফর গার্লস, স্টেশন রোড, বারাসাত, হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সকাল ৯টা - নাম নথিভুক্তকরণ

সকাল ১০-৩০ মি. - সঙ্গীত/পাঠ

১০-৩৫ মি.-পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণমন্ত্র পাঠ

১০-৪০ মি. - প্রদীপ প্রজ্বলন ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্প অর্ঘ্য নিবেদন।

১০-৪৫ মি. - মঞ্চে আহ্বান

১০-৫০ মি.-পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ

১১-০০ টা - স্বাগত ভাষণ।

১১-০৭ মি.- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক কবিতা পাঠ

১১-১২মি.-আগত প্রতিনিধিদের পরিচয় প্রদান

১১-৩০ মি. - 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ' ও অন্যান্য গ্রন্থ উদ্বোধন

১১-৩৫ মি. - সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

১১-৪০ মি. - কবিতা পাঠ

১১-৪৫ মি.-বিশেষ বক্তৃতা- **স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবদান।**

১২-৪০ মি.- আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে বক্তৃতা

১-১০ মি.- সাংগঠনিক আলোচনা

১-৪০ মি.- সভাপতির ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

২-০১ মি. - মধ্যাহ্ন ভোজন ও সভার সমাপ্তি।

****